কল্যাণ-প্রদীপ

ইহা

৺ ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

আই, এম, এস এর

জীবনী।

লেখিকা—

"বন-প্রসূন" এবং "সফল-স্বপ্ন" রচয়িত্রী,

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী।

কলিকাতা,

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সাল।

[মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

কল্যাণ-প্রদীপ

ইহা

৺ ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

আই, এম, এস এর

জীবনী।

৬৪

লেখিকা—

"বন-প্রসূন" এবং "সফল-স্বপ্ন" রচয়িত্রী,

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী।

কলিকাতা,

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সাল।

[মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

কল্যাণ-প্রদীপ

ইহা

৺ ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

আই, এম, এস এর

জীবনী।

লেখিকা—

"বন-প্রসূন" এবং "সফল-স্বপ্ন" রচয়িত্রী,

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী।

কলিকাতা,

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সাল।

[মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

৺ক্যাপ্টেন কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়, আই এম এস।

উৎসর্গ।

কল্যাণকুমারের স্বল্পায়ুর মধ্য দিয়া যে সদ্‌গুণ ফুটিয়াছিল তাহা স্মরণীয় আদর্শস্থানীয়। আমি সেই আদর্শের ছবি সাধ্যমত আঁকিতে করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কল্যাণের আশৈশব জীবনের মধুরতা, যৌবনের অশ্রান্ত উদ্যমের, প্রেরণার, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার, বড় হইবার, কর্ম্মী হইবার কৃতী হইবার, অদম্য উৎসাহের ও সদ্‌গুণের গল্প যদি আমাদের দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত ও দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগ্নোদ্যম যুবকেরা জ্ঞাত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় উপকৃত হইবেন— এই বিশ্বাসে ভর করিয়া আমার অশীতি বর্ষের লেখা এই শেষ বইখানি আমি তাঁহাদেরই কর-কমলে অর্পণ করিলাম।

কল্যাণকুমারের জীবনী পাঠে যদি দেশের একটীও ভগ্নোদ্যম যুবক পুনরায় নবশক্তিতে দেশের কল্যাণকর কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিবার স্পৃহা নিজ-হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে পারে তাহা হইলেই আমার এই "কল্যাণ-প্রদীপ" লেখা সার্থক হইয়াছে জ্ঞান করিব।

কল্যাণকুমারের দিদিমা—

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী।

———

৩৯৮ (ক)

ভূমিকা।

১। "কল্যাণ-প্রদীপ" প্রকাশিত হইল। প্রকাশক হিসাবে আমার এই জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা সঙ্গত মনে করি। লেখিকা—আমার পরম পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী। তিনি আমারই হস্তে ইহা ভাল করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ ভার ও দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি এখন অশীতি বর্ষের বৃদ্ধা। রুগ্নদেহে, কম্পিত হস্তে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁর জীবনের এই শেষ পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। বহু যত্নে ও পরিশ্রমে, কল্যাণ-কুমারের জীবন-চিত্র তিনি অঙ্কিত না করিয়া গেলে আর কেহ এরূপ ভাবে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইত না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

২। ইহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার ব্যাপারে আমি যে তাঁহার কিছু কাজে আসিয়াছি, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। পুস্তকে যদি কিছু দোষ থাকে তাহার জন্য অপরাধী আমি— আর ইহাতে যদি কোনও গুণ থাকে তাহার অধিকারিণী—যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তিনি।

৩। ✓ কল্যাণকুমার আমার মাতার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র সুতরাং আমার ভাগিনেয়। কল্যাণকে যে মা খুবই ভাল

বাসতেন আর এখন পর্য্যন্ত তার স্মৃতিকে ভালবাসেন তাহা নিঃসন্দেহ।

৪। কল্যাণ মেসোপোটেমিয়া বা ইরাক্ প্রদেশে গত তুরস্ক-ব্রিটিশ যুদ্ধে ডাক্তারী কাজে প্রশংসিত ও সম্মানিত হয়। অন্যান্য সহযোগী ডাক্তারদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয়ে শারীরিক শ্রম ও ক্লান্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, গোলা-গুলিকে কি আরব দস্যুদের ছোরা-ছুরিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আহত সৈনিকদের সে ঐকান্তিক শুশ্রূষা করায়, "সমগ্র ব্রিটিশ মেডিকেল সার্ভিসের গর্ব্ব" এই আখ্যা অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহা গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। তা ছাড়া, কল্যাণের যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে সুখ্যাতির রিপোর্ট যাহা সিমলা পাহাড়ের মিলিটারী হেড্ আফিস হইতে সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা এই পুস্তকের "পরিশিষ্টে" দেওয়া হইয়াছে।

৬। সেই যুদ্ধের পরিচালক, জেনেরাল টাউনশেণ্ড যখন টাইগ্রীশ কূলস্থিত "কুতেল-আমারা"য় তুরস্ক-ফৌজ কর্ত্তৃক ৫ মাস কাল ঘেরাও হইয়া, ক্ষুধার ও তৃষ্ণার ভীষণ জ্বালায় প্রপীড়িত

অবস্থায় সসৈন্যে তুরস্কদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন, তখন কল্যাণকেও সেই সঙ্গে উহাদের হস্তে বন্দী হইতে হয়।

৭। এক বৎসরকাল উত্তর ইরাক খণ্ডে, অস্বাস্থ্যকর "রাসেল-আইন" নামক স্থানে বহুসংখ্যক ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের শুশ্রূষা কার্য্যে লাগিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার নিজের (টাইফস্) জ্বর-বিকার হয় এবং তাহাতেই সে মারা যায়। পরে, উহার নামে এক "মিলিটারী "ক্রস্" উহার বিধবা পত্নীর হস্তে সরকার হইতে দেওয়া হয়।

৮। তাহার বিদেশে মৃত্যু সংবাদে আমার মা মর্ম্মান্তিক শোক পাইয়াছিলেন; সেই শোক কথঞ্চিৎ তিনি সম্বরণ করেন তাহার এই জীবনী লিখিয়া।

৯। কল্যাণ যখন মারা যায় তখন তার মাত্র সাড়ে চৌত্রিশ বৎসর বয়স। স্বল্প-আয়ুষ্মান হইয়াও সে জীবনের সব কাজই প্রায় শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করিয়া লইতে পারিয়াছিল।

সে নিজের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণে লেখাপড়া শিখিয়া ডাক্তারি পাশ দিয়া স্বোপার্জ্জিত ধনে বিলাতে গিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে প্রবেশলাভ করে এবং নিজের কৃতিত্বের বলে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

১৭। আমাদের যুবকদের উদ্দেশে মা এই পুস্তকের ২৪৮।৪৯ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন :—"ইরাকে—তুরস্ক-ব্রিটিশের যুদ্ধের বিষয় যাহা লিখিয়াছি তাহা ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল যে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে বাস্তবিক যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার এক রকম উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের যুবকদের ক্রমশঃ জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে এবং সৈনিকদের কাজও করিতে হইবে এবং দূর দূর দেশে কিংবা নিকটস্থ স্থানে গিয়া অথবা নিজ দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে হইবে।

"তাই আমাদের যুবকদের মনে যুদ্ধ-ব্যাপার শিক্ষা করিবার ইচ্ছা উৎপাদন করানও আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নয়। চারিদিক ভাবিয়া ব্রিটিশরা কেমন করিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ, আয়োজন করিয়া তুলিল, কেমন করিয়া "আমারা" "নাসিরিয়া" "কুতেল-আমারা" পর পর যুদ্ধে জয় করিল আর সুদূর বাগদাদের গেট সদৃশ "টেসিফনে"—বিধ্বস্ত হইয়া কেমন করিয়া নিজ ইজ্জত বাঁচাইয়া পলাইয়া আসিতে পারিল—তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

"মনে মনে যাহারা বীরত্বের কল্পনা করিতে পারে, বীরত্বের স্বপ্ন দেখিতে পারে, তাহারাই ত, সময় ও সুবিধা পাইলে কর্ম্ম-

ক্ষেত্রে বীরোচিত কাজ করিয়া, আদর্শ বীরের ছবি মনে ভাবিতে ভাবিতে বীরের মত মরিতে পারে।

"সুদীর্ঘ ঘাস-কাটা জীবন অপেক্ষা কি স্বল্পায়ু-বীরের মরণ শ্রেয় নয়? ভগবান করুন যেন বঙ্গমাতা একদিন "বীরমাতা" "বীরভূমি" আখ্যা জগতের ইতিহাসে পায়। সে নাম সে খ্যাতি অর্জ্জন করা ত আমাদের যুবকদেরই হাতে।"

১৮। যুবকদিগের পাঠোপযোগী করিবার জন্য এই পুস্তকে তুরস্ক-ব্রিটিশ যুদ্ধ-ব্যাপার যথা-সম্ভব বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা সহজে বুঝিতে পারিবার জন্য দুইখানি ম্যাপ ও পুস্তকের শেষে সংলগ্ন করা হইয়াছে। কল্যাণের জীবনে ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রই তাহার মহৎ কর্ম্মক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রেই তাহার জীবনের উন্মেষ সাধিত হইয়াছে। 'কল্যাণ-প্রদীপের" এইটা একটী বিশেষত্ব। ইহা সমস্তই পুস্তকের "উত্তরাংশে" পাইবেন।

১৯। কল্যাণ তাহার জীবনের মধুরতা, প্রেরণা সংযম ও বীরত্ব—আমাদের জাতীয়-সভ্যতার, কোন্ কোন্ স্তর হইতে প্রাপ্ত হইল—তাহা নিরাকরণের জন্য ধারা-বাহিকরূপে—তাহার পূর্ব্ব-পুরুষদের গুণাবলীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া—বাঙ্গালার (১) বৈষ্ণবী যুগ, পরে (২) পতনোন্মুখ

মুসলমানী যুগ, তৎপরে (৩) নূতন প্রবর্ত্তিত ইংরাজী যুগ এবং (৪) ব্রাহ্ম-সমাজ যুগ, পুস্তকের "পূর্ব্বাংশে" আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতিঘাতে হিন্দু-সমাজে আলোড়ন বিলোড়ন কত কি হইয়াছে—তাহা সমস্তই, দেখান গিয়াছে। ইহাও এই পুস্তকের আর একটা বিশেষত্ব। সচরাচর অন্য কোন পুস্তকে তাহা দেখা যায় না; ইতিহাসে ত পাওয়াই যায় না।

২০। "কল্যাণ-প্রদীপের" ৩৩।৩৪ পৃষ্ঠায় মা লিখিয়াছেন;— "নিজ ধর্ম্মে ভক্তি, নিজ মাতৃ ভাষার উপর অন্তরের আসক্তি না থাকিলে একটা জাতি কখনও সৃষ্ট হইতে পারে না। আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গ ভারত খণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন দেশ। ভারত মাতার সুবিস্তীর্ণ পূর্ব্বাংশে আমরা নিজ বুলি চালিত করিয়া বহু সহস্র বৎসর বসবাস করিয়া আসিতেছি। ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের স্বাতন্ত্র্য অনেক।"

কিন্তু আমাদের সামাজিক বা স্বাতন্ত্র্য সভ্যতার বা কালচারের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই। এই পুস্তকের "পূর্ব্বাংশ" পাঠ করিয়া সে অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে বোধ হইবে।

২১। ভারতে হিন্দুরা হিন্দু থাকিয়া হিন্দু সমাজের সংস্কার

সাধন করেন, আমার মার নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা। তাহা না সাধিত হইলে আমরা পৃথিবীতে হেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিব এবং ইংরাজ রাজশক্তির কোনও গতিকে শিথিলতা প্রাপ্ত হইলেই পুনরায় আমরা মুসলমানদের পায়ের তলায় যাইব —মার মনে সদাই এই ভয়। ভগবান করুন সেদিন যেন না হয়!

হিন্দু সমাজের সংস্কার কি করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহার পথ নির্দ্দেশও মা ঐ "পূর্ব্ববাংশে" করিতে বাকী রাখেন নাই। ইহাও কল্যাণ-প্রদীপের আর একটা বিশেষত্ব।

২২। আর একটা কথা বলিয়া এই সুদীর্ঘ ভূমিকা শেষ করিব। আমার মা বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে বিখ্যাত না হইলেও নিতান্ত অপরিচিতা নহেন। আমার বাল্যকালে (খ্রীঃ ১৮৮২তে) তাঁর "বন-প্রসূন" কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। কবিবর ৺ হেমচন্দ্র উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। হেমবাবুর বিখ্যাত "বাঙ্গালীর মেয়ে" কবিতা নিতান্ত বিদ্রূপাত্মক দেখিয়া, মা "বন-প্রসূনে," "বাঙ্গালীর বাবু" শীর্ষক কবিতায় তাহার যথোচিত পাল্টা জবাব মেয়েদের তরফ হইতে দিয়াছিলেন। তখনকার বাংলা সংবাদপত্রেও ইহার সুখ্যাতি বাহির হয়। খ্রীঃ ১৮৮৪তে আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন তাঁর "সফল-স্বপ্ন" (ইতিবৃত্ত

মূলক উপন্যাস) প্রকাশিত হয়। ইহারও সুখ্যাতি বাংলা কাগজে বাহির হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ অবধি হইয়া গিয়াছে। ইতি

লেখিকার জ্যেষ্ঠপুত্র,
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ব্যারিষ্টার,
প্রকাশক।

৺ ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় আই এম্ এস্।

পূর্ব্বাংশ।

কল্যাণ-কুমার তাহার জীবনের মধুরতা, প্রেরণা, সংযম ও বীরত্ব আমাদের জাতীয়-সভ্যতার, কোন্ কোন্ স্তর হইতে প্রাপ্ত হইল তাহা নিরাকরণের জন্য ধারাবাহিকরূপে—তাহার পূর্ব্ব পুরুষদের গুণাবলীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া—বাঙ্গালার (১) বৈষ্ণবী যুগ, পরে (২) পতনোন্মুখ মুসলমানী যুগ এবং তৎপরে (৩) নূতন প্রবর্ত্তিত ইংরাজী যুগ এবং (৪) ব্রাহ্ম-সমাজ যুগ, এই অংশে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতিঘাতে হিন্দু সমাজ কিরূপে আলোড়িত, বিলোড়িত, উদ্বেলিত হইয়াও নিজেকে সংযত রাখিয়াছে, দেখান গিয়াছে।

কল্যাণ-প্রদীপ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

১। যে যায় সে আর ফেরে না। আমার অনেক স্নেহে মানুষ করা "কল্যাণ কুমার" যে ফিরিবে না তাহা জানি। জানি বলিয়াই আমি বৃদ্ধ বয়সে, রুগ্নদেহে ও কম্পিতহস্তে লেখনী ধরিয়াছি—পাছে আমার মনের কথা মনেই থাকিয়া যায়, দু'চার কথা যা বলিবার তা বলা না হয়।

২। কল্যাণের জীবন কয়েক বৎসর মাত্র প্রদীপের মত জ্বলিল। আমাকে, তা'র আত্মীয়-স্বজনকে আমোদিত, আলোকিত করিল, তারপর দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। দীপ যখন নিবিয়া যায় তখন তার আলোক শিখা কোথা যায়? মানুষের জীবন যখন দেহ ছাড়িয়া যায় তখন কি সেও সেইরূপেই নিবিয়া যায়? এই গভীর প্রশ্নের উত্তর বা মীমাংসা এখনও মানুষ করিয়া উঠিতে পারে নাই। হয়ত কোন দিন পারিবে।

কিন্তু মানুষ তা পারুক্ বা না পারুক্ তা'তে ক্ষতি বৃদ্ধি কি, আমি ত তা বুঝিতে পারি না।

৩। কিন্তু এটা ঠিক যে, যে কায়ার ভিতর দিয়া যে আত্মা তার নিজের আলোক বিকীর্ণ করিয়া আমাদিগকে আমোদিত করিত, কায়া ধ্বংসের পর, এজীবনে, সেই অশরীরী আত্মা আমাদের কাছে আর সেই পুরাতনভাবে আসিবে না। আর আমরা এই দেহতে আবদ্ধ থাকিয়া, এই চর্ম্ম-চক্ষে বা হস্তে সেই অশরীরী আত্মা দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারিব না। আমরা তা পারি না বলিয়াই আমাদের এই জগৎ জোড়া ক্রন্দনের রোল।

৪। আমার "কল্যাণ" প্রদীপটীর মত, কত আদরে যত্নে পালিত, কত লক্ষ লক্ষ জ্বলন্ত প্রদীপ দপ্ করিয়া নিবিয়া গিয়াছে তাহা কি আর জানি না? গত ইউরোপীয় বা জগৎ জোড়া যুদ্ধে এমন ঘর ছিল না, যেখান থেকে একটী না একটী জ্বলন্ত প্রদীপ তারার মত খসিয়া পড়ে নাই। তা ছাড়া স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক ভাবে প্রতিদিন কত সহস্র সহস্র প্রাণী মৃত্যুমুখে পড়িতেছে তার নিরাকরণ কে করিবে?

৫। এই মৃত্যুময় জগতে, মানুষ তবে কেমন করিয়া বুক বাঁধিয়া আছে,—কেমন করিয়া কোমর বাঁধিয়া কাজ করিতেছে—এইটাই খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি? মানুষ মুখে যাই বলুক

না কেন, আমার বৃদ্ধবয়সের এই ধ্রুব বিশ্বাস যে এই মৃত্যুময় জগতে মানুষ দাঁড়াইয়া আছে দুই কারণে; প্রথমঃ—"জীবাত্মা নশ্বর" এই অন্তর্নিহিত, মজ্জাগত বিশ্বাস; আর দ্বিতীয়ঃ—এক চিরন্তন সংস্কার যে সেই নশ্বর আত্মার কল্যাণ ভগবান নিজে কোন না কোন উপায়ে সাধন করিতেছেন।

৬। যখন আমরা জানি, সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমানা অবধি যাহা কিছু আছে সমস্তই নিজ নিজ পরিধিতে, নিজ নিজ বেড়ায় ও ব্যবধানে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধানে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহাদের স্ব স্ব নিয়মের দাস হইয়া ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে, তখন কি করিয়া বলিব, কি করিয়া মানুষ বলিতে পারে, যে, "বিধান আছে, অথচ বিধাতা নাই, নিয়ম আছে—নিয়ন্তা নাই, সৃষ্টি আছে কিন্তু স্রষ্টা নাই"?

৭। আমি কল্যাণের দিদিমা। আমার হস্তেই "কল্যাণ" ভূমিষ্ঠ হয়। আমার স্নেহের "কল্যাণ" এখন পরলোকে, ভগবানের ক্রোড়ে। আর আমার এই সুদীর্ঘ জীবনের দিন আশা করি ফুরিয়া আসিল। আমারও আকাঙ্ক্ষা এই সংসারের শোক তাপ দুঃখ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যেন জীবনান্তে ভগবানের ক্রোড়েই স্থান পাই। যদি কখনও আমার

"কল্যাণকে" ফের পাই ত ভগবানের ক্রোড়েই পাইব। তাই কল্যাণের জীবনী লিখিবার প্রারম্ভেই আমার পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাসের আভাস দিলাম।

৮। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের; মরণ-বাঁচনের; আমার আমিত্বের দায়িত্ব যখন ভগবানের, তখন তিনি "মঙ্গলময়" ভিন্ন আর কিছু ভাবিবার অধিকার, আমাদের অর্থাৎ সৃষ্টদের নাই। তাঁর মঙ্গলময় বিধানকে তুচ্ছ মানব ঘাড় পাতিয়া বহন করিতে বাধ্য।

৯। "কল্যাণ" আমার, অল্প বয়সে, পূর্ণ যৌবন অবস্থায় মারা পড়িয়াছে। যদিও বয়সে সে প্রবীণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু বিজ্ঞতায়, ধৈর্য্যে, পরিশ্রমে, কর্ত্তব্য-পালনে, মাতৃভক্তি, দেশভক্তি ও হৃদয়ের কোমলতায় সে প্রবীণত্ব ও পূর্ণতা পাইয়াছিল। কেহ কেহ অল্প আয়ুষ্মান্ হইয়াও জীবনের সব কর্ম্মই সাধন করিয়া লইতে পারে। আমার "কল্যাণ"ও তাই পারিয়াছিল। তার স্বল্পায়ুর মধ্য দিয়া যে সৎগুণ ফুটিয়াছিল তাহা স্মরণীয়, আদর্শস্থানীয়। সেই আদর্শের ছবি আমাদের দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত ও দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগ্নোদ্যম যুবকবৃন্দের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বলিয়াই আমি সেই ছবি সাধ্যমত অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

১। আমরা বাঙ্গালী। আমাদের ভিতর আর্য্য-অনার্য্যের যথা দ্রাবিড়ায় মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ আছেই। কোন্ যুগে তাহা ঘটিয়াছে তাঁহার নিরাকরণ নিস্প্রয়োজন। এই সংমিশ্রণের ফলে আর আমাদের এক মাতৃভাষার বলে আবহমানকাল হইতে আমরা ভারতের পূর্ব্বখণ্ডে বসবাস করিতেছি, একটি স্বতন্ত্র জাতি। আমাদের এইটাই বিশেষত্ব।

২। আমাদের জাতীয়-জীবন, আমাদের দেশের বড় বড় নদীর মত। তা'রা হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া কত ছোটখাট নদনদীর জলে পুষ্ট হইয়া, কত দেশ বিদেশ ধৌত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়াছে। একবিন্দু নদীর জলকে পরখ করিয়া দেখিলে যেমন জানা যায় যে তাহার ভিতর কত রকম মাটির অণু-পরমাণু, কোন্ স্তর হইতে সেই জলকণা, তেমনি এক জাতীয় নর-নারীর কায়িক মানসিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াও বুঝা যায় যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে কোন্ কোন্ দোষ গুণ লইয়া জন্মিয়াছে এবং আরও জানা যায় যে সমাজের কোন্ স্তর হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষরাও তাঁ'দের শক্তি পাইয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্লেষণে বা আলোচনায়

আমাদের সামাজিক নিভৃত শক্তি কোথা হইতে কি সূত্রে সৃষ্ট হইল এবং কি কি কারণে তাহা ফুটিয়া উঠিল তাহা নির্দ্দেশ-যোগ্য হইয়া পড়ে। এ সমস্ত না দেখাইলে, যে ছবি আঁকিয়া ফুটাইয়া তুলিতে ইচ্ছা করি তাহা হয় ত শ্রীহীন হইবে, ভয় হয়।

৩। প্রত্যেক জীবনটিই, একভাবে দেখিতে গেলে, একটি ফুলের মত। সে ফুলটি কি ফুল? কোন্ গাছের ফুল? সে গাছের পাতা পাপঁড়ি, ডাল পালা কিপ্রকারের এবং সে কিরূপ মাটীতে উৎপন্ন হইয়াছে? মাটীতেই বা কিসের সার পড়িয়াছে, এ সকল বিষয়ই আলোচ্য হইয়া পড়ে। এ সমস্ত লিখিতেও ভয় হয়, পাছে দয়ালু পাঠক মনে করেন প্রস্তাবনা অপ্রাসঙ্গিক, "ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত" হইয়াছে। বস্তুতঃ শিবের গীত যদি মধুর হয়, শ্রবণীয়, তৃপ্তিকর বা ওজস্বী হয়, তাহা হইলে ধান ভাঙ্গিবার সময় শ্রমের যে লাঘব হয় তাহা নিশ্চয়। তা ছাড়া মনে রাখিবেন আমি আমার মনের মত ছবি আঁকিব। ছবির সুদূর-প্রাঙ্গণে যে সকল রেখা দিয়া সাজাইবার প্রয়োজন মনে করিব, দিব। এ বয়সে ভয় করিয়া লিখিতে গেলে ত মনের কথা লেখা হইবে না। তাই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি যা লিখিব তা নির্ভয়ে লিখিব। দয়ালু পাঠক আমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া যাহা লিখিতেছি তাহা পাঠ করিবেন।

যে ছবি আমি আঁকিয়া তুলিব মনে করিয়াছি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া, চারিদিক দিয়া, নিরীক্ষণ করিবেন। ছবির কোন রেখাটাই তাচ্ছিল্যভাবে দেখিবেন না। আর স্মরণ রাখিবেন আমি কল্যাণ-কুমারের বৃদ্ধা দিদিমা।

৪। একদিন স্বপ্ন দেখি, সে বহুদিনের কথা, যেন আমি এক দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া নীল আকাশ দেখিতেছি। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ আসিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সেই নীল আকাশ ভেদ করিয়া আমি যে কতদূর গিয়া পড়িলাম তার ঠিকানা নাই। নীল আকাশ আর নীল নাই, কাল হইয়া গিয়াছে। কাল আরও ঘোর কাল হইয়া গেল, আমি একা সেই মেঘে যাত্রী। সেই ঘোর কালর ভিতর দিয়া মেঘ যাইতে যাইতে এক মহা ঘূর্ণ্যমান ঝড়ের ভিতর পড়িল। চক্রের মত সেই মেঘ আমাকে লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

কত ঘোর পাক্ খাইতে খাইতে এক মহাকাল শিবমূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া আমি মেঘে দাঁড়াইয়া ঘুরিতেছি, উপলব্ধি করিলাম। সেই মহাকাল শিবমূর্ত্তিও যেন এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত বিশেষ। আমার বাহন মেঘের মত কত সহস্র সহস্র মেঘখণ্ড তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে আর তাঁর পাদদেশে ঠেকিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে, আবার নূতন মেঘরাশি তাদের স্থান

লইতেছে—আবার ঘুরিতেছে আবার ঠেকিতেছে আর ভাঙ্গি-তেছে। আমার মেঘও ঐরূপ চূর্ণ হইয়া যাইবে, ঐ মহাকাল মূর্ত্তিতে ঠেকিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিলাম। যেই আমার মেঘে ও মূর্ত্তিতে ধাক্কা লাগিল আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া চেতনার সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিলাম, আমি খাট হইতে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে পড়িয়া গিয়াছি। আর হাঁটুতে ও হাতে খুবই আঘাত পাইয়াছি।

৫। যে স্বপ্নের কথা বলিলাম তাহা ভুলিবার নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানটা, সেই স্বপ্ন দেখার গুণে, বদ্ধমূল হইয়া গেল যে আমাদের ইহসংসারও চক্রের মত সেই "মহাকালকে" বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে আর তারই প্রতিঘাতে দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে মনুষ্যজীবন, মানবসমাজ, চক্রের মত ফিরিতেছে। আর সেই কারণেই আমাদের জন্মমৃত্যু, উত্থান পতন, শোক দুঃখ, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অনিবার্য্য। কালের প্রবাহ সৃষ্টকে সমুদ্রের ফেনার মত, ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠাইয়া কতই উচ্চে তুলিতেছে আবার কত গভীর তলে ফেলিয়া বিলীন করিয়া দিতেছে। আবার নূতন ফেনা মাথায় করিয়া ঢেউ উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, চূর্ণিত হইতেছে আবার নূতন ফেনা দেখা দিতেছে। সৃষ্টির ঢেউয়ের বিরাম নাই;

কিন্তু সৃষ্ট নূতন নূতন ফেনার মত দেখা দিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে।

৬। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড "কার্য্যকারণ"—গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়াও ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তনশীল; বিধির এই অখণ্ডনীয় বিধান। তারই সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে জাতীয় হিসাবে বর্ত্তমান ইউরোপ মার্কিন বা জাপান দেশসমূহের তুলনায় এখন আমাদের দেশের অবস্থা—শিক্ষায়, অর্থসমাগমে, একপ্রাণতায় যদিও খুবই শোচনীয় তথাপি তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। যেহেতু কালচক্র ঘুরিতেছে, এমন দুর্দ্দিনও কাটিয়া যাইবে।

৭। উদ্যম ও চেষ্টা থাকিলে, ধর্ম্মে মতি রাখিয়া গন্তব্য-পথে আগুয়ান হইলে, ভগবান সহায় হইবেনই হইবেন। দেশমাতাকে যথার্থ গর্ভধারিণী জননী জ্ঞান করিয়া, দেশের লোককে ভাই বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিবে। যে সব শ্রেণীর লোকেরা সমাজের চাপে নীচে পড়িয়া গিয়াছে, তাদের শিক্ষা দিয়া শুদ্ধ করিয়া, উচ্চ শ্রেণীভুক্ত করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন হিন্দু সমাজের তথা দেশমাতার কল্যাণ সাধিত হইবে না। দেশে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারাই দেশের ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য, তাঁহাদেরই এ কাজ করা কর্ত্তব্য।

৮। আমাদের দেশব্যাপী মূর্খতা আর শ্রেণীগত স্বার্থপরতা আমাদিগকে যেন নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জাতীয় একপ্রাণতায় বাধা দিতেছে এবং বস্তুতঃ আমাদের এক মহাজাতি হইবার পথে যেন কাঁটা সাজাইয়া রাখিয়াছে; আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। ঐ নাগপাশ কাটিবে, জনসাধারণের ভিতর কতক পরিমাণে প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী শিক্ষা বিস্তারের ফলে আর আমাদের শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ত্যাগ স্বীকারের বলে।

৯। ভারতমাতা আমাদের অতি প্রাচীনা, অতি বৃদ্ধা। আর অনেক রকমের সন্তান সম্প্রদায় তাঁর সুবৃহৎ ক্রোড়ে আশ্রিত, পালিত। যে সেই মাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে সেই তাঁর স্তন্য পাইয়াছে। আমাদের এই সব পোষ্য ভাইয়েরা ভিন্ন আচার-ব্যবহারে পালিত। তাই আমাদের এত বিড়ম্বনা। আমরা না পারি তাঁহাদের লইয়া এক হইয়া ঘর করিতে, না পারি তাঁহাদের বর্জ্জন করিতে। সাম্প্রদায়িক ভাবে এক এক সম্প্রদায় স্ব স্ব উন্নতি সাধন করুক, এইটাই দেখিতেছি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর, ইংরাজের রাজছত্রের নীচে দাঁড়াইয়া।

১০। ইউরোপীয় দেশসমূহে বা মার্কিনদেশে যেরূপে এক "নেসান" বা এক জাতি সংগঠন হইয়াছে, ভারতে সেরূপভাবে

এক মহাজাতি সংগঠনের অন্তরায় অনেক বলিয়াই এখনও অনুমান হয়। তবে সে সব অন্তরায়ও কাটিয়া যাইতে পারে যদি আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা হিন্দু জাতির পুনঃ সংগঠনের বিলি ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন।

১১। যেরূপভাবে মুসলমান-সম্প্রদায় দেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, যেরূপভাবে ইউরোপীয় মিশনারির দল আমাদের দেশের গরীব ও মূর্খদিগকে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মভুক্ত করিয়া লইতেছেন, এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার খাতিরে হিন্দু সমাজ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন না। হিন্দু সমাজের পুনঃ সংগঠনের সময় উপস্থিত এবং সে সম্বন্ধে আমাদের শীর্ষস্থানীয় দেশবাসীদের যে স্থিরভাবে গবেষণা করা উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২। আধুনিক হিন্দুসমাজ পুরাকালের আর্য্য-সমাজ হইতে নিঃসৃত। সেই আর্য্য-সমাজ হিমাচলের পাদদেশ হইতে কুমারিকা অবধি যে ছড়াইয়া পড়িল, তাহার কারণই হইতেছে যে আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে বিশেষভাবে নিজ কবলে, নিজ সভ্যতার নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যখন আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণ স্পষ্টই দেখিতে পাই, তখন কি করিয়া বলিতে পারা যায় যে ইহা অকাট্য সত্য যে, যে হিন্দু সে হিন্দু ঘরেই জন্মগ্রহণ করিবে। যে জন্মাবস্থায়

অহিন্দু সে কখনই ইহ-জীবনে হিন্দু হইতে পারিবে না। ফলতঃ উহা অকাট্য সত্য নয়। ওটা একটা আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অথবা তীব্র-পণ্ডিতি-মূর্খতা বা সঙ্কীর্ণতা। আমরা অযথা নিজের পায়ে কুড়াল মারিয়া হীনবল কেন হইব, আমি বুঝিতে অক্ষম। ঐরূপ সঙ্কীর্ণতাতে জাতীয় মরণ অনিবার্য্য।

১৩। ইউরোপ বা মার্কিন দেশে যেরূপে যে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করিয়া, এবং এক খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের এক-ছত্রতার প্রভাবে এক জাতি, এক "নেসান" প্রস্তুত হইয়াছে, সেইরূপভাবে আমাদের—হিন্দুদের ভিতর চলন হয় নাই অনেক কারণে। এবং সেই কারণে আমরা যদি একটা মহাজাতিতে পরিণত না হ'য়ে থাকি, তাতে দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। ঐরূপ একাকার আমাদের দেশে হয় নাই বলিয়াই আমাদের বংশগত যে পবিত্রতা তাহা বজায় আছে।

১৪। ঐরূপ একাকার করিয়া তুলিবার প্রয়োজন এখনও আমাদের দেশে হয় নাই এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। ঐরূপ ইউরোপীয় বা মার্কিনি একাকার হিন্দুদের ভিতর হয় নাই বলিয়াই হিন্দু সমাজ আজও পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে। খালি বাঁচিয়া কেন, হিন্দুসমাজের মহাছত্রের ভিতর অনেক পর্ব্বতবাসী অনার্য্য বর্ব্বর জাতি আসিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে;

হিন্দুসমাজ যে একটী মহাসমাজ তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই।

১৫। হিন্দু মহাসমাজের মহাছত্রের ভিতর যাহারা আজ কাল আশ্রিত তাহাদিগের মধ্যে সুচিকিৎসা, বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা, আচার-ব্যবহার, আদান-প্রদান, বিবাহ-পদ্ধতি, জাতি-নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমানে কিরূপ হওয়া উচিত, নেতৃবৃন্দের সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দুসমাজের পুনঃ সংগঠন নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

১৬। এই নূতন সংগঠন আমরা ইংরাজদের অধীনে থাকিয়াই সাধিত করিতে পারিব, আমার বিশ্বাস। এ দেশের স্থায়ী উন্নতি রাজদ্রোহিতায়, ইংরাজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার গুপ্ত ইচ্ছায় বা গুপ্তভাবে বোমা ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া সাধিত হইবে না। ফরাসী বিপ্লবের বা রুশ বিপ্লবের ন্যায় রক্ত তর্পণেও সাধিত হইবে না, হইতে পারে না। তড়বড়ী নবীন ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণেও এদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ভারতের তথা ভারতবর্ষীয় হিন্দু-সমাজের মজ্জাগত, সংস্কারগত বিশেষত্বটা বজায় রাখিয়া উন্নতির পথ খুঁজিতে হইবে।

১৭। হিন্দুসমাজের সংস্কার হিন্দুরা নিজেরাই, নিজের

পায়ে দাঁড়াইয়া করিবেন। সে সংস্কার ব্যাপারে হয়ত ইংরাজ রাজশক্তির আশ্রয়, আইন কানুন পরিবর্ত্তনের ইচ্ছায়, সময়ে সময়ে লওয়া প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু ঐ ব্যাপারে মুসলমানদিগকে আমাদের "কামধেনু" বলিয়া ক্রোড়ে তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

১৮। হিন্দুসমাজের আর মুসলমান সমাজের ভিতর একটা সখ্যভাব স্থাপন করার চেষ্টা আমার মতে বৃথা বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, শারীরিক বলে, একতায়—হিন্দু-সমাজ পুনর্গঠিত হইলে হিন্দুরা আর মুসলমান হইবে না; এবং সমুজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে যেরূপ তারকার জ্যোতি ম্লান হইয়া যায়, হিন্দুসমাজের বীর্য্যের প্রতাপে মুসলমান সমাজের দম্ভ ও স্পর্দ্ধা সেইরূপ খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতর হইয়া যাইবে।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

১। আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত-দলদের মন থেকে এ ভুলটা দূর কর্ত্তে হবে যে যা কিছু সামাজিক বা সভ্যতা বিষয়ক উন্নতি, তা সুদূর ইউরোপ আর মার্কিনখণ্ডেই হইতেছে, আর আমরা, ভারতবাসীরা হাত পা গুটাইয়া "অচল আয়তন" হইয়া বসিয়া আছি।

২। আমাদের ভিতর এখন অনেক নবিস্ আছেন যাঁরা ইংরাজী বা খৃষ্টানী সভ্যতাকে কণ্ঠের হার, চোখের চশমা করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিশাল ভারতবর্ষব্যাপী হিন্দু-সমাজের ভিতর দিয়া কি উত্তাল তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়াছে, কি ভীষণ শোকের, তাপের, অপমানের, দারিদ্রের বহ্নি সদাই রাবণের চিতার ন্যায় জ্বলিতেছে, তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, সে বিষয় চিন্তা করেন না। তাঁদের যে স্বদেশ-বাসীদের সম্বন্ধে, হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে একটা ভুল মত হইবে তাহা নিশ্চয়।

৩। আমাদের ভারত যে এসিয়াখণ্ডের একটি প্রকাণ্ড প্রদেশ তাতে ত আর সন্দেহ নাই। আর ইহার উপর দিয়া আবহমানকাল হইতে কি অধঃপতনের বারিধি না বহিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা হারাইয়াও ঝগড়া দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ, দলাদলি,

হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, গৃহশক্রতা যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। এসকল জাতীয় প্রকৃতিগত কুপ্রবৃত্তিসমূহের দমনের চেষ্টাও যেন সুসভ্যদিগের নিকট নীতিবিরুদ্ধ। যাহা কু তাহা বর্জ্জন না করিতে পারিলে আমাদের ধ্বংসের পথ যে আরও প্রসারিত হইবে তাহা নিশ্চিত।

৪। ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্মেষ দেখ। ভাবিয়া দেখ যখন এই অনার্য্য ভারত, আর্য্য ভারতে, দেবভূমিতে পরিণত হইল তখন সেই অনার্য্যের উপর দিয়া কি পীড়নই না গিয়াছে। অনার্য্যের ক্রন্দনের রোলে কি দাম্ভিক জয়ী আর্য্য কর্ণপাত করিয়াছিলেন? আজও ভারতে অনার্য্যের সংখ্যাই ত অধিক। সেই আর্য্য অনার্য্য সমস্যা এখনও আমাদের ভিতর খুবই খরতর বেগে জাগ্রত। হিন্দু মুসলমানের বৈরিভাব সেই কথারই অংশ মাত্র। উহা যে সহজভাবে মিট্‌মাট্‌ হইয়া যাইবে তাহা বোধ হয় না।

৫। আমাদের জাতীয়-অবস্থা সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে বা দ্বাপরে কি ছিল তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এটা খুবই স্মরণীয় যে, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পরের ভিতর এতই হিংসা, দ্বেষ, বৈরিভাব সততই জাগিয়া থাকিত, আর আমাদের জাতীয়-জীবনও এত দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছিল যে সুদূর ম্যাসিডন্ হইতে বিজয়ী গ্রীক্‌সেনা ও ভারতে ঢুকিতে পারিয়াছিল।

৬। প্রতাপশালী বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের অধীনে ভারতে এক নূতনযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আজকাল পুস্তকে, মাসিক কাগজের প্রবন্ধে দেখিয়া থাকি যে সে যুগ ভারতে সাম্য, মৈত্রী, অহিংসার স্রোত আনিয়াছিল এবং সেই স্রোতে ভারতমাতাকে পৃথিবী-পূজ্য স্থানে তুলিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টচক্র এতই চমৎকার যে মহারাজ অশোকের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর হইতেই সে স্রোত এতই কমিয়া যাইতে লাগিল যে তাঁর বংশধরেরা, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীর দল একযোগ হইয়াও ঠেলিয়া উচ্চে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রদীপের শিখার মত সে মহৎযুগ ও দপ্ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল।

৭। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের দলাদলীতে বৌদ্ধেরাই পরাস্ত হইল। এ বিবাদে, এ কলহে, দুই ভায়ে বিবাদ করিলে যে ফল হয় তাহাই হইল। ভারতের দুই হাতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আর হুড়মুড় করিয়া মুসলমান ভারতে ঢুকিল। আর্য্য তথা বৌদ্ধ গৌরব চুরমার হইয়া গেল।

৮। বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, স্থায়িভাবে পুনর্গঠনের পূর্ব্বেই, মুসলমান-বন্যা তাঁহাদের ভাসাইয়া দিল। জয়ী ইসলামী সৈনিকবৃন্দের নিকট ভারতবাসীরা ঘৃণিত হইয়া পড়িল। জয়ীদের বর্ব্বর জিহ্বায় পবিত্র "সিন্ধু" নাম উচ্চারিত না হইয়া "হিন্দু" শব্দ উচ্চারিত হইল; আর ভারতের আর্য্য অনার্য্য দুই-ই সেই ঘৃণিত "হিন্দু" নামে অভিহিত হইল। চিরপূজ্য ও পূত "আর্য্যাবর্ত্তের" নামকরণ হইল "কাফের হিন্দুস্থান"। হিন্দুর লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল না।

৯। যে বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া হিন্দুদিগের শিবমন্দির বসিয়াছিল, তাহা চূর্ণ করিয়া মসজিদ্ উঠিল। যে বৌদ্ধ বিহার-সমূহ চূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজকে বৌদ্ধবিজয়ী ভাবিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান হস্তে হিন্দুদেরই শ্মশানভূমি হইল। হিন্দুর শ্মশানভূমিতে, দেবদেবীর মন্দিরের ভিটায়, আল্লার মসজিদ্ বসিল। হিন্দুর রক্ত-সলিলে ও তাঁহাদের অপহৃত ধনে জহরতে, প্রেমের সাক্ষী "তাজমহল," জগতে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইল।

১০। সাধারণ প্রজার হিতসাধন—যাহাদের হিত সাধন পুষ্টি ও তুষ্টি ব্যতীত রাজশক্তির ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না—মুসলমান বন্যার পূর্ব্বে ভারতের অগণিত খণ্ড রাজ্যের রাজন্য-

র্য্যে সমবেত হইয়া যাহা করিতে পারিতেন তাহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র মন হইতে স্ব স্ব হিংসা, দ্বেষ, গরিমা, তাড়াইয়া দেশমাতাকে রক্ষার জন্য একতা-বদ্ধ হইতে পারেন নাই।

কোন কোন রাজপুত রাজারা প্রাণপাত করিয়াছিলেন সত্য; দেশকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। মুসলমান বন্যাতে সকল উদ্যম, কীর্ত্তি ভাসিয়া গেল।

১১। রাজার আদেশে গরীব প্রজা, মূর্খ প্রজা, অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত প্রজা, লাঙ্গল ছাড়িয়া ঢাল তরোয়াল লাঠি ধরিয়াছে, যুঝিয়াছে আর মরিয়াছে। যারা বাঁচিয়া ফিরিয়াছে তারা ফের লাঙ্গল ধরিয়াছে; রাম রাজা কি রহিম রাজা হইল, শুনিল মাত্র। তাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হইল না। তাদের যা কষ্ট যা দুঃখ—অন্নবস্ত্রের, দুর্ভিক্ষের, জলাভাবের, পীড়ার, মড়কের—তাহা রহিয়াই গেল। তা'রা জানিত যে সূর্য্য যেমন জলাশয়কে শোষণ করিয়া লয়—তেমনি রাজশক্তি আছে কেবল প্রজাকে শোষণ করিবার জন্য। হিন্দু রাজারাও অত্যাচারী ছিলেন আর তার বাড়া অত্যাচারী ছিলেন মুসলমান বাদ-সাহেরা।

১২। প্রজার অর্থ অপহরণ করাই ছিল রাজ ধর্ম্ম, ছলে পার, বলে পার, কৌশলে পার। মুসলমানদের সময়ে এই রাজশক্তির প্রকোপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল হিন্দুর ধর্ম্মের উপর, হিন্দু নারীর সতীত্বের উপর। ইহাতে তাহাদের স্বার্থ ছিল। স্বার্থ :—সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রশস্ত ও স্থায়ী করা; তার সিদ্ধির উপায় :—কাফের হিন্দুর জাত মারা, তাদের নারীদের অপহরণ করা, তাদের পারিবারিক উচ্ছেদ সাধন করা। তাহা হইলেই হিন্দুরা গোলাম হইয়া কলমা পড়িবে, মুসলমান হইবে এবং কখনই মুসলমান সাম্রাজ্যের শত্রু হইবে না।

১৩। মূলকথা স্মরণীয় যে আমাদের উপর দিয়া মুসলমান-দের সময়ে কি অত্যাচার অনাচার নির্য্যাতন না গিয়াছে। কত প্রলোভনে, কত দুঃখে, কত জীবনরক্ষার প্রয়াসে, কত প্রবঞ্চনায়, দলে দলে মূর্খ হিন্দু প্রজা স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া মুসলমান হইয়াছে, তার নিরাকরণ কে করিবে ? আমার বিশ্বাস যে এইরূপ হিংস্র রাজশক্তির পেষণ, জগতে আর অন্য কোনও জাতি সহ্য করিতে পারিত না—যেমন সহ্য করিয়াছে আমাদের হিন্দু-জাতি।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

১। হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে পারিত বলিয়াই তাহারা আজও ভারতে টিকিয়া আছে এবং মুসলমান রাজত্ব সময়েও ছিল। তখন কেবল টিকিয়া কেন, তাহারা সাধ্যমত মুসলমানকে বাধা দিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে লড়িয়াছে, নিজধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য অবলীলাক্রমে প্রাণ দিয়াছে।

২। মুসলমানদের সময়ে আমাদের জাতীয় আলোড়ন বিলোড়ন কি কম হইয়াছে ? ঘাতে প্রতিঘাতে মানুষ তৈয়ারি হয়, জাতিরও গঠন হয়। মুসলমানেরা ভীষণ অত্যাচারী না হইলে দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় জাতি, পাঞ্জাবে রণপটু শিখ জাতি তৈয়ারি হইত না। আর তখন আমাদের বাংলা দেশ কি ঘুমাইয়াছিল ? বাংলা দেশে কি বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় নাই ? বাংলা দেশ থেকে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া, বাঙ্গালীকে এক ধর্ম্মের ছত্রে আনিতে, এক জাতিতে গঠন করিতে, কি শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যেরা প্রয়াস পান নাই ? তবে কেমন করিয়া হিন্দুকে গালি দেওয়া খাটে যে তাহারা "অচল আয়তন" ?

৩। যে মাতৃভাষার দোহাই দিয়া, যে বাংলা ভাষার গৌরব

অটুট রাখিবার জন্য আমরা—সমগ্র বাঙ্গালীরা, এক হইয়া বড়লাট কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহার অতি গভীর নিগূঢ়তম মূলে অর্থাৎ আমাদের জন্মভূমির উপর ও মাতৃভাষার উপর ভালবাসার মূলে—দেখিবে সেই ভক্ত ত্যাগশীল, কষ্টসহিষ্ণু বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়, যদিও তাহারা আজ শক্তিহীন, নিষ্প্রভ।

৪। চিত্রাঙ্কনের মর্য্যাদা রাখিবার জন্যই যে আমি "কল্যাণ" ছবির প্রাঙ্গণে উপরি উক্ত পুরাতন ঐতিহাসিক বা সামাজিক তথ্য ঢালিয়া দিলাম অপ্রাসঙ্গিক ভাবে, তাহা নয়। আমার "কল্যাণ" যে চরিত্রের বলে মানুষ হইল, সে চরিত্র, সে জোর, সে বল, সে কোথা হইতে পাইল? সে বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর ছেলে। বাঙ্গালী জাতির যে সৎগুণ, তাহাতে সেটা ছিল বলিয়াই আমাকে দেখাইতে হইল যে সে জাতির সৎগুণ আহরণ কোন্ পথ ধরিয়া হইয়াছে। "কল্যাণ" স্বয়ম্ভূ নয়। ভূঁইফোড়ও নয়। তার পূর্ব্ব পুরুষদের সৎগুণ সে কিছু কিছু পাইয়াছিল। তার পূর্ব্বপুরুষেরা সব উচ্চবংশীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

৫। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর দিয়া যে সব স্রোত বহিয়া গিয়াছে—সুখ দুঃখের বল, মুসলমান রাজশক্তির বল,

ধর্ম্মজীবনের বল, সামাজিক বিপ্লবের বল, সে সব স্রোতের বেগ যত উচ্চবংশীয় বাঙ্গালী পরিবারদের লাগিয়াছে তত নিম্ন-তম শ্রেণীর লোকদের লাগে নাই। সেই সব স্রোতের বেগে, ঢেউয়ের জোরে, জাতীয় জীবন ও তার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবংশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পারিবারিক জীবন ও গঠিত হইয়া উঠে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যে সৎগুণ থাকিলে লোকে গ্রামের নেতা হইয়া উঠে, দশজনের একজন হয়, সেই পদ পাইলে তাহা বজায় রাখিয়া চলা যে কত কষ্টকর, কত ধৈর্য্যের, কত ত্যাগস্বীকারের, কত সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন তাহা মনে রাখা উচিত; বিশেষতঃ মুসলমানি যুগে যখন মাথার উপর হিংস্র অত্যাচারী রাজা।

৬। আর একটা কথা খুব দৃঢ় ভাবে মনে রাখা উচিত যে হিন্দু-বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন তার ধর্ম্মের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। এই পারিবারিক ধর্ম্মজীবন মুসলমান রাজশক্তির দ্বারা কলুষিত না হইতে দেওয়াই ছিল তখনকার দিনে (সে অনেক দিনের কথা নয়—মাত্র ১৫০ বৎসরের কথা) গ্রামে গ্রামে আলোচনার বিষয়, আজ-কালকার পলিটিক্সের মত। কিসে আমার পারিবারিক ইজ্জৎ রাখিতে পারিব, কিসে আমার মাতা ভগিনী স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূর স্ত্রীধর্ম্ম রক্ষা করিতে

পারিব, এই ছিল তখনকার দিনে দুর্ব্বল হিন্দু প্রজার বিষম সমস্যা।

৭। ধর্ম্ম বজায় রাখা যে কত কষ্টকর তাহা মুসলমানেরা আমাদের হাড়ে হাড়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল হিন্দু প্রজারা কাতর হইয়া গ্রামে গ্রামে নেতা ধরিয়াছে, আর যাঁহারা নেতা হইয়াছেন তাঁহাদের উপরেই বাজ পড়িয়াছে। মুসলমান-রাজাদের হিংসা নিরীহ হিন্দু প্রজার ধর্ম্মের উপর, হিন্দুরমণীর সতীত্বের উপর পড়িয়া দেশবাসীকে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু প্রজারা তাদের নেতাদের সাহায্যেই সেই লাঞ্ছিত ধর্ম্মকে বজায় রাখিতে পারিয়াছিল, ইহা একটা কম শ্লাঘার বিষয় নয়। তাই হয়ত হিন্দুর কাছে তার লাঞ্ছিত ধর্ম্ম এত আদরের।

৮। হিন্দু প্রজার সহিত মুসলমান রাজশক্তির সংঘর্ষণ হিন্দুধর্ম্ম লইয়া আর হিন্দু নারীর ইজ্জৎ লইয়া। এই সংঘর্ষণে, এই ধর্ম্ম যুদ্ধে, হিন্দুরা যে জয়ী হইয়াছে আর মুসলমান রাজশক্তি যে পরাস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছে তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। যতদিন ধরিয়া, যত শতাব্দী ধরিয়া, সেই নিষ্ঠুর রাজশক্তি আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, তত শতাব্দী ধরিয়াই ঐ ধর্ম্মযুদ্ধ চলিয়াছে। আজ ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সেই মুসলমান হিংসা কি নির্ব্বাপিত হইয়াছে? কখনই না। যতদিন মুসলমান হিন্দুর

ধর্ম্মের উপর, হিন্দুরমণীর ইজ্জতের উপর, হস্তক্ষেপ করিতে বিরত না হইবে ততদিন হিন্দু-মুসলমানের ভিতর স্থায়িভাবে বন্ধুতা বা ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি কি করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, আমিত তা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। উহাদের অস্থায়ী বন্ধুতায়, ভিত্তিহীন মৌখিক অসত্য ভ্রাতৃভাবে হিন্দুদের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। যাহারা মনুষ্যসমাজে হিংস্রক জন্তুর ন্যায় ব্যবহার করিবে তাহাদিগকে দূরে পরিহার করাই মঙ্গল।

৯। আমাদের জাতীয় জীবন মুসলমানি যুগে ঐ ধর্ম্ম যুদ্ধের ব্যাপারের ভিতর দিয়া গিয়া ঝলসিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মের জন্য মাথা দেওয়া, ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা আমাদের নেতাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই মুসলমানি যুগ অতি ভীষণ যুগ যাহা ভগবানের কৃপায় ও বন্ধু ইংরাজের সাহায্যে দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে।

১০। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সেই ভীষণ যুগ তত বেশীদিনের কথা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের জাতীয় স্মৃতিশক্তি এত তরল, যে সেই নিষ্ঠুর যুগমাহাত্ম্যের কথা আমরা একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছি। আর বিস্মৃত হইয়াছি বলিয়াই আমরা মূর্খ লোকদের কথায় ভুলি। আমরা ভুলি, যে বন্ধু ইংরাজ মুসলমান পদ-দলিত লাঞ্ছিত হিন্দু সমাজকে উদ্ধার করিয়াছে, পদস্থ

করিয়াছে, পুনর্জীবন দান করিয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

১১। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, আমাদের দেশে এমনতর লেখকের অভাব নাই যাঁহার মতে মুসলমানি যুগে হিন্দু প্রজারা বর্ত্তমান ইংরাজি যুগাপেক্ষা অধিক সুখ সচ্ছন্দে বাস করিত, অন্ততঃ দু'বেলা পেট ভরিয়া দু'টি খাইতে পাইত। তাঁহারা কারণ দেখান যে সে সময়ে খাদ্য দ্রব্যের এ দেশ হইতে বিদেশে জাহাজে করিয়া চালান হইত না; দেশের জিনিষ ও দেশের টাকা দেশেই থাকিত। আমি কিন্তু ওমতে মত দিতে পারিলাম না। কেবল দেশে খাদ্য দ্রব্য সুলভ থাকিলেই পদানত হিন্দু প্রজা যে সুখে সচ্ছন্দে থাকিত তা বলা চলে না। আমি এইভাবে দেখি, আমি হিন্দুপ্রজা, আমার মুসলমান রাজা যদি আমার ধর্ম্মই নষ্ট করিল, আমার বাটীর মেয়ে ছেলেদের বে-ইজ্জৎ করিল, ত আমার ক্ষুধাই বা কি হইবে যে আমি পেট ভরিয়া খাইব?

১২। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ ও মড়কের প্রকোপ তখন দেশে বিলক্ষণ ছিল। রাজ্যে কোন ডিপার্টমেণ্টের শৃঙ্খলা ছিল না। সবই কাজির বিচার, খাম খেয়ালি, জুলুম জবরদস্তি, আর ঘুষের উপর চলিত। রাজধানীতে, সহর তল্লিতে, হিন্দুপ্রজা

যাইতে ভয় খাইত, থাকিত সে দূর গ্রামে গ্রামে; সেখানে চাষ বাস করিত আর নানা রোগে মরিত। মুসলমানি সময়কার কটা হাঁসপাতাল বা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য স্কুল কলেজ স্থাপনের কথা আমরা শুনিতে পাই? একটিও নয়। প্রজার সর্ব্বস্ব শুষিয়া তাঁরা ব্যয় করিতেন লড়ায়ে, ফৌজদের উপর, নিজেদের হমামে, হারেমে, মসজিদে, দুর্গে আর মরিয়া গেলে চমৎকার চমৎকার স্মৃতি শালায়। তাঁদের রাজ্যে ত বিদ্রোহের অনল লাগিয়াই থাকিত।

১৩। হিন্দু যদি পুনর্জীবন পাইয়া থাকে ত আমার মতে ইংরাজদের আমলে। আর পুনর্জীবন পাইয়াছে বলিয়াই আমি বলি যে হিন্দুসমাজ এই ভাবে সংস্কৃত হউক, পুনর্গঠিত হউক, যেন সেই সমাজকে পুনরায় মুসলমানের শ্রীচরণ-যুগল তলে না যাইতে হয়। আমি যখনই শুনি যে হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃত্ব হইল আর ইংরাজ বঁটাইয়া ভারতোদ্ধার হইল, তখনই আমার মনে ভয় হয়, পাছে মুসলমান রাজশক্তি পুনরায় হিংস্রক সর্পের ফণা তুলিয়া ভারতে বিচরণ করে।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

১। আর একটা কথাও বিশেষ স্মরণীয়। আমি যে ভীষণ মুসলমান যুগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে যুগে আমাদের বাংলা দেশে নেতাদের বল দিয়াছে, হিন্দুপ্রজাকে বিশেষ ভক্তি দিয়া হিন্দু ধর্ম্মে মতি রাখিয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম। উহা খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দী হইতে ১৮ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ তিন শত বৎসরে বাংলার অসংখ্য গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐরূপ ভাবে ছড়াইয়া পড়িবার প্রধান হেতু প্রথমতঃ—শ্রীচৈতন্যের আত্মপ্রতিভা। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর শিষ্যগণের ভিতর এ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি ঐশী শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁর উপর বিষ্ণুর ভর হইত। তাঁর স্বর্গারোহণের পর তিনিও বুদ্ধদেবের ন্যায় পূজিত হইতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ দেশের জনসাধারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদের পর, চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় সাম্য ধর্ম্ম, জাতি নির্ব্বিশেষের ধর্ম্ম, আর পায় নাই। বাংলাদেশ তখন মুসলমানের কবলে, স্বাধীনতা-হীন। দেশের লোকের মনে পরাধীনতার অন্ধকারের ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা ভাবিত যে তাহাদের সেই পরাধীনতাও ভগবানের লীলা মাত্র, বিষ্ণুর

মায়ার খেলা। তাই তাদের দুঃখের জীবনই স্বভাবতঃ ভগবানের উপর ভক্তি, বিষ্ণুর উপর ভক্তি, হৃদয়ে টানিয়া আনিয়াছিল। তৃতীয়তঃ বৈষ্ণবদের প্রতি, মুসলমান রাজশক্তির বিশেষভাবে কঠোর ব্যবহার। বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিজেদের ভিতর হইতে জাত্যভিমান উঠাইয়া দিয়া, একটা নূতন জাতি গুপ্তভাবে সৃজন করিতেছে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, এক ঈশ্বরের দোহাই দিয়া, এক হরির নাম লইয়া, ইহাই হইল মুসলমানদের মনে একটা সন্দেহের, ঈর্ষার কারণ, সতর্ক থাকিবার কারণ। ঐ হইল মহা পীড়নেরও কারণ। কত কত বর্দ্ধিষ্ণু বৈষ্ণব নেতা সমূলে নিহত হইয়াছেন, গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে আর বৈষ্ণব প্রজারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছে।

২। মুসলমানদের পীড়ন যত বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গালীর প্রাণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর ততই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। হিংস্র কাজীর একচোকো বিচারে বাঙ্গালী কাঁদিত, আর কাঁদিতে কাঁদিতে "হরি বিনা নাহি গতি" গান বাঁধিত। জাতীয় সুখের দিনে কেহকি কখনও হরিকে খোঁজে? না চায়? হরি, চিরদিনই দুর্দ্দিনের সম্বল, দুঃখীর সহায়। ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন গর্ব্বিত বৌদ্ধ হরিকে চায় নাই, ভগবানকে ডাকিবার কি খুঁজিবার

প্রয়োজন নাই বলিয়া মস্তক উচ্চ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবন চিরদিনই কি কখনও সমান যায়! সুখের দিন, গর্ব্বিত অবস্থার দিন কাটিয়া যায়, সন্ধ্যা আসে। অন্ধকার মেঘে জাতীয় জীবনকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে। বৌদ্ধযুগে আর বৈষ্ণব যুগে এতই প্রভেদ। বাঙ্গালী ও একদিন বৌদ্ধ-পন্থী ছিল। যখন মুসলমান বাঙ্গালীকে কাঙ্গালী করিয়া ছাড়িল, তখন দুঃখের চাপে কাঙ্গাল বাঙ্গালী হরির চরণযুগলে লুঠাইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে বাঁচিল। কাঙ্গাল বাঙ্গালীর ক্রন্দনের রোলে, চক্ষের জলে সিক্ত, বিদীর্ণ বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন হইল একছড়া মুক্তার হার, হরির পায়ে জড়াইয়া দিবার জন্য; তার নাম "সংকীর্ত্তন"।

৩। যে মাতৃভাষার সৃষ্টি হইল বৌদ্ধযুগে, তার পুষ্টি হইল বৈষ্ণবযুগে, মুসলমানদের প্রবল অত্যাচারে। যে জাতি কখনও বিজাতীয়, বিধর্ম্মী প্রভুর পদদলিত, নিষ্পেষিত হয় নাই সে কখনও বুঝিতে পারিবে না আমাদের "সংকীর্ত্তনের" ভিতর কি জাতীয় প্রাণদায়িনী শক্তি। যদি কখনও নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া থাক আর ঐ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া থাক ত বুঝিয়াছ উহাতে জাতীয় জীবন গঠনের কি মহাশক্তি নিহিত। ঐ সংকীর্ত্তনের পুষ্টিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণবী ভাষারও

শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। যে মাতৃভাষায় আমরা "মা" বলিয়া তৃপ্তি পাই, তার আর এক নাম "বৈষ্ণবী ভাষা" বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

৪। খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দী হইতে ১৮ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গমাতা কত খ্যাতনামা যশস্বী বৈষ্ণব কবি প্রসব করিলেন; তাঁদের উক্তি, তাঁদের কীর্ত্তি চিরদিন মাতৃ-ভাষার সঙ্গে জড়িত থাকিবে। তাঁদেরই ভাষাতে মন প্রাণ সিক্ত করিয়া, তাঁদেরই পদানুসরণে আজ আমাদের সাহিত্য জগৎ মাইকেল, হেম, নবীন, যোগীন্দ্র ও রবীন্দ্র প্রতিভায় উজ্জ্বল।

৫। একদিন ফরাসী জাতি ও বাঙ্গালীর ন্যায় কাঙ্গাল হইয়া, নিষ্পেষিত হইয়া, তাদের মাতৃভাষায় এক "সংকীর্ত্তন" রচনা করিয়াছিল। এবং একযোগে তাহা গাহিয়া স্বদেশকে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তার নাম জগৎ বিখ্যাত "মারসিলেজ"। উহা ফরাসী বিপ্লবের গান। আর আমাদের সংকীর্ত্তন, মুসলমান রাজশক্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার গান; হিন্দুর প্রাণে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা বজায় রাখিবার গান; বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রাখিবার গান।

৬। হিন্দু চিরদিনই ধর্ম্মকে জীবনের শীর্ষ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। যে বিজাতীয় প্রভু হিন্দুধর্ম্মকে বিতাড়িত

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারই সিংহাসন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে বিজাতীয় রাজশক্তি হিন্দুরমণীর সতীত্বের অবমাননা করিয়া, দাম্ভিক দুর্য্যোধনের মত অট্টহাস্যে তার রাজপ্রাসাদ কম্পিত করিতে সাহসী হয়, দুর্ব্বল নারী-শক্তির একমাত্র সহায় হরি, সেই স্বয়ং হরি, নারীর অবমাননা, লাঞ্ছনা সহ্য করেন না। তাঁর এক ফুৎকারে অনেক দাম্ভিক দুর্য্যোধনের রাজশক্তি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ভারতে রাজত্ব করিতেছেন বা করিবেন তাঁদের হিন্দুর হিন্দুত্ব ও হিন্দুনারীর সতীত্ব রক্ষার্থ বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

৭। যে হিন্দুধর্ম্মের গরিমা করিয়া থাকি, আমরা আজও সেই হিন্দুধর্ম্মকে বাংলাদেশে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে দিই নাই, সেই বীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুণে, তাঁদের বাংলার গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার সাহসের গুণে, মুসলমানদের নির্য্যাতন মাথা হেঁট করিয়া সহ্য করিবার গুণে, তাঁদের ত্যাগশীলতার গুণে, তাঁদের হস্ত লিখিত পুঁথি সকল গ্রাম্য মজলিসে, বারোয়ারিতে, পূজাপার্ব্বণে পাঠ করিবার ও করাইবার গুণে।

৮। যে মাতৃভাষাকে আমরা এত ভাল বাসি, যে মাতৃভাষাকে ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি, এ পরীক্ষাতেও স্থান দিয়াছেন বলিয়া আমাদের হস্তে অমরত্ব পাইয়াছেন, সেই

মাতৃভাষাকে, মুসলমান-পদদলিত বঙ্গভূমে, আরবি পার্সি ও কলমা পড়িবার দিনে, কল্লোলিনী প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় জীবিত রাখিয়াছিল বাংলার পল্লীতে পল্লীতে সেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

৯। তখনকার দিনে আমাদের জনসাধারণ পুরুষ প্রজা মুর্শিদাবাদে বা দিল্লীতে প্রায় যাইতেন না, বিধর্ম্মী নবাব রাজপুরুষদের ভয়ে। তাঁরা গ্রামবাসী পল্লীবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন নিজেদের ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য। ইহাতে যে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, তা পড়িয়াছিল আমাদের জাতিগত চরিত্রের উপর। তাহা নিবারণ করিবার উপায় তখনকার দিনে আর ছিল না। নবাব দরবারে হিন্দু প্রজার সংস্রব একরূপ ছিলই না। তাই আমাদের গ্রাম্য ও পল্লী জীবন ভরপূর রাখিবার জন্য, বার মাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা আর কাজির বিচার এড়াইবার জন্য পঞ্চায়েৎ করাইবার প্রথা ছিল।

১০। নিজ ধর্ম্মে ভক্তি, নিজ মাতৃভাষার উপর অন্তরের আসক্তি না থাকিলে একটা জাতি কখনও সৃষ্ট হইতে পারে না। আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গ, ভারতখণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্তে, পাণ্ডব-বর্জ্জিত বলিয়াই ইহা অতি প্রাচীন দেশ। ভারতমাতার সুবিস্তীর্ণ পূর্ব্বাংশে আমরা নিজ বুলি চালিত করিয়া বহু সহস্র

বৎসর বসবাস করিয়া আসিতেছি। ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের স্বাতন্ত্র্য অনেক। আমরা বৌদ্ধযুগে যে এক মহাজাতি ছিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের লক্ষণ সমস্তই এক পতিত মহাজাতির। আমরা নিজের ইতিহাস, নিজের গরিমা, নিজের মহত্ত্ব ভুলিয়াছি, তাই আমাদের এত হাহাকার এত দুর্গতি।

১১। আমরা কালচক্রে একটা মহামন্ত্র ভুলিয়াছি। সেটা এই—"যে আমার নিজ মাতাকে, দেশমাতাকে, মা, বলিয়া ডাকিবে সেই আমার ভাই"। ঐ মহামন্ত্র ভুলিয়া আমরা নিজ গণ্ডীকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছি। বৈষ্ণবেরা ঐ মহামন্ত্র পুনরায় দেশে প্রচলিত করিয়া একটা মহাজাতি সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

১২। আমাদের সুপ্রসিদ্ধ 'রামায়ণ' লেখক, কবিগুরু "কৃত্তিবাস" খ্রীষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন নেতা। তিনি ফুলিয়ার মুকুটী এবং আমার "কল্যাণের" স্বনামধন্য একজন পূর্ব্বপুরুষ। ইংরাজী কবিদের মধ্যে মিল্‌টন যেমন কবিগুরু, যাঁহাকে পঁচিশ বার না অধ্যয়ন করিলে কোন কবি, কবি হইতে পারেন না, বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে কৃত্তিবাসের

স্থানও সেইরূপ অতি উচ্চ ও সম্মানের। তাঁহাকে বারংবার অধ্যয়ন না করিলে বাংলায় কবি হওয়া যায় না; ভাষায় দখল, নিপুণতা, একাধারে সুললিত পদ্য রচনা করিবার শক্তি হয় না।

আমার "কল্যাণের" পিতা শ্রীমান ক্ষেত্রমোহনে তাঁহার সেই পূর্ব্বপুরুষের কবিত্ব শক্তি, সঙ্গীত শক্তি, ধীশক্তি, দেশমাতার প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরে প্রেম, চিন্তার গভীরতা, একাগ্রতা ও তন্ময়তা প্রভৃতি গুণাবলী বিষদভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি একজন দেবতুল্য ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। এইখানে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখিলাম।
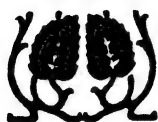
ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

১। আমাদের নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান। যখন বঙ্গদেশ মুসলমান-পীড়নে জর্জ্জরিত এবং সেই পাপে যখন মুসলমান-রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা, তখন দেশরক্ষার্থ, ধর্ম্মরক্ষার্থ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দ একযোগ হইয়া ক্লাইভ প্রমুখ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে উৎসাহ দেন এবং সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্‌শিদাবাদের মসনদ্ হইতে তাড়াইবার জন্য, কোম্পানির সহিত যে গুপ্ত বন্দোবস্ত করেন, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। সে অধ্যায় আলোচনা করিলে ঐ নেতৃবৃন্দের অসীম সাহস ও দায়িত্ববোধ দেশের লোকের কাছে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

২। যাঁহারা আজকাল বঙ্গ ইতিহাসে ঐ অতীত ঘটনার পর্য্যালোচনায় ব্যস্ত, তাঁহারা না্কি বলেন যে সিরাজ নিরীহ আর সেই নেতৃবৃন্দ অকৃতজ্ঞ নেমকহারামের দল। আমার প্রবীণ জ্ঞান এই সকল ভ্রান্ত নূতনত্বে মুগ্ধ হইতে পারিল না। আমার বিশ্বাস অটুট রহিল যে, তখনকার নেতারা সময়োচিত ঠিক কার্য্যই করিয়াছিলেন; নচেৎ জাতীয় ধর্ম্মজীবন ও ইজ্জৎ রক্ষা

পাইত না। তাই তাঁহারা এই দুরূহ ব্যাপারে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

৩। পলাশী যুদ্ধের পর, জয়ী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি কিরূপে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক নবাবকে সিরাজের স্থানে মুরশিদাবাদের মসনদে বসাইয়া নিজহস্তে বাস্তব রাজশক্তি টানিয়া লইলেন, কিরূপে সেই কোম্প্যানি দিল্লীর বাদসাহের নিকট বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার সুবেদারি প্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার ফ্যাক্টারী, "কলিকাতা" মহানগরীতে পরিণত হইল এবং ভারতে ইংরাজ-রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন হইয়া দাঁড়াইল, এই সমস্তই ইতিহাসের এক আশ্চর্য্যময় রহস্য। আমি ত ইহাতে বিধি-লিপিই দেখিতে পাই।

৪। তখনকার নেতাদের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, হিন্দুর হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখিবার ব্যাপারে, একজন কর্ম্মবীর। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, বিদ্যার, পদের ও অর্থের প্রভাবে তাঁহার নেতৃত্ব বৈষ্ণবেরা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা, স্মার্ত্ত-নৈয়ায়িকেরা, মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতেন। ঐ নেতৃত্বের ফলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ভগীরথ ভারতে গঙ্গা আনয়নে যে মহান উপকার সাধন করিয়াছিলেন, দেশের নেতারা বঙ্গে ক্লাইভ

প্রমুখ ইংরাজদ্বারা মুসলমানের রাজশক্তি চূর্ণ করিয়া এবং ইংরাজকে রাজপদে বসাইবার পথ সুগম করিয়া তদনুরূপ হিতসাধন করিয়াছিলেন। সেই জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম আর নাটোর রাজমহিষী রাণী ভবানীর নাম বঙ্গদেশে প্রাতঃস্মরণীয়।

৫। হিন্দুর হিন্দুত্বে, সতীর সতীত্বে ইংরাজ আমাদের শত্রু নয়। আমার মতে ইংরাজই হিন্দুদের পরম বন্ধু। হিন্দুরা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ক্রিয়া কলাপ ও সামাজিক আচার ব্যবহার সংরক্ষণের জন্য এতই উদ্বিগ্ন ও শশব্যস্ত, যে রাজনৈতিক মাথা ঘামাইয়া, নিজের দেশে নিজে রাজত্ব করিব স্বাধীনভাবে—এ ভাব, এ ক্ষুধা, এ তৃষ্ণা, এ চেষ্টা (মহারাষ্ট্র ও শিখদের অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর দৃষ্টান্ত ব্যতীত) তাঁহাদের হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হওয়াতেই ভারতে মুসলমান অত তেজে অত দর্পে সাত শত বর্ষ ধরিয়া রাজত্ব করিতে পারিয়াছিল।

৬। হিন্দুরা রাজত্ব পরিচালনে অপারগ বলিয়াইত মুসলমানদিগকে সরাইতে, তাঁহাদিগকে ইংরাজের সহায়তা লইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তাই বলি ইংরাজ হিন্দুর দুঃসময়ের বন্ধু। সেই বন্ধুবরকে, খেলাফতী মুসলমানদের সঙ্গে এক

যোগে, হৈ হৈ করিয়া অপদস্থ ও কোণ ঠেসা করিতে চেষ্টা করা হিন্দুদিগের পক্ষে অপৌরুষেয়, অনুচিত, অযুক্তিকর।

৭। হিন্দুরা কবে ভাবিবে, কবে দেখিবে, কবে বুঝিবে যে ভারতে মুসলমান আসিয়াছিল ভারতবাসীদিগের জাতিগত ও পুঞ্জীভূত দুর্ব্বলতা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে। সেই প্রায়শ্চিত্ত-কার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বেইত মুসলমান নবাবি সম্প্রদায়ের দাম্ভিকতা, বিলাসিতা, হিন্দুর প্রতি অত্যাচার এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের সময়টাও হিন্দুর প্রায়শ্চিত্তের সময়ের ভিতরেই আসিয়া পড়িয়াছিল।

৮। জাতীয় উত্থান ও পতনের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। এই কার্য্যকারণের নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্। এ বিশ্ব ত ভগবানের রাজ্য, তাঁহার লীলাস্থল। বিশ্বমাঝে যিনি যত বড় মহারাজ হউন না কেন—তিনি ভগবানের দাস্যভাব মাথায় বহন করিয়া চলিলেই তাঁর রাজত্ব টিকিবে; নচেৎ নয়। ধর্ম্মের ব্যত্যয় ভগবান্ সহ্য করেন না। অপ্রতিহত রাজশক্তি, দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে করিতে নিজ দণ্ডধারী ক্ষমতাতে এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ে যে ধর্ম্মের সঙ্গে সেই রাজশক্তি চালনের আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। ন্যায় কি অন্যায়, ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, এর বিচার লোপ পায়; পাপের ভার বাড়িয়া বাড়িয়া

জ্য-ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে থাকে। তারপর ভাঙ্গন
.র। ভারতে মুসলমানদের রাজশক্তির দশাও তদ্রূপ
ইয়াছিল।

৯। সেই ভাঙ্গনের ইতিহাস ভীষণ শিক্ষাপ্রদ। ভারত-
াতা মৌনী হইয়া মৃতহস্তীবৎ পড়িয়া আছেন, আর দেশী ও
াদেশী রাজশক্তি সব তাঁহার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া টানাটানি
রিতেছে যে কে তাঁর ভার বহন করিবে। যদি মাকে তখন
জ্ঞাসা করিতে "মা, তুমি হতে চাও কার," মার হৃদপিণ্ড হইতে
াণী শুনিতে "আমাকে যে মাথায় তুলে নেবে আমি তার"।
দই ফুটবলের ম্যাচে মহারাষ্ট্রী, শিখ, ইংরাজ, ফরাসী, ডাচ্
ব খেলোয়াড়।

১০। মুসলমানদের ঘাড়ে উঠিয়া তাহাদের চক্ষে ঠুলি দিয়া
াথচ ঠাণ্ডা রাখিয়া, মহারাষ্ট্রদের ভারত সিংহাসনে উঠিবার পথ
রাধ করিয়া, অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বী দিগকে হীনবল করিয়া,
দ্ধিমান ইংরাজ সমস্ত ভারত-খণ্ডের ভার মাথায় তুলিয়া
ারতের রাজসিংহাসনে ধীরে ধীরে যে উঠিতে সাহসী হইল—
াহার ভিতর কি এক অলৌকিক দৈবশক্তি নিহিত নাই?
ামার বিশ্বাস, আছে। দৈববল ইংরাজের সহায় না হইলে
এই মহৎ ব্যাপার ঘটিয়া উঠিতে পারিত না।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

১। যখন হিন্দু দেশবাসীদের মুসলমানী মোহ, ঘুম কাটিয়া গেল; যখন তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; যখন সৎশিক্ষার জন্য, সুবিচারের জন্য কাতর হইলেন, নূতন যুগ প্রবর্ত্তনের বাতাসে যখন তাঁহাদের স্থির, স্থবির, দগ্ধপ্রাণ, পুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল, তখন দেখা গেল যে দেশের কর্ণধার, চালক, কালচক্রের গতিতে বল, মহামায়ার লীলায় বল, আর ভগবানের কৃপায় বল, ইংরাজ রাজমুকুট পরিয়া রাজদণ্ড হাতে করিয়া ভারত সিংহাসনে আসীন।

২। আমরা হিন্দু, যুগমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করি। কলিযুগ প্রজার পক্ষে ভীষণ ক্লেশদায়ক। এই যুগের পরমায়ু এত অধিক যেন গুণিয়া উঠিতে পারা যায় না। এত কোটি কোটি বৎসর ব্যাপী ইহার পরমায়ু যে আমাদের মস্তিষ্কের সে ক্ষমতা নাই যে উপলব্ধি করে। তাই ভগবানের নিয়মে ঘোর কলির স্রোতের ধারার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে, মধ্যে মধ্যে কয়েক শতবর্ষব্যাপী কল্যাণকর সময় পাওয়া যায়. প্রজাদের হাঁফ ছাড়িবার জন্য, হৃদয়ে বল আনিবার জন্য, ভগবান্ যে একেবারে

নির্দ্দয় নির্ম্মম ভাবে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইয়া নাই সেইটাই প্রজাদের মনে বুঝাইবার জন্য।

৩। আমার মতে মুসলমানী যুগান্তে যে ভারতে ইংরাজী যুগ প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা আমাদের পক্ষে, এই ঘোর কলির ভিতর, নিতান্ত কল্যাণকর ও হিতপ্রদ। সর্ব্বতোভাবে এইটি ভারতের ইতিহাসে একটি মহৎযুগ। এটি কাগজ কলমের যুগ, রাজ দপ্তরে ছাপান রেকর্ড রাখিবার যুগ, হিসাব নিকাশের যুগ, প্রতিহাতে কৈফিয়ৎ দিবার যুগ, আইন আদালত ও নথী দুরস্তের যুগ। যাতে কুবিচার না হইয়া সুবিচার হয়, যাতে যথেচ্ছাচার, রাজশাসনে বিশৃঙ্খলতা বা অরাজকতা না হয়, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়, এই সেই যুগ।

৪। এ যুগে নিজ বুদ্ধিবলে, বিদ্যাবলে, চরিত্র-বলে, মুখস্থ করিয়া একজামিনের পাসের বলে, সুপারিসের বলে, প্রজার যতদূর ক্ষমতা সে উচ্চে উঠিতে পারিবে, তাতে রাজদ্বেষ নাই, রাজহিংসা নাই। কোন ধর্ম্মে বা ধর্ম্মব্যাপারে রাজবৈরিতা নাই, রাজ-হস্তক্ষেপ নাই। ইহা ভারতের পক্ষে বৌদ্ধ যুগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যুগ।

৫। ইহা সর্ব্ববিদ্যা চর্চ্চার যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, ইলেক্‌ট্রিক লাইট ফ্যানের যুগ; মোটর, টেলিফোন, গ্রামোফোন, বায়স্কোপের

যুগ। ইহা এয়ারোপ্লেনের যুগ, ওয়ারলেসের, টেলিভিষণের যুগ। ভারতখণ্ডকে বিশ্বমাতার কোলে তুলিয়া ধরিবার যুগ। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের যুগ, ভারতবাসীদের ব্রিটিশ এম্পায়ারে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্' পাইবার যুগ। ইহা সয়তানী যুগ বলিয়া, হাত গুটাইয়া পা মুড়িয়া, টিকি উড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া মহাত্মা সাজিয়া, মুর্খ দেশবাসীদের একটা ভুল রাস্তা দেখাইয়া দিলে চলিবে না।

৬। এই প্রকাণ্ড ভারত একটা মহাদেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ভারত আবহমানকাল হইতে কত কোটি কোটি আর্য্য অনার্য্যের, কত ধর্ম্ম উপধর্ম্মের মাতৃভূমি হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ভিতর কত রকমের সমাজ, কত রকমের ভাষা, বুলি, কত রকমের সভ্যতা, আচার বিচার সংস্কার। এই ভারতে একচ্ছত্রে রাজত্ব করা, এক আইনে আসমুদ্র হিমাচল শাসন করা, দেশ-শত্রুকে যুদ্ধের সারঞ্জামে ভয় দেখাইয়া দূরে রাখা এবং দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষা করা কম গুরুভার নয়। এই গুরুভার বহন করিয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যের ছত্র মাথায় খুলিয়া চলিয়াছে, ভারতের সকল শ্রেণীর প্রজার কল্যাণের জন্য।

৭। তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজও তার ব্যবসা বাণিজ্যের এবং অর্থসমাগমের উন্নতি সাধন করিয়া লইতেছে, সত্য। নিজ

জাতীয় লোককে নানা প্রধান প্রধান উচ্চকর্ম্মস্থানে বসাইয়া ব্রিটিশ প্রভাব বাড়াইয়া লইতেছে, সত্য। মোটা মাহিনা ও পেনসানের প্রলোভনে ব্রিটিশ ছোকরারা এদেশে আসিতেছে এবং গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কাজ করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে, সত্য। তা যদি উহারা না করিত, তাহা হইলে মূর্খতার পরিচয় দিত। আমরা যদি বিলাতে রাজত্ব করিতে যাইতাম তাহা হইলে আমরা কি করিতাম, ভাব দেখি।

৮। তাহারা কত দূরদেশ হইতে আসিয়া তোমাদের দেশের সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, কোন্ কাজ-কর্ম্ম উহারা না করিতেছে, এটা স্মরণ রাখা উচিত। এদেশটা যে এখন ব্রিটিশ-শাসিত ভারত, তাহা জগতকে দেখান ও নিজেদের ভিতর উপলব্ধি করা ব্রিটিশদের পক্ষে বিশেষ দরকার। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট তাহা না দেখাইতে পারিলে, ইউরোপ খণ্ডে তাঁহাদের মান সম্ভ্রম কি করিয়া থাকিবে? উহাঁরা যে নামাবলী গায়ে দিয়া, হরিনাম করিবার উদ্দেশে আসেন নাই, আর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আমাদের হস্তে সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে আসেন নাই—তা তুমি তাঁকে যতই বঁটাইয়া দেও না কেন—এই দুইটি সত্য উপলব্ধি করা, আমাদের নিতান্তই প্রয়োজন।

৯। আর একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমাদের হস্তে সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া উহাঁরা যদি জাহাজে স্বগৃহাভিমুখী হয়েন, তাহা হইলে আমার ত ধ্রুব বিশ্বাস, যে ত্রিরাত্রের মধ্যে দেশে এত অরাজকতা, খুন খারাপি, লুটতরাজ, হইবে যে আমাদের সেই দুর্দ্দিনের হিন্দু নেতারা দেশ সামলাইতে পারিবেন না। ইংরাজ বন্ধুকে তারযোগে ফিরিয়া আসিবার নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হইবে। আমাদের নেতারা রাজ্য পরিচালন কার্য্যে অশিক্ষিত অনভ্যস্ত এখনও, আর তখনও থাকিবেন। ইংরাজ পুলিশের, ইংরাজ সৈনিকদের, আমাদের ঘরবাড়ী দেশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইংরাজ পুলিশ ইংরাজ সৈনিক না থাকিলে ত মুসলমানেরা হিন্দুদের কাটিয়া ভাগীরথীর জল লাল করিয়া ফেলিবে। আমার বিশ্বাস যে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা-কলহে ইংরাজরা আমাদের সহায়তা না করিলে হিন্দুরা নিশ্চিত হারিবে।

১০। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এদেশে তোমার কাজের জন্য নিযুক্ত হইয়া, অবশ্যই বেশী মাহিয়ানা, বেশী পেনসান চাহিবে। তুমি তাহা দিতে বাধ্য। সব দেশেই সাংসারিক খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। কম পয়সায় আর চলেনা, বিশেষতঃ বিলাতে। সেখানে ছেলে মেয়েদের ভাল স্কুল কলেজে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া

তোলা কত ভীষণ ব্যয়সাধ্য তা ত আমরা নিজেদের ছেলেদের এখন বিলাতে পাঠাইয়া বিলক্ষণই জানি। আর যখন আমাদের বিলাতী সাহেবদের লইয়া একরূপ ঘর করিতে হইতেছে, তখন উহাদের বিলাতী ঘরকন্না যাতে বিলাতী ভদ্রভাবে চলিতে পারে তাহাও ভাবা উচিত।

ভাল, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ ইংরাজ স্বদেশ ছাড়িয়া তোমাদের দেশে তোমাদের কাজ করিতে আসিবে আর তাহারা মোটা মাহিনা ও পেন্‌সান পাইবে না, ইহা কি কাজের কথা!

১১। আমরা সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদের উপর আমাদের দেশ রক্ষার্থ বা সুশাসনার্থ নির্ভর করিতে পারি নাই বলিয়াই আজ দেশে "স্বরাজ" "স্বরাজ" করিয়া এত আন্দোলন। "স্ব রাজ" জিনিষটা যে কি তাহা হয়ত স্বরাজির দল বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমিও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই।

১২। ভারতে হিন্দু মুসলমান একযোগ না হইলে বাস্তব স্বরাজ (অর্থাৎ "আপন রাজ", অর্থাৎ "স্বাধীনরাজ", অর্থাৎ এমন রাজ যে রাজের উপর ইংরাজদের টুঁ করিবারও ক্ষমতা থাকিবে না) স্থাপিত হইতে পারে না। এটা মূল সত্য। আর একটা মূল

সত্যএই যে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর একতা বা ভ্রাতৃভাব স্থাপনের ভিত্তি আজও উদ্ভাবিত হয় নাই, বুঝিবা কখনও হইবে না। আমার মতে ঐরূপ ভিত্তিহীন, অসার, ও মৌখিক ভ্রাতৃ-ভাবের কিছুমাত্র প্রয়োজনও নাই।

১৩। ভগবান করুন, দেশের হিন্দু নেতারা আর চঞ্চল-মতি যুবকেরা যেন কখনও এদেশের মুসলমানদের প্রলোভনে না পড়েন। ইংরাজ যে কোনও কারণে এদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে, হিন্দুপ্রজাদের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না। তখন মুসলমানদের অত্যাচার হইতে হিন্দু প্রজাকে বাঁচাইবে কোন্ রাজশক্তির বলে? কোন্ বলে দেশমাতাকে আফগানি-সৈন্য পারস্য-সৈন্য, তুর্কী-সৈন্য হইতে রক্ষা করিবে? উহারা এক-জোট বাঁধিয়া আসিবে আর এদেশের মুসলমানেরা স্বধর্ম্মীদের সহায়তা করিবে। এইরূপে কি দেশমাতাকে পুনরায় মুসলমানী পদে বেইজ্জৎ করিতে দিবে?

১৪। দেশমাতাকে ভারতমহাসাগরে ডুবাইয়া দাও ও নিজেরাও ডুবিয়া মর, গলায় দড়ি দাও লক্ষগুণে তাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু ভারতে আবার মুসলমান রাজা! ভারতমাতা আবার মুসলমানী রাজশক্তির হারামের দাসী! ইংরাজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে ফললাভ উহা ভিন্ন আর কিছুই

হইতে পারে না। তাই বলি হিন্দু, তুমি সাবধান হও। ইংরাজ রাজছত্রের নীচে দাঁড়াইয়া তুমি যত বড় হইতে ইচ্ছা কর হইতে পারিবে। কিন্তু তুমি স্বাধীনভাবে "স্বরাজ" চালাইতে চেষ্টা করিও না। মানিয়া লও তোমার সে স্বাধীনতা পাইবার ক্ষমতা নাই, আর তাই ভগবান্ বিমুখ।

১৫। আর একটা কথা আমাদের খুব স্মরণীয়। ইংরাজ ত মূর্খ জাতি নয়, ইংরাজ একটা আর্য্য-ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব বীর জাতি, আর নিতান্ত স্বদেশভক্ত। হিন্দু-মুসলমানীযুগে আমরা রাজদ্রোহিতার কথা কত পড়িয়াছি। কিন্তু ইংরাজদের ইতিহাসে, যাহারা ইংলণ্ডের নেমক খাইয়া, ইংলণ্ডের নামে দূর দেশে শাসন করিতে গিয়াছে বা দূর দেশ জয় করিতে গিয়াছে, তাহারা কখনই কার্য্যান্তে ইংলণ্ডের বিপক্ষে খাড়া হইয়া নিজ পতাকা উড়াইয়া নিজেকে সেই দেশের রাজা উপাধি দেয় নাই। যাহা ইংরাজেরা করে তাহা ইংলণ্ডের গৌরব বৃদ্ধির জন্য করে, ইংলণ্ডের রাজার নামে করে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় ক্লাইভ ও হেষ্টিংস্ চক্রান্ত করিয়া বোধ হয় সহজেই নিজ নিজ নামে এখানে রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহাদের সে কুমতি হয় নাই। ইংরাজদের য, বলিয়া গালি দেও না কেন, ওরা ওদের স্বজাতীর পক্ষে

"নেমক-হারাম," এ অপবাদ, এ গালি তুমি দিতে পার না। উহারা স্বদেশের, স্বজাতির, গৌরবের জন্য প্রাণপাত করিতে জানে। আর তা জানে বলিয়াই উহাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত। পৃথিবীতে পাঁচটী মহাদেশ; সকল মহাদেশেরই কতক অংশ ইংরাজদের।

১৬। আর একটা ইংরাজদের মহাগুণ এই যে,—যেখানে উহারা ত্যাগ স্বীকার দেখে, বীরত্বের ও সৎগুণের পরিচয় পায়; সেখানে উহারা সম্মান করিতে জানে। ওরা দিতেও পারে ভরা মুক্ত-হস্তে। ভারতে ইংরাজদের আবির্ভাব দৈবশক্তির কৃপায় হইয়াছে যদি স্বীকার করিতে পার, তাহা হইলে আমি আরও বলি যে, ইংরাজ জাতির সৎগুণ-সকল ভারতের সকল শ্রেণীর প্রজার পক্ষে নিতান্ত অনুকরণীয়। ইংরাজকে গুরু মানিয়া পার্থিব ও জাতীয় উন্নতিকল্পে হিন্দু যেন অগ্রসর হন। ভগবানের হিন্দুর প্রতি এই বিশেষ ইঙ্গিত।

১৭। ভারত প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদেরই দেশমাতা, সর্ব্বাগ্রে। পৃথিবীতে ভারত ছাড়া হিন্দুদের আর অন্যত্র কোথাও স্থান নাই। মুসলমানদের মক্কা আছে, মদিনা আছে। ভারতের পশ্চিমে পেশোয়ার, সেখান হইতে ধর:—আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, আরব, তুরস্ক, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার সমস্ত প্রদেশ ও

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব্ব-উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডেই ইস্‌লামী ধর্ম্ম সুতরাং ঐ সকল স্থানে ভারতীয় মুসলমানগণ গিয়া বসবাস করিতে পারে। আর আমার মনে হয়, তাহা হইলে ওরাও বাঁচে আমরাও বাঁচি। গরীব ভারতের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া এ টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ির প্রয়োজন কি ?

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

১। অতীতের সহিত আমাদের বর্ত্তমানের এত ঘনিষ্ঠ ম্বন্ধ যে মুসলমানী যুগ হইতে ইংরাজী যুগে পা দিতে এবং ংরাজী যুগের বিশেষত্বটা বুঝাইতে আমাকে অনেক কথা বলিয়া ফলিতে হইল যাহাতে পলিটিক্‌সের গন্ধ ভরপূর। যখন হিন্দু মাজ চতুর্দ্দিকের পলিটিক্‌সের ও পলিসির চাপে সমুদ্রবৎ ালোড়িত, তখন সামাজিক চিত্র আঁকিতে গেলেই, তার উপর এখনকার পলিটিক্‌সের ছায়া কিঞ্চিৎ না ফেলিলে চলে না।

২। আর প্রত্যেক জীবনটাই সমাজ-সমুদ্রে এক একটি উদ্বেলিত ভেলার মত। সেই ভেলার নাচে কিসের জল, কত গভীর জল; উপরে নীল আকাশ কি মেঘাবৃত বা ঝোড়ো-াতাসে ভরপূর—আর ভেলাটাই বা কিসের, কাগজের কি কাঠের কি লোহার? এসব না দেখাইলে—কোন জীবনীরই সার্থকতা থাকে না। মুসলমানী যুগ হইতে ইংরাজী যুগে যাইতে আমি আমার "কল্যাণকে" ভুলি নাই জানিবেন।

৩। কল্যাণের পূর্ব্বপুরুষেরা, পিতৃগোষ্ঠি মাতৃগোষ্ঠি স্থাপন কর্ত্তারা খৃঃ ১৮ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই সুতানুটী গ্রামে ইংরাজদের অধীনে তাঁদের ফ্যাক্টারিতে বসবাস ও চাকরি

বাকরি আরম্ভ করিয়া দেন। দুই পক্ষই পূর্ব্ববঙ্গের পুরাতন যশোহর জিলার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে ঘর দ্বার ছাড়িয়া আসেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন কালচক্র কোন্‌দিকে ঘুরিতেছে। মুসলমানের রাজশক্তি নামিয়া আসিতেছে আর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুবেদারী জোরে উঠিতেছে। ঐসুযোগে অনেক পরিবার নিজেদের চির-দৈন্য ঘুচাইবার জন্য বাংলার নানা জিলা মহকুমা হইতে তাঁহাদের নিজ পল্লীভূমি ও বসবাসকে লম্বা সেলাম করিয়া ইংরাজদের দোহাই লইয়া উঁহাদের প্রজা হইয়া 'কলিকাতা' ইংরাজ রাজধানী স্থাপনে সহায়তা করেন। ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠন, এই চিরন্তন প্রথা।

৪। কিন্তু দেশ তখনও মুসলমানী লেখাপড়ায়, আদব কায়দায়, বেশভূষায় পূর্ণ। সর্ব্বত্রই মুসলমানী চাল্ চলন। কলিকাতায় ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত "সদর দেওয়নী আদালতে" আপীল মোকদ্দমার শুনানী হইত উর্দ্দূতে। দলীল দস্তাবেজ লিখিত পঠিত হইত পার্সিতে। বাঙ্গালীর ছেলেরা উত্তম পার্সিনবিস হইতেন, পার্সি ভাষায় সুন্দর সুন্দর পদ্য রচনা করিতেন। তাইত রাজা রামমোহন রায় বাল্যাবস্থায় পার্সি ও আরবীতে উৎকৃষ্ট দখল পাইবেন বলিয়া—ঐ চর্চ্চার পীঠস্থান "পাটনা" নগরীতে লেখাপড়া শিখিতে যান। এব

সময় "পাটনা" বা "পাটলী পুত্র" মহারাজ অশোকের রাজধানী ছিল; বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের কেন্দ্রস্থান ছিল। কিন্তু ইহার কিংবদন্তীও রাজা রামমোহনের কর্ণে প্রবেশলাভ করে নাই। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে দেশটা কতদূর মুসলমানী "কালচারে" বা ইসলামী সভীতার স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছিল।

৫। আমাদের চিরন্তন সর্ব্বোচ্চ স্বদেশী "কালচার" ছিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতী 'কালচার'। গায়ে নামাবলী, মাথায় টিকি, হাতে পুঁথি, খালি পা আর পরণে এক ধুতি; নামাবলীর বদলে জোর গায়ে গামছা বা উড়ানি। আর পাঠ্য ছিল বিশেষ বঙ্গদেশে স্মৃতি আর ন্যায়; আর কাশীধামে বেদ, বেদান্ত, ষড়দর্শন। সাহিত্য এবং কাব্য-অলঙ্কারের চর্চ্চাও হইত, কিন্তু দুই স্থানেই কম। আর এই কালচারকে কোণ ঠেসা করিয়া ফেলিয়াছিল আমাদের কোরাণ কল্‌মার বন্ধুরা। হিন্দু যুবকেরা পার্সিভাষায় ও উর্দ্দূতে ওস্তাদ হইয়া যাহাতে অর্থাগম হয়, দু'পয়সা ঘরে আসে, তার জন্য মুসলমানী আদালতে মুসলমানী বেশে মোক্তারি, সেরেস্তাদারী ও ওকালাতীতে খুব পারদর্শিতা দেখাইতে চেষ্টা করিতেন; পরিশ্রম করিয়া মুসলমানী আইনকানুন শিখিতেন।

৬। মুসলমানদের আমলে অর্থাৎ দিল্লার গদিতে আকবর

সা হইতে বঙ্গে সিরাজের সময় পর্য্যন্ত যে কিভাবে কোন্ আদালতে জন-সাধারণ প্রজারা সুবিচার পাইত, সে সব বিচারের প্রণালীই বা কি ছিল তাহা আমি বোধ হয়—কোনও ভারত-ইতিহাসে পড়ি নাই। মাসিক কাগজের প্রবন্ধে তাহা পড়িয়াছি কি না স্মরণ নাই। এ অজ্ঞতা সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন। সুবিচারের উপর মুসলমানী রাজাদের দৃষ্টি তত ছিল না। তবে কোতোয়াল ছিলেন, আর কাজি ছিলেন। দেশে কাজির বিচারই হইত; তার মানে তাঁর যাহা ইচ্ছা সেইরূপেই বিচার হইত। তাঁর বিচারের উপর কোন আপীল চলিত কি না আমার জানা নাই।

৭। দিল্লীর বাদসাহেরা ও নবাব সুবেদারেরা দরবার করিতেন পড়িয়াছি। কিন্তু সে সব দরবারে কিরূপ আর্জ্জি পেষ হইত আমার জানা নাই। তবে কোনও কোর্টের মত সে সব দরবারে কার্য্য হইত না, এইটাই আমার বিশ্বাস। তাই যদি হইবে ত কাজি ছিল কেন? মোটের উপর এই বলিলেই চলে যে মুসলমানী সময়ে কাজির হস্তে হিন্দু প্রজারা সুবিচার পাইতেন না। সে যুগে কোন্ শ্রেণীর লোকে হিন্দু আইন চর্চ্চা করিতেন এবং কাজিকে তাহা বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা আমার জানা নাই।

৮। যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বেহার উড়িষ্যার সুবেদারি পাইলেন, যখন এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের গুরু-ভার তাঁহাদের হস্তে আসিয়া পড়িল তখন কি হিন্দু কি মুসলমান প্রজারা যাহাতে নিরপেক্ষভাবে সুবিচার পায়—এই চেষ্টাটাই কর্ত্তাদের হৃদয়ে বলবৎ দেখিতে পাওয়া যাইত। ইংরাজেরা নিজেদের দেশে, তাহাদের রাজাদের নিকট হইতে নিরপেক্ষভাবে সুবিচার পাইবার জন্য কতই না লড়িয়াছে, প্রাণপাত করিয়াছে। রাজা, প্রজাদের নিরপেক্ষভাবে বিচার পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে কখনই প্রজাবৎসল হইতে পারেন না, এ সত্যটা ইংরাজেরা নিজদেশের ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া বিশেষভাবে বুঝিয়াছিল।

৯। বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার সমস্ত দেওয়ানি আপীল কলি-কাতায় ইংরাজ বিচারক শুনিবেন বলিয়া এখানে সদর-দেওয়ানি আদালত বসিল। কলিকাতায় ইংরাজদের ফ্যাক্টারির ভিতর-কার প্রজারা সুবিচার পাইবে বলিয়া সুপ্রীম-কোর্ট বসিল। হিন্দুদের হিন্দু আইন মতে বিচার হইবে বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় সার উইলিয়াম জোন্স নিজে সংস্কৃত শিখিয়া মনুসংহিতা ইত্যাদি কত গ্রন্থ তরজমা করিয়া ফেলিলেন এবং স্বনাম ধন্য ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে হিন্দু

আইনের সার নির্ব্বাচন করাইয়া লইলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন "কল্যাণের" মাতৃগোষ্ঠীর একজন দেশমান্য পূর্ব্বপুরুষ ও কুলতিলক।

১০। হিন্দু আইন সমুদ্রবৎ। তাহা মথিত হইয়াছিল ইংরাজদের বিচারালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর। ইংরাজ হিন্দু-আইনকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়াই দেশবাসীরা তাঁহাদের কার্য্য-কলাপে খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁহাদের যে একটা সৎইচ্ছা আছে, এই ভাবটা দেশবাসীদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই জন্য তখনকার দিনে ইংরাজ শাসন-কার্য্যে হাজারও ভুল করিলে দেশবাসীরা তাহা সহ্য করিয়া ইংরাজদেরই সমর্থন করিতেন।

১১। এইরূপে সদ্ভাবে, আইন কানুনের ভিতর দিয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা বড় বড় ইংরাজ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানতঃ তাঁদের মানসিক প্রতিভায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। "আমরা আর মুসলমানদের প্রজা নই, নব-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ রাজের প্রজা," এই ভাবটার ভিতর দিয়া একটা শক্তি হিন্দু প্রজাকে স্পর্শ করিয়াছিল। 'আমরা যা'দেরই দাস হই না কেন আর "মুসলমানদের" দাস নই' এই ভাবটাতে দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

১২। বঙ্গে তথা ভারতে (কিন্তু যতটা বঙ্গে ততটা আর কোথাও নয়) এই ইংরাজ সংস্পর্শে একটা নব-যুগ সৃষ্ট হইয়াছিল। বাংলার ঘরে ঘরে ইংরাজী শিক্ষার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। সর্ব্বত্রই একটা ইংরাজী ফ্যাসানের ঢেউ উঠিল, বাঙ্গালী অবাধে ইংরাজদের সঙ্গে মিশিতে শিখিল, ইংরাজী বুলি বলিতে শিখিল। বাঙ্গালী মদ মুরগী খাইতে, গির্জ্জায় গিয়া খৃষ্টান্ হইতে এমন কি খৃষ্টান-কন্যা বিবাহ করিতেও সাহসী হইল।

১৩। বড় বড় ইংরাজ কুঠিওয়ালা সাহেবদের বড় বড় বাঙ্গালী মুৎসুদ্দি চাই এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক কেরাণীর দল ত চাই-ই। ইংরাজ কোম্পানির দপ্তরেও কর্ম্মঠ শিক্ষিত কেরাণী-বাবুদের খুবই প্রয়োজন। কাজেই ইংরাজী লিখিতে পড়িতে ধূর্ত্ত বাঙ্গালী তৎপর হইয়া উঠিল এবং হুড় হুড় করিয়া ইংরাজদের অধীনস্থ চাকরির চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

১৪। মাসটা গেলেই মাহিয়ানাটা পাইব, এই সুখে বাঙ্গালী মুসলমানদের আমলে একেবারেই বঞ্চিত ছিল। মুসলমান-দের সময়ে টাকাকড়ির, বিশেষ নবাব সরকারের আমলাদের মধ্যে বড়ই অনাটন্ ঘটিত। ইংরাজ রাজত্বে মাসমাহিয়ানার সুবিধাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। গরীব বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল

ইংরাজদের রাজকার্য্যের শৃঙ্খলায়, টাকাকড়ির আদায় উসুল, খরচ পত্রের বিলি বন্দেজ ও হিসাব নিকাশ দেখিয়া; আর কর্ম্মচারিদের মাস-মাহিনার বান্দোবস্তে। "নাই বা হল আমার জমিদারী, পে আর পেনসান পাব ত আমি" এই সুরটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে সদাই বাজিত আর তিনি সুখে কলম পিশিতেন। তখনকার দিনে জমিদারী থেকে টাকা আদায় করা ছিল বিষম ব্যাপার। কাজেই বাঙ্গালী ইংরাজকে ও ইংরাজীকে বিশেষভাবে চর্চ্চা করার সরল পথই লইয়াছিল।

নবম উচ্ছ্বাস।

১। বাংলায় ইংরাজ অভ্যুদয়ের ঐ নবযুগ যাহাতে স্থায়ী হয়, দেশে তাহারই গবেষণা চলিতে লাগিল। ইংরাজ চরিত্র এত বড় হইল কিসের গুণে ?. তাহাদের শিক্ষার গুণে। তাহাদের শিক্ষার ভিত্তি কি ? পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যে যথা :— প্লেটো, এরিষ্টটল, বেকন, বাইবেল, সেক্ষপিয়ার, মিলটন, স্পেনসার ইত্যাদি। বাঙ্গালীকে এই পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করাইতে না পারিলে বাঙ্গালী ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী যাহাতে মানুষ হয়, ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরাজকে যাহাতে বিশেষভাবে অনুকরণ করিতে পারে এবং ইংরাজের মহৎ-গুণ সকল নিজেদের আয়ত্তে সহজে আনিতে পারে, এই সৎইচ্ছাই তখনকার চীফ জষ্টীস ইষ্ট সাহেবকে, লর্ড মেকলেকে ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ নেতৃগণকে পরিচালিত করিয়াছিল।

২। যে দিন ঘোষিত হইল যে, বাঙ্গালীকে আর আরবি পার্সি পড়িতে হইবে না, তার লেখাপড়া সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী মত হইবে, সেই দিন যথার্থই ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত নব যুগের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। কলিকাতায়

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ নব যুগের এইটাই বিশেষ ফল। ইহার দ্বারা একটা সৎকাজ ইংরাজ সাধন করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর ছেলে আর কখনও কোরাণ-সরিফে বা আরবি পার্সিতে মুগ্ধ হইয়া মুসলমানী দাসত্ব স্বীকার করিবে না। ঘরের বিড়াল বনে গিয়া যে বনবিড়াল হয়, বাঙ্গালীর অদৃষ্টে তাহা আর হইবে না। হিন্দু কলেজের কল্যাণে বঙ্গের সমাজ-তরী, মুসলমানী সভ্যতা বা "কালচার"কে লম্বা সেলাম করিয়া, তার সঙ্কীর্ণতাকে পদাঘাত করিয়া, নিগড় ছিঁড়িয়া মহাসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে সাহসী হইল।

৩। সেই সঙ্গে উত্তেজনা আসিল। ব্রিটন্ দ্বীপে, ব্রিটিশ প্রজা যেরূপ স্বাধীন, আমরা হিন্দুরাও ব্রিটিশ প্রজা হইয়া সেইরূপ স্বাধীন। এই স্বাধীনতার স্বপ্ন-স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। হিন্দুকলেজে ইংরাজী শিক্ষার জোরে দেশ তোলপাড় হইতে লাগিল। প্রোফেসার ডিরোজিয়ো প্রমুখ মহা-প্রাণ শিক্ষকদের লেকচারে, কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে, স্বাধীন চিন্তার বেগে, নাস্তিকতার স্রোতও ছোকরাদের ভিতর প্রবলভাবে বহিতে লাগিল। নাস্তিকতায় জীবনে কোনও বাঁধন থাকে না। তাঁহাদের দশাও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের বিশৃঙ্খল জীবনের অনুকরণে অনেক ভাল ঘরের ছেলেরা সে ওজস্বিনী শক্তি সমীচানভাবে হজম

করিতে না পারিয়া যে গোল্লায় যাইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

৪। বাঁধা হাত, বাঁধা পা, খোলা পাইলে খুবই ছট্ ফট্ করে। সেই ছট্‌ফটানিতে হয়ত ঘরের অনেক মেজ, লণ্ঠন টেবিল, চৌকি, দেয়ালের ছবি বা পূর্ব্বপুরুষদের স্থাপিত বিগ্রহ চুরমার্ হইয়া যায়। ঐ অশুভের ভিতর এই টুকুই শুভ যে, ঘরের ছেলে জড়ভরত হইয়া বসিয়া নাই, তার ভিতর প্রাণ বহিতেছে। সে পোড় খাইয়া, ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারিলেই ভালর দিকে যাইবে। আমাদের দেশেও তাহাই হইয়াছিল। ইহাতে জাতীয়ভাবে ভীত হইয়া বসিয়া থাকিবার কাল নাই। ভালর দৃষ্টান্ত যেরূপ মহৎ উপকারী, জাতীয় জীবনে মন্দের দৃষ্টান্তও সেইরূপ। স্বনামধন্য ভূদেব বাবু এবং মাইকেলের জীবন চিত্রই ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। দুইজনেই সমসাময়িক এবং দুইজনেই হিন্দুকলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র। দুইজনের ভিতর খুব মিত্রতা থাকিলেও চরিত্রের কি বিষম প্রভেদ। ভূদেব বাবুর স্থির, ধীর, সৌম্য, ধার্ম্মিক প্রকৃতি, সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। মাইকেলের জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। যদিও কবিত্ব প্রতিভায় তিনি বঙ্গে অতুলনীয়, তথাপি তিনি দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত বিফলতাময় নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই যেন দেশবাসীর

নিকট জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে—"আমি যে পথে আসিয়াছি তাহা পরিত্যাজ্য।"

৫। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। তার কিছু পরেই "কল্যাণের" পিতামহ কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তাঁহার ইংরাজী লেখাতে বিশেষ দখল ছিল। কোনও বড় সুপারিসের বলে, এবং তিনি দরজিপাড়ার বড় ঘরের ছেলে বলিয়া, বঙ্গের লাট দপ্তরে মোটা মাহিনায় ঢুকিতে সমর্থ হয়েন। তিনি আজীবন ঐ দপ্তরে কাটাইয়া যান এবং সুকর্ম্মী বলিয়া "রায় বাহাদুর" খেতাবও পাইয়াছিলেন। তিনি দরজিপাড়ায় ও অন্যান্য স্থানে পৈতৃক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

৬। কৈলাস বাবু একটু বেশী রকমের গোঁড়া ছিলেন। তাঁর তিন স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীও এক পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। পুত্রের নাম ক্ষেত্রমোহন, ইনিই আমার কল্যাণের পিতা। প্রতিবাসীরা এঁকে "পাগলা খেতু" বলিত। ইনি চিরদিনই লেখাপড়া লইয়া থাকিতেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান লাভ করিয়া যশস্বী হয়েন।

৭। ক্ষেত্রমোহন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তিনি নিতান্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। সদাই যেন বুদ্ধদেবের মত কি মহৎ চিন্তায় তাঁর মনঃপ্রাণ নিয়োজিত থাকিত। সে সময়ে বঙ্গদেশে আর এক যুগের প্রবর্ত্তন হয়—তার নাম "ব্রাহ্ম-সমাজ যুগ"। সে যুগে কেশব বাবুর বক্তৃতার প্রতিভায়, হিন্দু সমাজকে সংস্কার করিবার সৎইচ্ছায় দলে দলে হিন্দু যুবক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া, পৈতৃক ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইতেছিল।

৮। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বযুগে, হিন্দুকলেজের প্রভাবে দেশ মদিরায় প্লাবিত হইতেছিল। খৃষ্টান মিশনারিদের প্রতিভায় অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুবাড়ীর ছেলেরাও গ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় নাই; এই ভাবিয়া—যে, রাজধর্ম্ম অনুকরণীয় বা ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে ভাগ্যে রূপসী স্ত্রী আর রাজসরকারে মোটা মাহিনার চাকরি এই দুয়েরই সুবিধা হইবে। কেশব বাবু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইয়া এই প্রলোভন ও মদিরা সেবনের কু-অভ্যাস হইতে দেশীয় অস্থিরমতি যুবকদের বাঁচান।

৯। তা ছাড়া হিন্দুসমাজকে সংস্কার করা যেন ব্রাহ্ম-সমাজের একটি কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। টিকিকাটা, ও

পৈতা ফেলা, দেব দেবীকে অঞ্জলি না দেওয়া, তাঁহাদের সম্মুখে মাথা হেঁট না করা আর সব বিধবাকেই ধরে ধরে বিবাহ দিবার ব্যাপারে দেশে একটা বিষম হৈ চৈ পড়িয়া যায়।

১০। ক্ষেত্রমোহনকে তাঁর পিতা, বিএ, পাশের পরেই হিন্দুমতে বিবাহ দিয়া ফেলেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজের কবল হইতে ছেলেকে বাঁচানই ছিল কৈলাস বাবুর প্রয়াস। কিন্তু তাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিবাহের পরেই ক্ষেত্রমোহন পৈতা ফেলিয়া দেন এবং ডেপুটি হইবার পর প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইয়া দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হয়েন; এবং প্রকাশ্যভাবেই বলিতেন যে পিতার কোন সম্পত্তির অভিলাষী তিনি নহেন। তাহাতে কৈলাস বাবুর হৃদয়ে পুত্রের সম্বন্ধে যে একটা বলবৎ দুঃখের শিখা জ্বলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।
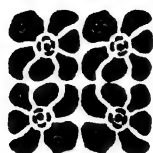
দশম উচ্ছ্বাস।

১। হিন্দু-কলেজের যুগে ও ব্রাহ্মসমাজের যুগে আমাদের দেশের ভাল ভাল সদ্‌বংশের ছেলেরা যে হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইতে সাহসী হইল তাহার মূলে ছিল দেশে বালক বালিকাদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার অভাব এবং আজও সেই অভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে।

২। যখন আমাদের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা শাস্ত্র ঘাঁটিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন শাস্ত্র বুঝাইয়া দিবার লোক নাই। সকলেই গণ্ডায় আণ্ডা মিলাইতে তৎপর। মুসলমানদের অনুগ্রহে অনেক শতাব্দী ধরিয়া দেশে শাস্ত্রের ধারাবাহিক অনুশীলন, পঠন পাঠন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

৩। কেবল স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার শ্লোক শিখিয়া রাখিতেন। আর একদল ছিলেন যাঁরা গুরুগিরি করিয়া, যজমানদের কাণে মন্ত্র দিয়া বেশ দু'পয়সা ঘরে আনিতেন। তাঁহাদের প্রতিভা অন্দর হইতে বাহিরে পৌঁছিত। কোন্ তিথি নক্ষত্রে তোমার জন্ম জানিলেই, তোমার ইষ্ট-

দেবতা কে বাহির করিতে গুরুর পক্ষে বিলম্বের প্রয়োজন হইত না। কাণে কাণে তাহা গুরু বলিয়া দিতেন এবং কাণে কাণে ইষ্ট-দেবতার মন্ত্রও বলিয়া দিতেন। "খ্রঁ, ভূঁ, কিড়িম্ স্বাহা"—ইহা লক্ষবার জপ্ করিবে। ইহা এত পবিত্র ও গুপ্ত যে স্ত্রী স্বামীর নিকট বা স্বামী স্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিবে না। যদি ঐ মন্ত্রের মানে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতে, তখন গুরু পুত্রের রাগ কি! "ইষ্ট দেবতার মন্ত্রের মানে কি"? এত বড় স্পর্দ্ধা, জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে 'মানে কি?' মানে—'আমি তোমার পিণ্ডি চট্‌কাব, আমার পিণ্ডি তুমি চট্‌কাবে, আর উভয়ের পিণ্ডি ভূতে চট্‌কাবে"। "এটা বুঝনা, মা ঠাকরুণ্, অমি গুরু, কাণে ইষ্ট দেবতার মন্ত্র দিয়াছি, আমার দায়িত্ব তোমার কাছে, আর তোমার ইষ্ট দেবতার কাছে। যদি তোমার জপ্ করিতে করিতে স্খলন না হয়—যে মূর্ত্তি মনে ভাবিয়া জপ্ করিবে তাহা স্মরণ আছে ত—লক্ষবার জপ্ করিলে ইষ্ট দেবতা তুষ্ট হইবেন। পতি পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হইয়া তুমি দিনপাত করিতে পারিবে। মন্ত্রের এই মানে; আর কি? কিন্তু যদি তোমার স্খলন হয় ত তোমার ইষ্ট দেবতা আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে ছাড়িবেন না"।

৫। আর এক দল ছিলেন যাঁদের "পুরুতগিরি" ছিল

ব্যবসা। ইহাঁরা পৈতার সময় দণ্ডীকে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মন্ত্রাদি দিতেন, বিবাহের সময় সময়োচিত মন্ত্র পাঠ করিতেন, পুঁথি খুলিয়া যদি ঐ সব শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা করিতে তবেই তুমি নাস্তিক। "ওরে, এখন গায়ত্রী সন্ধ্যা ইত্যাদি কণ্ঠস্থ কর্, উচ্চারণ শুদ্ধ কর্—ওর গভীর মানে, যা ব্যাস নারদ বুঝিয়া উঠিতে ভিরমি যেতেন, তা তোকে আমি ভাল করে বুঝিয়ে দেবো—কিন্তু কোসে দক্ষিণা চাই"।

৫। এই হয়ে গেল আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, দীক্ষা। তারপর অন্দরে মেয়ে মহলে—যাদের "ক অক্ষর, গো মাংস"—বার মাসে তের পার্ব্বণ, কত কি ব্রত উদ্‌যাপন, কত শত পূজা অবারিত ভাবে চলিয়াছে, যাহা হিন্দুঘরের মা গিন্নিরাই তলাইয়া পান না তাহা পুরুষ কর্ত্তারা কি বুঝিবেন! কিন্তু সবেতেই পুরুত ঠাকুরের দরকার। তাঁর টাকা, চাল কলা, গামছা, দক্ষিণা ইত্যাদি না হইলে সমস্তই পণ্ড। এই দাঁড়াইয়াছিল হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তরিক হিন্দুয়ানা।

৬। কিন্তু দ্রষ্টব্য এবং বিবেচ্য এই যে—উপরোক্ত হিন্দুয়ানী কিরূপে চিরদিনের শ্রদ্ধা, ভক্তি, অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারে। হিন্দু কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাবে

আমাদের তখনকার জ্ঞানবান বালকেরা প্রতি হাতে প্রশ্ন, প্রতি হাতে "কেন ?" জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তখন স্বাধীন চিন্তার ও হেতুবাদের আন্দোলনে দেশ গুলজার হইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মছেলেরা পুরুত ঠাকুরদের টিকি জোর ক'রে ধ'রে কাটিতে আরম্ভ করিল, গুরুদের ধ'রে চাব্‌কে দিতে লাগিল। বাস্তবিকই হিন্দুধর্ম্মকে অধঃপাতে ফেলিবার হেতু এই মুর্খ গুরু আর পুরুতের দল।

৭। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে—ঐ মুর্খদের প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা দিবার জন্য কি কোনও কলেজ এ পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে ? যেমন হিন্দু কলেজের দিনে, তেমনি আজও ঐ মুর্খদের অত্যাচারে হিন্দুবাড়ীর মুর্খমেয়েরা শশব্যস্ত। মেয়েদের দুরদৃষ্ট যে তারা আজ ও প্রায় সব মুর্খ এবং যে বয়সে তা'দের বিবাহ ক্রিয়াকলাপ হইয়া যায়, সে বয়সে তারা বড় জোর কিছু কিছু সাহিত্য, অঙ্ক, ব্যাকরণ শিখিল, খুব জোর বঙ্কিম মাইকেল পড়িয়া উঠিল, নিজ স্বামীকে ও ননন্দদিগকে ভাল করিয়া চিঠি লিখিতে শিখিল। তাহারা এ সকল বিষয়ে কথা কহিতে কেমন করিয়া সাহসী হইবে ? করণ কারণের কর্ত্তা যাঁরা, তাঁরা কয় সের চাল ও কয় কাঁদি কলাতে ভোগ হইবে তার দস্তুর মত ব্যবস্থা মেয়ে মহলের সঙ্গে মিলিয়া পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া লইয়াছেন

এবং কি দক্ষিণা লইয়া ঘরে যাইবেন তার বন্দোবস্ত করিতেও ভুলেন নাই।

৮। স্বাধীন চিন্তাকে, হেতুবাদকে, জ্ঞানবাদকে, জ্ঞান চর্চ্চার পিপাসাকে কি তুমি বোতলে ঢুকাইয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে? কতদূর অবধি আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিব, আর তারপর জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না—এইরূপ ভাবে জ্ঞাতব্যকে সীমাবদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা কাহারও নাই—স্বয়ং ভগবানেরও নাই বঙ্গের মূর্খ পুরুত আর গুরুর দল ত কোন ছার। তখনকার দিনে—প্রখর স্বাধীন চিন্তার দিনে, রব পড়িয়া গিয়াছিল, দেশে মেকি আর চলিবে না। হিন্দুধর্ম্মে যদি সার থাকে ত তাহা প্রকাশ্যভাবে শিখাইবার পড়াইবার বন্দোবস্ত কর। "তং মং" করিয়া ভগবানকে ধরা যায় না, আর ভগবানকে ফাঁকি দেওয়াও চলে না। সংস্কৃত ছাড়, সব মন্ত্র তন্ত্র সাধু বাংলায় অনুবাদ কর যে আমরা বুঝি, আমাদের জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে কোন্‌টাই বা প্রয়োজনীয় আর কোন্‌টাই বা অপ্রয়োজনীয়; এটা দশজনে মিলে গবেষণা করিয়া ঠিক করা হউক।

১০। পাদ্রির দল হুঙ্কার করিতে লাগিলেন—তাঁরা সুর ধরিলেন যে হিন্দুধর্ম্মটা ধর্ম্মই নয়। কারণ দেখাইলেন যে তাঁদের সমাজরক্ষণের ও জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মুশা বা

মোজেজের সময় হইতে ভগবান স্বযং প্রকাশিত হইয়া ১০টি হুকুম প্রস্তর ফলকে লিখিয়া দেন। সেই ১০টি হুকুম ইহুদিদের ও খ্রীষ্টানদের। বুদ্ধদেব তাঁর জ্ঞানবলে ঐরূপ ১০টি হুকুমের উপর তাঁহার ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া যান্। ঐরূপ হুকুম না পালন করিলে কোন সমাজই সভ্য জগতে আসন পাইবার উপযুক্ত নয়। তোমাদের বেদ পুরাণ উপনিষদে দেখাও যে সেইরূপ ১০টি হুকুম কোথাও আছে কিনা ঃ— যথা চুরি করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, পরস্ত্রী অপহরণ করিবে না ইত্যাদি। ইহা মনুষ্য সমাজে সভ্যতার মূল ভিত্তি বা সোপান। সে ভিত্তি বা সোপান চাণক্যের শ্লোক ব্যতীত তুমি কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। আর চাণক্যের শ্লোক ত বৌদ্ধসূত্রের চুরি করা মাল। অতএব যে ধর্ম্মের কোন সার্থকতা বা নিজস্ব শিক্ষা দিবার নাই তাহা পরিহার করাই শ্রেয়। ঐত গেল এক সুর। তারপর অন্য সুর শুনুন। গান শুনিলেই, শুনাইতে হয়।

১১। একদল হিন্দু উঠিলেন—তাঁরা বলিতে লাগিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম এত গভীর যে তাহা জন সাধারণের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের ধর্ম্ম অষ্টাঙ্গ যোগের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ ঘোর কলিতে, কে সে অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ জন সাধারণকে শিক্ষা দিবে ?

অধিকারী ভেদে জ্ঞানালোক মস্তিষ্কে ঢুকিয়া থাকে। তুমি লোককে "ক, খ" না শিখাইয়া, একেবারে বেদান্ত শিখাইবার প্রয়াস পাইও না। আমাদের যা রীতি নীতি সমাজ পদ্ধতি আছে তা ঋষিদত্ত, উহাতে যেন কেহ হস্তক্ষেপ না করে ; তাহলে দেশে ভয়ানক রেভোলিউসান বা বিপ্লব হইয়া যাইবে। হিন্দু, তোমার নিজের সমাজ ছাড়িও না ; যদি ছাড় তবে ধূলিকণার মত কোথায় উড়িয়া যাইবে তার নিরাকরণ কেহ করিতে পারিবে না।

১২। উহাতে হিন্দুসমাজ জোর পাইলেন ও কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তাঁরা বুঝিতেন যে ইংরাজ কখনও সজ্ঞানে হিন্দু-সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে লিপ্ত হইবেন না। হিন্দু-সমাজের আর ব্রাহ্ম-সমাজের কলহ ত ভাইয়ে ভাইয়ের গৃহ-কলহ, যার ইচ্ছা যে সমাজে থাকুতে, সে সেই সমাজে থাকুক। ইহাতে রাজ্যের বা রাজার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

১৩। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া বিধর্ম্মী হইলে পূর্ব্বপুরুষদের বিষয় হইতে বঞ্চিত কেহই হইবে না—পিতা কি পিতামহ যদি নিজ উইলদ্বারা কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া গিয়া থাকেন। সর্ব্বাগ্রে নেটিভ খৃষ্টানদের সাহায্যের জন্য ঐরূপ আইন বহুপূর্ব্বে ইংরাজ পাশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মরাও সেই অইনের সাহায্য লইতে পারেন।

১৪। এই হিন্দু-ব্রাহ্ম কলহের ব্যাপার আমি "কল্যাণের" এই জীবনীতে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য। কারণ সেই কলহের ভিতর দিয়াই কল্যাণের পিতা ক্ষেত্রমোহনের জীবনের অগ্নি পরীক্ষা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সমাজ-সংস্কার-সমরে ক্ষেত্র-মোহন একজন মহারথী। তাঁর দেবমূর্ত্তিকে, দেবভাবকে, এখনও অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু আছেন যাঁরা মনে করিয়া রাখিয়া-ছেন। ব্রাহ্মসমাজে ক্ষেত্রমোহনের খ্যাতি, কল্যাণের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তি, সুতরাং অতি আদরের সামগ্রী।

একাদশ উচ্ছ্বাস।

১। ব্রাহ্মরা ঠিকই ভাবিয়াছিলেন যে হিন্দুসমাজকে সংস্কার করিতে গেলে, সেই সমাজের ভিতরে বসিয়া করিলে চলিবে না। হিন্দু-সমাজ নিজ-নিগড়ে এত আবদ্ধ, যে তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের ব্যাঘাত হইবে এবং হিন্দুসমাজের ও উপকার হইবে না।

২। তখনকার ব্রাহ্ম নেতারা বিশদভাবে স্বতন্ত্র ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং এইটাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে নূতন ব্রাহ্ম-সমাজ যদি দেশের সকল কৃতবিদ্যদের হাত করিতে সমর্থ হয় তবে হিন্দু-সমাজকে ঠেলা দিয়া শোধরাইতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না।

৩। প্রথম যখন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন হিন্দুসমাজের সহিত তাহার বৈরিভাব আদৌ ছিল না। তাহাই আদি-ব্রাহ্মসমাজ। এখানে ব্রাহ্মণে বেদপাঠ করিতেন, উপনিষদাদি পাঠ হইত ও ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা হইত, সঙ্গীত হইত। আদি সমাজের ব্রাহ্মেরা পৈতা ফেলিতেন না। পৈতা ফেলিবার ঢেউও তখনকার দিনে উঠে নাই, কাজেই জাতটা বজায় রাখিয়াই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

৪। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও কেশব সেন, ব্রাহ্ম-সমাজের যখন দুই নেতা হইলেন তখন ঐ পৈতা লইয়া, জাত লইয়া কেশবে আর দেবেন্দ্রনাথে মতে মিলিল না। তখন ব্রাহ্ম-সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। কেশব একজন দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভাপন্ন অদ্বিতীয় বাগ্মী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আদি সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ" স্থাপন করিলেন।

৫। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আদি-ব্রাহ্মসমাজ লইয়া রহিলেন, কিন্তু কেশবের যুক্তি তখনকার শিক্ষিত যুবকবৃন্দের কাছে এতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে তাঁ'রা কেশবের দলকেই পুষ্ট করিয়া তুলিলেন। কল্যাণের পিতা যখন কলেজের ছাত্র, তখন হইতেই তিনি কেশবের পাণ্ডিত্যে, ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

৬। তখনকার দিনে আমাদের স্কুল কলেজের যুবকদের ভিতর কি এক প্রগাঢ় স্বদেশভক্তি ঢুকিয়াছিল, কি এক এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কেশবের নেতৃত্ব কি এক অচিন্ত্যনীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের মনে উৎপাদন করিয়াছিল যাহার বলে তারা সব ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিত। বস্তুতঃই যেন সত্য যুগের আবির্ভাবে দেশ তোলপাড় হইতে লাগিল।

৭। কেশব বাবুর নেতৃত্বে, তাঁর ঐশ্বরিক, প্রতিভায় ভদ্রবংশীয়েরা খ্রীষ্টান হওয়া ছাড়িল। আর দেশ থেকে মদ খাওয়া কমিল। কেশবী ব্রাহ্মদের ভিতর হইতে পৈতা ও জাত্ উঠিয়া গেল। তাঁরা সব এক জাত্ হইলেন। ইহা লোকে ধরিতে পারুক, বা না পারুক কেশব বাবু তাঁর সমাজকে একজাত করিয়া বস্তুতঃ ভগবান বুদ্ধদেবের কিংবা ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অথবা যিশুখ্রীষ্ট বা মহম্মদের পদানুসরণ করিতেছিলেন।

৮। কিন্তু একজাত সৃষ্টি করিতে গেলে সেই জাতের ভিতর আইনত বৈধ বিবাহের নিয়মাবলি করার প্রয়োজন, বিশেষতঃ যখন তাঁদের ভিতর হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অচল। কেশব বাবু স্বয়ং তখনকার এডভোকেট্ জেনারেলের সাহায্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের ৩ নং আইন গভর্ণমেণ্ট হইতে পাশ করাইয়া লইলেন। সে আইনের বিশেষত্ব অনেক, প্রথমতঃ— রেজেষ্টারি ভিন্ন বৈধ বিবাহ হইতে পারিবে না, সে বিবাহে ভগবানের উপাসনা হউক বা না হউক, আইনে বাধিবে না।

৯। এই নূতন বিবাহ আইনের আর দুইটী বিশেষত্ব ছিল স্বামী, এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে পুনরায় পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না। আর যে যে দোষে ইংরাজদের ভিতর বিবাহ বন্ধন খণ্ডন করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবার স্বাধীনতা জন্মে

আইনমতে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও সেইরূপ স্বাধীনতা জন্মিবে। ব্রাহ্মদের ভিতরেও তাই ঐ প্রথা চলিত হইল, ঐ নূতন আইনের দৌলতে। দেশ হইতে এই সময়েই কৌলিন্য প্রথা এবং বহু বিবাহ প্রথা একেবারে লোপ পাইল। এই সবই ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ কীর্ত্তি।

১০। কেশব বাবুর নেতৃত্বে যখন ব্রাহ্ম সমাজ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে তখন তাঁরই নাবালিকা কন্যাকে তখনকার কুচবিহারের যুবা মহারাজের সহিত বিবাহ দেওয়াতে কেশবের "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের" মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের নিয়মমত নাবালিকা কন্যাদের বিবাহ হইতে পারে না। কেশব বাবু নিজে তাঁর সমাজের কর্ত্তা হইয়া নিজেই ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিলেন, নিজের নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিলেন, এই হইল তাঁর চেলাদের মনে রাগ। কেশব বাবু তাঁর সমাজের অন্যতম নাম দিলেন "নব-বিধান সমাজ"।

১১। তাঁর অনেক পুরাতন চেলারা এক যোগে তাঁহাকে এবং তাঁর সমাজকে ছাড়িয়া দিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার নাম হইল "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ"। ব্রাহ্ম-সমাজ ঐরূপে তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই নূতন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুই নেতার নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট

হইবে। ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আর ৺দুর্গামোহন দাস কল্যাণের পিতা ক্ষেত্রমোহনও কেশব বাবুর সমাজ হইতে বিদায় লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যভুক্ত হইলেন।

১২। এই ব্রাহ্মসমাজের দলাদলি ব্যাপার বঙ্গের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দলাদলির কথা না বলিলে কো[illegible] সামাজিক ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে না। প্রত্যেক মানুষটিই তার নিজসমাজ-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে উহা[illegible] উল্লেখ অনিবার্য্য যেহেতু কল্যাণের পিতা বিশেষভাবে সাধার[illegible] ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের এক স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৩। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে এই ব্রাহ্মসমাজে ক্ষেত্র মোহনের এত ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়াই তাঁর পিতা কৈলাস বাবুর মনে একটা দুঃখের শিখা জ্বলিত এবং সেই কারণে তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহেরও লাঘব হয়; এই কারণে ক্ষেত্র-মোহনের হৃদয়েও একটা দুঃখ বরাবরই ছিল; কিন্তু স্বর্গা-রোহণের সময় তাহার কতক উপশম হইয়াছিল। তাহা পরে বলিব।

১৪। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৈলাসবাবু ক্ষেত্রমোহনের মনকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরাইয়া আনিবার অভিপ্রায়েই তাঁর হিন্দুমতে প্রথম বিবাহ দেন। সে স্ত্রী একটি কন্যা রাখিয়া মারা

...ন। মেয়েটির নাম সুমতি। ইনি রূপে গুণে লক্ষ্মী। ইনি অনেক সন্তান সন্ততির মা হইয়া সুখে স্বামীর ঘর করিতেছেন। সুমতিকে কৈলাস বাবুই "মানুষ" করেন এবং তিনিই তাঁর বিবাহ দেন।
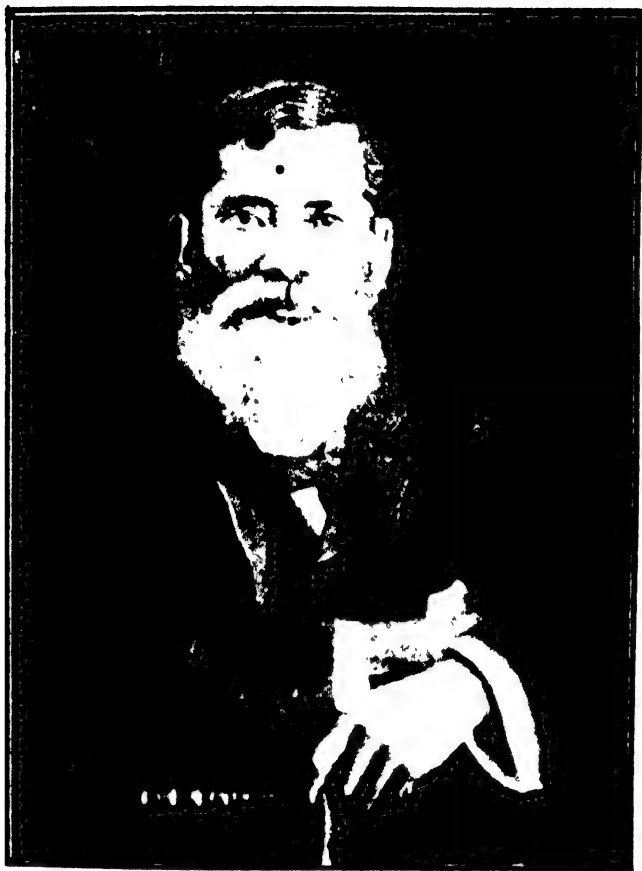
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস।

১। আমি ইতিপূর্ব্বে আমার "কল্যাণের" চিত্রে, তার পিতৃ-পুরুষদের পরিচয় যথাযথ ভাবে আঁকিয়াছি। এখন সেই চিত্রের প্রাঙ্গণে কল্যাণের মাতৃগোষ্ঠির রেখা আঁকিবার সময় উপস্থিত।

২। কল্যাণকুমার, ক্ষেত্র মোহনের দ্বিতীয় স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান। কল্যাণের মা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনোদিনী। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত কার্ত্তিকের ঝড়ের পরেই ইহার জন্ম হয়। হিন্দুঘরের প্রথা অনুসারে বিনোদিনীর জন্ম তার মাতামহের বাড়ীতে হয়। তার মাতামহের নাম ৺ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি হাইকোর্টের একজন সুবিখ্যাত এটর্নি ছিলেন। সেই ঝড়ের অল্পদিন পরেই বিনোদিনীর বড়মামা ৺ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার হইবার জন্য লুকাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিনোদিনী তার মাতামহের ও মাতামহীর প্রথম নাতিনী, তাই আদরে ও যত্নে পালিতা।

৩। বিনোদিনীর পিতা ৺শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি,এল পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকীল হইয়া প্রথম তাঁর খুড়শ্বশুর ৺ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রাজসাহী অঞ্চলে প্রাক্‌টিস্ করিতে যান।

সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের সুপারিসে তিনি বীরভূমে সরকারী ওকালতি প্রাপ্ত হন। তার একবৎসরের ভিতর তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যু হয়। বিনোদিনীর বড়মামা সেই বৎসরেই দেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ঐ কর্ম্মে তাঁর সুখ্যাতি কলিকাতার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিনোদিনীর অদৃষ্টে তার মাতুলদের স্নেহ ভরপূর পৌঁছিয়াছিল। তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ মাতুল ৺সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনিও একজন বিখ্যাত এটর্নি হইয়াছিলেন, বিনোদিনীকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

৪। বিনোদিনীর পিতা অল্প কয় বৎসর বীরভূমে সরকারী ওকালতি করিয়া ভাগলপুরের সরকারী ওকালতি পদ প্রাপ্ত হন। তাঁর নির্ম্মল ও সরল অন্তঃকরণের গুণে শুনিতে পাই যে আজও নাকি লোকে বীরভূমে তাঁর বাসাবাটীকে 'শশিবাবুর বাসা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

৫। বিনোদিনীর পিতা বৌবাজারের স্বনামধন্য, ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের একমাত্র কন্যা, আমার পূজনীয়া শ্বাশুড়ী ব্রহ্মময়ী দেবীর তৃতীয় সন্তান। আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র আর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরমোহন ২৪ পরগণার

অতুলচরণ মল্লিক।

অন্তর্গত ও মেটিয়া-বুরুজের দক্ষিণে 'মণিখালী-কৃষ্ণনগর' গ্রামের ও সেই অঞ্চলের এক ঘর বড় জমিদার ছিলেন। গৌরমোহন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাইলে, কৃষ্ণচন্দ্রের আর ইহাঁদের অন্যান্য সরীকদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া যায়। ইহাঁদের বংশধরেরা অনেকেই এখনও ঐ গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

৬। বিশ্বনাথ মতিলালের জ্যেষ্ঠপুত্র নীলমণি মতিলাল নিজ বিদ্যার ও অর্থের বলে অনেক বড় বড় সাহেবদের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উঁহার খুব অন্তরঙ্গের বন্ধু ছিলেন, স্বনাম ধন্য ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তাই শশিবাবুর বড়-মামার বাটীতে সাহেবী-আনা, মদ্য মাংস আহার করা, বেশই চলিয়া উঠিয়াছিল। ৺নীলমণি মতিলালের কন্যা হেমাঙ্গিনীর সহিত আমার দাদা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

৭। শশিবাবু ভাগলপুরে গিয়া বেশই প্রতিপত্তি লাভ করেন ও প্রাক্‌টিস্‌ জমাইয়া ফেলেন। তাঁহার অন্যান্য ভাল ভাল উকিলদের সহিত স্থায়িভাবে বন্ধুতার সূত্রপাত হয়। বন্ধুদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ৺অতুলচরণ মল্লিক। ইনি বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বাবু অভয়চরণ মল্লিকের দ্বিতীয় সন্তান। ভাগলপুরে ইনি একজন প্রসিদ্ধ উকিল হইয়া নিজ অর্থে বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হয়েন;

পরে কলিকাতার হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ করিতে করিতে অতি অল্প বয়সে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। ইঁহার স্ত্রী শ্রীমতী থাকমণি আমাদের সহিত আজীবন বন্ধুতা রাখিয়া আজ কয়েক বৎসর স্বর্গগত হইয়াছেন। আমার ছেলে পুলেরা থাকমণিকে 'কাকী মা' ডাকিত আর তিনিও উহাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

৮। তাঁহাদের সুসন্তান শ্রীমান্ বসন্তকুমার মল্লিক সুকঠিন সিভিল সারভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ প্রতিভায় কলিকাতার হাইকোর্টে জজিয়তি করেন এবং পরে পাটনায় হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে সেই কোর্টে বদলি হন এবং কিছুদিন পূর্ব্বে তথায় একটিং চীফ-জসটিসের কাজ করিয়াছেন। ইঁহার ভ্রাতৃভাব আমার ছেলেমেয়েদের উপর অটুট রহিয়াছে। "কল্যাণ," তাঁর "বিনোদ দির ছেলে" বলিয়া তাহাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

৯। উল্লেখ যোগ্য আর একটি কথা, শশিবাবুরা—৬ ভাই আর দুই ভগিনী। ভায়েদের মধ্যে শশিবাবুই তাঁর পিতার কৃতী সন্তান বলিয়া, বিনোদিনীর আদর বৌবাজারে ঠাকুর-দাদা ঈশান-চন্দ্রের নিকট এবং সকল পিতৃব্যদের ও পিসিমাদের নিকট একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই চলিত। এমন কি ভাগলপুরে গিয়া এই আদর দুরস্ত করিতে আমাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইত।

শ্রীমতী থাকমণি মল্লিক।

১০। শৈশবে মাত্র ৯ বৎসর বয়সেই মণ্ডলঘাটের সম্ভ্রান্ত ঘোষাল বংশীয় একটী ১৬ বৎসরের যুবকের সহিত বিনোদিনীর হিন্দুমতে প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের পর মণ্ডলঘাটে ফিরিয়া গিয়াই বরের অতি ভীষণ টাইফয়েড্ হয়; দশ দিনের দিন তার প্রাণত্যাগ হয়। সুতরাং বিনোদিনী ১৫ দিনের মধ্যে বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে বৌবাজারে ফিরিয়া আইসে।

১১। জীবনের সুখ দুঃখ সকলই অস্থায়ী তাহা জানি, কিন্তু তথাপি সে দিনকার সেই মহাবিপদের কথা আমার জীবনে ভুলিবার নয়। কি ভীষণ শোকের-লহরী বিনোদিনীর পিত্রালয়ে—ভাবিলে এখনও যে শরীর রোমাঞ্চিত হয়! শশিবাবু বুকে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে কলিকাতায় আসিলেন। তাঁর বিনোদিনীর জন্য অধীরতা দেখিয়া, তাঁর পিতাই যথেষ্ট সান্ত্বনা দেন। তিনি অনুমতি দেন যে "এ ক্ষেত্রে, তুমি বিনোদিনীকে পুনরায় বিবাহ দিও—বিনোদিনী শিশু, স্বামী কি—সে বুঝিল না সুতরাং এরূপ বিধবা-বিবাহে পাপনাই।" শশিবাবু পিতার পদধূলি লইলেন। ঐ আমাদের মহাবল হইল। সেই অবধি আমরা কৃত-সঙ্কল্প হইলাম যে বিনোদিনীর পুনরায় বিবাহ দিয়া, উপযুক্ত বয়সে, উহাকে সংসারী করাইতে হইবে।

১২। বিপদের উপর বিপদ! বিনোদিনী বিধবা হইবার

অল্পদিন পরেই আমার ছোট ননদের জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীও বিধবা হয়। সেও স্বামীর ঘর করে নাই। আমার ছোট ননদ তাঁর মৃত্যু-শয্যায় আমার হাতে ধরে অনুরোধ করেন যে "বিনোদের গতি যদি তুমি কর ত আমার শরতের গতিও করিও, ভুলিও না"। আমার ছোট-নন্‌দাই মহাশয় কিন্তু কিছুতেই শরতের পুনরায় বিবাহ দিতে মত দিলেন না। কাজেই আমার কিম্বা আমার স্বামীর দ্বারা শরতের গতি করা হইয়া উঠে নাই। শরৎকুমারী বহুদিন যাবৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

১৩। ইহার পর আমার ছেলেপুলেদিগকে লইয়া,কলিকাতায় আসা,বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না; উহাদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাতের ভয়ে, আর কলিকাতার কুসঙ্গীদের ভয়ে। বিশেষতঃ বিনোদিনীকে পাছে শরৎকুমারী পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধ করে কিম্বা পরিবারের অন্য কোন গুরুজন বিনোদিনীর কাণে ঐ পরামর্শ দেন—সেই ভয়ে আমি কলিকাতায় আসিতে বিরত থাকিতাম। বিনোদিনী তার সেই প্রথমবারের বিবাহ একেবারে ভুলিয়া যাউক, এই ইচ্ছাই আমাদের মনে বলবৎ ছিল।

১৪। আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাল ১৮৭৮ সালে শ্রাবণ মাসে আমাদের ভাগলপুরের নূতন খরিদ—করা বাড়ীতে হয় এবং

সার্ বসন্তকুমার মল্লিক কে, টি।

সেই বৎসর পূজার ছুটীতে আমার স্বামী সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম নেতা ৺ দুর্গামোহন দাশের সহিত একসঙ্গে জাহাজে কলম্বো বেড়াইতে যান।

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস।

১। জাহাজে শশিবাবু দুর্গামোহনবাবুকে বিনোদিনীর পুনরায় বিবাহ দিবার কথা বিশেষভাবে বলেন। দুর্গামোহনবাবু অতি ভদ্র ও মধুর প্রকৃতি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার স্বামীর বোধ হয় অনেক পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। জ্যেষ্ঠ—বাবু কালীমোহন দাশ, মধ্যম দুর্গামোহন, দুই ভাইই বেশ প্রতিপত্তির সহিত হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্গামোহনবাবু সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই কারণে ক্ষেত্রমোহনকে বিশেষভাবে চিনিতেন। ক্ষেত্রমোহন বিপত্নীক হইয়া ব্রাহ্ম-ধরণ অনুসারে যে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ইহাও বোধ হয় দুর্গামোহনবাবু জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই আমার স্বামীকে ক্ষেত্রমোহনের পরিচয় দেন।

২। ক্ষেত্রমোহন বাল্যকালে আমার পিত্রালয়ে অনেকবারই আসিয়াছিলেন; তাঁকে আমি অনেকবারই দেখিয়াছি। তাঁর এক বিমাতা আমার মায়ের দূর সম্পর্কে ভগিনী হইতেন। তাই আমরা দরজিপাড়ার কৈলাস মুকুজ্যের পারিবারিক বিষয় অনেক জ্ঞাত ছিলাম। কিন্তু ক্ষেত্রমোহন কলেজে

দুর্গামোহন দাস।

পড়িতে পড়িতেই যে ব্রাহ্ম-সমাজ লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—এতটা আমরা ভাগলপুরে প্রবাসী বলিয়া জানিতাম না।

৩। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেত্রমোহনকে তাঁর মালদহের ডেপুটিগিরির স্থান হইতে দুই একবার ভাগলপুরে কমিশনারের নিকট পরীক্ষা দিতে আসিতে হয়। সে সময়ে তিনি আমাদের বাসাতেই উঠেন। কিন্তু আমি কি বিনোদিনী তখন ভাগলপুরে ছিলাম না। শশিবাবু ও আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুইজনেই তখন সেখানে; ক্ষেত্রমোহনের বালোচিত সরল স্বভাবের গুণে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহাকে খুবই পছন্দ করিত।

৪। শশিবাবু কলম্বো হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবুকে সমাদর করিয়া ভাগলপুরে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন এবং ক্ষেত্রবাবু বিনোদিনীকে একটীবার দেখিবামাত্র যেন বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল, আমরা বুঝিলাম।

৫। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার বিবাহের দিন স্থির হয়। বিবাহের একমাস পূর্ব্বেই ঐ দিন ঠিক করা হয়। আমাদের ভাগলপুরের বাটীতে তখন শশিবাবুর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রবাবু থাকিতেন। তিনি বিবাহের সময় আগতপ্রায় দেখিয়া, আস্তে আস্তে নানা কাজের ছুতা

দেখাইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসেন—পাছে তাঁকে একঘরে হইতে হয় এই ভয়ে।

৬। শশিবাবু প্রকাশ্যভাবে সব ভ্রাতা ভগিনাদের, আত্মীয় স্বজনদের ঐ বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁরা সকলেই শশিবাবুর পিতার অনুমতির কথাও জানিতেন। কিন্তু তা হলে কি হয়? পাছে বিধবা বিবাহে লিপ্ত থাকিলে উঁহাদিগকে একঘরে হইতে হয়—এই তাঁদের বিষম আপত্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁরা সকলেই শশিবাবুর স্বোপার্জ্জিত কলিকাতার বৌবাজারের বাটীতে পুত্র পৌত্রাদি লইয়া বসবাস করিতেন। কিন্তু তা হলে কি হয়? তাঁদের কাছ থেকে উত্তপ্ত চিঠি আসিতে লাগিল। তাঁরা ভয় দেখাইলেন "যদি বিনোদের বিবাহ দাও ত আমরা তোমার বাটী থেকে উঠিয়া যাইব"। বিনোদিনাকে কুৎসিত বাক্যে ব্যাখ্যা করিয়া উড়ো-চিঠি ক্ষেত্রমোহনের নিকট মালদহে অনেক পৌঁছিতে লাগিল।

৭। আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে যেরূপ কুৎসিত উড়ো-চিঠি নিরীহ বালিকাদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, বোধ হয় ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে সেরূপ হয় না। অন্যান্য দেশে ত হয়ই না। এক এক সময় ভাবি যে আমরা পরের গার্হস্থ্য ব্যাপারে কেন এত মাথা ঘামাইয়া, নিজকে লুকাইয়া রাখিয়া, হেয় প্রবৃত্তির

প্রশ্রয় দিই। উহাতে কাহাদের লাভ? কিসের লাভ? ঐ কুপ্রবৃত্তি যে খালি বিনোদিনার দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নয়। আমি তাহা হইলে এই কুৎসিত উড়ো-চিঠির কথাও হয় ত এ জীবনাতে তুলিতাম না। আমার বোধ হয় ঐ কুপ্রবৃত্তি হিন্দু-সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, এবং উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। "মজ্জাগত" কেন বলিলাম, তার কারণ এই, বিনোদিনার দ্বিতীয়বার বিবাহের ২৯ বৎসর পরে, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন স্বনাম ধন্য দেশপূজ্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী, তখন তাঁকে ঐ শুভকর্ম্মে বাধা দিতে ঐরূপ উড়ো-চিঠির প্রয়োগ হইয়াছিল।

৮। বিনোদিনার বিবাহের মাত্র যখন পাঁচ দিন অবশিষ্ট তখন হঠাৎ এক ভোরে শশিবাবুর মধ্যম ভ্রাতা, দুই ভগিনাপতি এবং আরও কয়েকজন আত্মীয় আমাদের বাটীতে উপস্থিত। উদ্দেশ্য আমাদিগকে ঐ বিবাহ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করা। উঁহারা পাছে বিনোদিনাকে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিয়া তার মন বিগড়াইয়া দেন—এই ভয়ে আমরা তাড়াতাড়ি তাহাকে লুক্কায়িতভাবে অতুলবাবুর বাটীতে, তার কাকামার কাছে, পাঠাইয়া দিই। অতুলবাবু খুব বিজ্ঞ। তিনি বেলা ২টার ট্রেণে সস্ত্রীক বিনো-

দিনীকে লইয়া তাঁর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা অখিলবাবুর মুঙ্গেরের বাটীতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ভাগলপুর হইতে সরিয়া পড়েন। অখিলবাবু মুঙ্গেরের সরকারী উকীল ছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁদের একমাত্র পুত্র দেবেন্দ্র বহুদিন পরে মুঙ্গেরে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন; সম্প্রতি তাঁরও মৃত্যু হইয়াছে।

৯। বিনোদিনী ত তার কাকীমার সঙ্গে মুঙ্গেরে চম্পট দিল। সেই দিনই শশি বাবু তাঁর আত্মীয় স্বজনের সহিত তর্ক বিতর্ক চালাইলেন। আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। বিনোদিনীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। উহা আর ভাঙ্গে না, কাটে না। উহাতে আমাদিগকে যে "একঘরে" করে করুক, আমরা নিরুপায়। আত্মীয়েরা ভগ্ন মনোরথ হইয়া সেই রাত্রের ট্রেনে কলিকাতা ফিরিলেন। আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

১০। বিনোদিনী যে বয়সে বিধবা হইয়াছিল, উহার পুনরায় বিবাহ দেওয়া ত পিতা মাতার কর্ত্তব্য ও সৎকার্য্য। সেই সৎকার্য্যে আমাদিগকে সকলে "একঘরে" করবে, এই ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা—বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যাহারা অসৎ কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদিগকে "একঘরে" করিবার

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শক্তি আর হিন্দু-সমাজের নাই। "যাদের ক্যাস্ বাক্সে টাকা তাদের এক ঘরে করে কে ?" আমার স্বামী দম্ভ করিয়া এই কথাটী বলিতেন। আরও বলিতেন যে :—

"সমাজে থাকিয়া ভাল কাজ করিব, সমাজকে তাহা বহন করিতেই হইবে। মেয়ের আর একবার বিবাহ দিব—যে মেয়ে ৯ বৎসর বয়সে ১৫ দিনের মধ্যে বিধবা হইয়াছে। এই সৎ-কাজকে সমাজ সহ্য করিবেই করিবে। ইহার জন্য আমাকে সমাজ ত্যাগ করিতে হইবে না—ঠিক্ জানিও"। আমার মনে জোর দিবার জন্য এটীও আমাকে অনেকবার বলিতেন।

১১। ভাগলপুর ছোট সহর। বিবাহের দিন গণ্যমান্য অনেকেই আমাদের বাটীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। আমার খুল্ল-তাত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আদি-সমাজের ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনিই সেই বিবাহে পৌরোহিত্য কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। আর ব্রাহ্মবন্ধু বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু বামাচরণ ঘোষ, ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহাদের আমাদিগের প্রতি সাহায্য এই বিবাহ ব্যাপারে বিশেষতঃ বিবাহের রাত্রে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা কেহই আজ ইহ জগতে নাই।

১২। শশিবাবুর ছোট কাকা গিরীশ বাবু, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং দুর্গামোহন বাবু বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। খুব

সমারোহে সে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। ১৮৭২ সালের ৩ নং আইন অনুসারে উহা রেজিষ্টারী হয়। যখন ক্ষেত্রমোহনের সহিত বিনোদিনীর বিবাহ হয় তখন সে ১৫ বৎসরে পড়িয়াছে আর ক্ষেত্রমোহনের বয়স আন্দাজ ২৭ হইবে।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস।

১। বাটীতে পড়াইয়া ১৫ বৎসর বয়স অবধি যত দূর সম্ভব লেখাপড়া শিখাইবার—বিনোদিনীর প্রতি আমাদের ত্রুটী হয় নাই। তার জন্য ও তার ছোট দুই ভাইয়ের জন্য মাষ্টাররা ত আসিতই, তাছাড়া বিনোদিনীর জন্য মেমও নিযুক্ত ছিল। মেম ইংরাজী পড়াইতেন, সিলাই শিক্ষা দিতেন। সে ঐ বয়সেই তার ছোট ভাইদের সঙ্গে ইংরাজিতে ও অঙ্কে টক্কর দিত। বাংলায় সে তাহার ভাইদের হারাইয়া দিত।

২। আমি ছেলে মেয়েদের বাংলা শিখাইবার জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, মধ্যে মধ্যে যাহা বাদ্‌সাদ্‌ দিবার দরকার তাহা বুঝিয়া, আত্যন্ত সুর করিয়া পড়িয়া শুনাইতাম। ছেলেরা স্কুল হইতে ফেরত আসিলে, জল খাবারের ব্যাপার সমাপ্ত হইয়া গেলে, আমার জীবনের ঐ মহাকাজ সাধন করিতাম; ওদের এক সঙ্গে বসাইয়া আমার পাঠ শুনাইতাম। সাহেবী ঢেউয়ের পাল্লা হইতে ছেলে মেয়েদের কোমল হৃদয়কে রক্ষা করিবার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার উপর উহাদের মনে একটা ভক্তি সৃষ্টি করিয়া দিবার ঐ একমাত্র উপায় আমি স্থির করিয়াছিলাম।

৩। আমার স্বামী কাছারী হইতে আসিয়া, জল্‌টল্ খাইয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা শুনা করিতে, কি ক্লাবে বিলিয়ার্ডস্ খেলিতে যাইতেন। ছেলে মেয়েদের লইয়া আমার সময় ঐরূপে আমোদে কাটিত। আমাদের ভাগলপুরের বাটী পাকা হইলেও একতলা—আর অন্দর মহলে, বাটীর পূর্ব্বদিকে মস্ত চাতাল। আমার পাঠ সমাপ্ত হইতে হইতে সাঁজের বাতি জ্বালা হইত। ছেলেদের মাস্টার আসিত, উহারা উহাদের পড়িবার ঘরে যাইত। আমি বিনোদিনী ও আমার কনিষ্ঠ কন্যা চারুহাসিনীকে লইয়া ঐ চাতালে, মাদুর কি সতরঞ্চ বিছাইয়া, কি তক্তাপোষে আশ্রয় লইতাম। ঝিকি ঝিকি করিয়া ঊর্দ্ধে নীল আকাশে তারার মালা ফুটিয়া উঠিত—আর আমাদের মস্ত আঙ্গিনায় কতই সুগন্ধি ফুলের গাছ ছিল, সেই গন্ধে মৃদু-মন্দ বাতাসের সঙ্গে আমরা কত সুখ-স্বপ্নই না জাগ্রতে দেখিতাম। আর যখন চাঁদ উঠিত তখন আমাদের আমোদ দেখে কে—আমরা চাঁদের আলোকে ভাসিয়া যাইতাম। "মা গল্প বল," বিনোদ হাঁকিত। আমার গল্প বলিবার ক্ষমতাও অনন্ত ছিল, কেমন যেন যোগাইয়া আসিত। ছেলেদের পড়া শেষ হইয়া গেলে, উহারা আসিয়া যোগ দিত এবং গল্পেতে উহারা বাদ পড়িবার পাত্র আদৌ নয় জানিয়া, আমি চুম্বকে উহাদের

গল্পটী বুঝাইয়া দিতাম। গল্প শুনিতে শুনিতে কেহ বা ঘুমাইয়া পড়িত। উনি বাটী ফিরিতেন—তখন রাত্রে খানা খাবার গোলমালে সেই রাত্রের জন্য গল্পটল্প বন্ধ করিতে হইত।

৪। ওঁর সঙ্গেই প্রায় বিনোদিনী রাতে আহার করিত। খাওয়া সাঙ্গ হইয়া গেলে, ওঁর সঙ্গে খানিকটা দৈনিক জীবনের ঘটনাবলী শুনানি ও আবৃত্তির পর যখন ওঁকে ঘুমন্ত দেখিতাম তখন ও ছেলেদের চাতাল হইতে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিয়া আমার সঙ্গে উহাদের খাওয়াইতাম। গ্রীষ্মের সময় আর চাঁদনী রাতে আমরা টানাপাখা ছাড়িয়া ঐ চাতালে আশ্রয় লইতাম। ওই একটা গল্প আরম্ভ করিতে না করিতে উহারা ঘুমাইয়া পড়িত। আমিও ঘুমাইতাম। শেষ রাত্রে ২॥টা কি ৩টা বাজিলে যখন হিমের প্রকোপ বাড়িত বুঝিতাম, তখন ছেলে মেয়েদের টানিয়া টানিয়া নিজ নিজ বিছানায় ফেলিতাম।

৫। আমার জন্য "বঙ্গ দর্শন," "বান্ধব," "বামা-বোধিনী পত্রিকা," "সুলভ-সমাচার" "চারু-বার্ত্তা" ইত্যাদি কাগজ আসিত; আমাতে আর বিনোদিনীতে তা পাঠ ত করিতামই। তা ছাড়া মাইকেল হেমবাবু নবীনবাবু, বঙ্কিমবাবুও বাদ পড়িতেন না ইংরাজী খবরের কাগজের সংবাদ উনি আমাদের জানাইতেন এবং ভাল ভাল ইংরাজী নভেলি গল্প পড়িয়া তার চুম্বকে

বাংলায় আবৃত্তি আমার কাছে ও বিনোদিনীর কাছে করিতেন।

৬। বিনোদিনীর বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার জীবন কিরূপ ভাবে পিত্রালয়ে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার আভাস দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তাই উহা দেওয়া হইল। আমাদের মেয়েরা পিত্রালয়ে যেরূপ শিক্ষা পায় সেইটাই তার সংস্কার-রূপে মনে গাঁথা হইয়া যায় এবং তার ফলে যখন তার নিজের পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিবার সময় আসে, তখন সেও তদ্রূপভাবে শিক্ষা দিয়া থাকে।

৭। বলা বাহুল্য যে মেয়েদের পিতৃগৃহে প্রথম শিক্ষার সঙ্গে যোগ এবং স্বামিগৃহেই তার পরিণতি। বিবাহের পর, স্বামীর সহিত ঘরকরার কালে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা এবং আচার ব্যবহারের মধ্যদিয়া তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ ও সংস্কারের প্রভাবে এবং ছেলে মেয়েদের লালন-পালনের ও গড়িয়া তুলিবার উদ্যমে নারী জীবনের পূর্ণতা ঘটিয়া উঠে। পিতৃগৃহে সে পূর্ণতা পাইবার উপায় কোথা? পতি-গৃহই নারী-জীবনের শিক্ষার প্রকৃত বিদ্যালয় সুতরাং নারী-জীবন প্রস্ফুটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী। তার ফলে আমরা অনেকেই পিতৃ-গৃহের

"ক খ" পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, কিন্তু বিনোদিনী তাহা ভুলে নাই।

৮। কেতাবি শিক্ষা ছাড়া আর একটা শিক্ষা বিনোদ আমার কাছ থেকে বিশদভাবে পাইয়াছিল, সেটা ঘরকন্না সম্বন্ধে। ভগবানের কৃপায় আমাদের ভাগলপুরের সংসারে কিছুরই অপূর্ণতা ছিল না; চাকরবাকর, গাড়ী ঘোড়া, গরু বাছুর, ছাগল, কুকুর, পায়রা, হাঁস, মুরগী, ময়ূর সবই ছিল—আর তাদের পিছনে লেগে থাক্‌ত আমাদের এক কের-কেরাণী ঝি।

৯। তা ছাড়া ছিল আমাদের মস্ত বাগানের ফল ফুলের, তরি-তরকারির ফসলের ব্যাপার—যাহা আমরা ৭, ৮ জন মালি খাটাইয়া উপভোগ করিতাম তাহা—বৃহৎ। দুই হেঁসেল, একাধারে হিন্দুয়ানি সাহেবী চলিয়াছে। আমি একা গিন্নি, আর বিনোদিনী আমার জুনিয়ারি করিত; পানসাজা, ফাই-ফরমাস সমস্তই করিত। দৈনিক ঘরকন্নার ব্যাপার সমাধা করিতে, ভাঁড়ার দিতে, কে কি খাবে ভাবিয়া সমস্ত "ব্রাহ্মণ ঠাকুর" শারদাকে, আর "বাবুর-চি" ফকিরাকে বুঝ-সমুঝ করিয়া দিতে আমার প্রাণান্ত হইত। এর ভিতর চাকরদের ঝগড়া-ঝাঁটির কথা আছে, তার বিচার আছে,—তাদের গ্রামের, তাদের নিজ ঘর-কন্নার সুখ দুঃখের কথা আছে। তার সঙ্গে ছেলেদের ডাক

আছে—মা এটা চাই ওটা চাই, কাপড় ময়লা, ফরসা কাপড় বার-ক'রে দাও—আজ স্কুলে মাহিনা দিতেই হবে, টাকা দাও; ইত্যাদি।

১০। সব কাজ গুছাইয়া আমার প্রাতঃকালে দম ফেলিতে এবং নিজে স্নানাহার করিতে বোধ হয় কোন দিনই বেলা দুইটার পূর্ব্বে হইত না। এর ভিতর, ছেলেরা খাইয়া দাইয়া স্কুলে গেছে, উনি কাছারি গেছেন। সবারই খাবার সময় নজর রাখিবার ক্রুটী প্রায় হয় নাই। এখন বৃদ্ধ বয়সে, সে বয়সের কার্য্য ক্ষমতা, শরীরে অক্লান্ত বল ভাবিলে স্বপ্নবৎ মনে হয়। নিজেই বিস্মিত হই যে কি করিয়া সেই দৈনিক জীবনের ঘানি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতাম। বে-হিসেবি [illegible] বরদাস্ত করিতে পারিতাম না। যেটি রো[illegible]টি রোজ্ই নিয়মিতভাবে করিয়া রাখিতে হইবে [illegible] সংসার কিরূপে চলিতে পারে? সূর্য্য আজ উঠিলেন, [illegible] উঠিলেন না—তাহাতে কি পৃথিবী চলিত? আমরা যে সংসার ছেলে মেয়েতে সৃষ্টি করিয়া তুলি, সেইটাই যেন পৃথিবী—আর আমরাই যেন তাদের পালন করিবার সূর্য্য স্বরূপ। বৃহৎ সংসারে গিন্নি-পনা কি করিয়া করিতে হয় তাহা আমার জীবন হইতেই বিনোদিনী শিখিয়াছিল।

পঞ্চদশ উচ্ছ্বাস।

১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের সহিত মল্লিক পরিবারের কিরূপ আত্মীয়তা হইয়াছিল। অতুলবাবুর ভাই-ঝি শ্রীমতী জ্ঞানতারার সহিত বিনোদের বালিকা বয়স হইতেই প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। আর সেইরূপ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল ভাগলপুরের আর একজন খ্যাতনামা উকীল গোপালচরণ সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চারুবালার সহিত। জ্ঞানতারার যথা সময়ে এক উচ্চ পরিবারের ছেলের সহিত বিবাহ হইয়া যায়—কিন্তু বিনোদিনী যতদিন জীবিত ছিল জ্ঞানতারার সঙ্গে তার বন্ধুতা ছিল। এমন কি তাহার ছেলেপুলেরাও বিনোদিনার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সৌভাগ্যের-বলে জ্ঞানতারা ও তার স্বামী আজও জীবিত এবং বাগবাজারে সুখে দুঃখে তাঁদের জীবন কাটিয়া যাইতেছে।

২। শ্রীমতী চারুবালা চির-দুঃখিনী। বিনোদিনার ক্ষেত্রমোহনের সহিত বিবাহের আগের বৎসরে,—তিনটী শিশু কন্যাকে লইয়া চারুবালা বিধবা হয়েন। চারুবালা তাঁর পিতার

অত্যন্ত আদরের। কন্যার বৈধব্য-শোক লাঘব হইতে না হইতে, গোপাল বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমার ওরফে "পাগলু" জ্বর-বিকার রোগে, বিনোদিনীর বিবাহের পর বৎসর, হঠাৎ মারা পড়ে। ছেলে ১৭ বৎসরের, ভাগলপুরের জেলা স্কুলে ফাষ্টক্লাসে পড়িত। সে রূপে, গুণে, বলে, ঘোড়-সোয়ারিতে এবং লেখাপড়ায় একরূপ অদ্বিতীয়ই ছিল। তার পদক্ষেপে যেন মেদিনী টলিত। সে বাঁচিয়া থাকিলে দেশের একজন যে সম্ভ্রান্ত পদপ্রাপ্ত হইত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবন ভগবানের—ক্ষুদ্র মানুষ কি করিতে পারে?

৩। গোপালবাবুর ঐ ইন্দ্রজিতের ন্যায় সন্তান-তারা যেদিন ভাগলপুরের আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল, উঃ! সে কি এক ভয়ানক দুর্দ্দিন! এখনও স্মরণ করিলে আমি চমকিয়া উঠি। সেদিন সে রাত আমরা শোকে আছড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে ভাগলপুরের আকাশও কাঁদিয়াছিল। প্রথম জামাতার শোকে আর তার পরেই ছেলের শোকে গোপাল বাবুর মত ধীর-গম্ভীর কর্ম্মঠ-মহারথীকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। "পাগলুর" মৃত্যুর অল্পদিন পরেই গোপালবাবু বহুমূত্র রোগে মারা পড়েন।

৪। গোপালবাবু স্বনাম-ধন্য ৺প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতষ্পুত্র; ভাগলপুরে যশস্বী হইয়া তথাকার মিউনিসিপালিটীর

ভাইস্‌চেয়ার-ম্যান হইয়াছিলেন। তিনি দুইটী নাবালক পুত্রকে, নিজবিধবা কন্যা ও পত্নীকে, আর শিশির নামে এক বিবাহিতা কন্যাকে রাখিয়া যান। তাঁর পত্নী অল্প কয়েক বৎসর হইল সংসারের শোকের হাত হইতে নিবৃত্তি পাইয়াছেন। "পাগলুর" দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে একজন গত, আর একজন ওকালতি করিয়া নিজ উন্নতি সাধন করিতেছেন। বিনোদিনী আর চারুবালা একসঙ্গে ছেলেবেলা খুঁটী খেলিত। চারুবালার হৃদয় কোমলতায় ও স্নেহে পূর্ণ। তিনি এখনও মধ্যে মধ্যে বিনোদের মাকে দেখিয়া যান। তাঁর তিন কন্যাগণকে সব ভাল ভাল ঘরেই দিয়াছেন। তাঁরাও সব স্ব স্ব ঘরে গিন্নিবান্নি, ঠাকুরমা দিদিমা পদবাচ্য হইয়াছেন।

৫। সুখে দুঃখে আমাদের জীবন জড়িত। সুখ ও কাটিয়া যায়—দুঃখেরও অবসান হয়; কিন্তু স্মৃতি থাকে। রামায়ণে, মাইকেলের মেঘনাদে, পড়িয়াছি বীরবাহু আর ইন্দ্রজিতের শোকেই যেন রাবণের ধ্বংস হইল। ক্ষুদ্রভাবে উহারই প্রতিকৃতি যেন গোপাল বাবুর ধ্বংসে আমি আর বিনোদিনী উভয়েই চাক্ষুষ দেখিয়াছিলাম, অনুভব করিয়াছিলাম—তাই সেই ভয়াবহ দৃশ্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। বিশেষতঃ "পাগলুর" সহিত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও স্নেহভাজন শ্রীমান্

বসন্তকুমার মল্লিকের আর আমার বিনোদের অক্ষুণ্ণ ভ্রাতৃভাব ছিল। আমি এখানে সেই বাল-বীর "পাগলুর" জীবনী না গাঁথিয়া ফেলিলে, সেই অনেক দিনের ছিন্ন-মুকুলটী আর ত কেহ মায়া করিয়া তুলিয়া গাঁথিবে না। যাঁরা মায়া কবিবার— তাঁরা ত সকলেই প্রায় ইহ-জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার অশীতি বৎসর জীবনে এইরূপ কত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের নির্ম্মূল উচ্ছেদ দেখিলাম, ভাবিলে ভীত হইতে হয়।

৬। বিনোদিনীর আর এক বাল্যবন্ধুর কথা উল্লেখ করিয়া এই উচ্ছ্বাস শেষ করিব। আমরা ভাগলপুরে বসবাস করিবার অল্পদিনের মধ্যেই ব্রজদুর্লভ বসু মহাশয়ের পরিবারবর্গের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হয়। তিনি তখন ভাগলপুরে গভর্ণমেণ্ট স্কুলে মাষ্টারি করিতেন। ইঁহার কন্যা কাদম্বিনী বিনোদিনী অপেক্ষা ঈষৎ বড়। কাদম্বিনী আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন, বিনোদিনীর সহিত ঘুঁটী তাস ইত্যাদি খেলিতেন। আমরাও অনেক সময় ব্রজদুর্লভ বাবুর বাটীতে যাইতাম। সেই থেকে কাদম্বিনীর সহিত বিনোদিনীর খুবই বন্ধুতা হইয়াছিল এবং সেই বন্ধুতা চিরদিনই বজায় ছিল।

৭। বাঙ্গালী মেয়েদের পক্ষ হইতে কাদম্বিনীই সব-প্রথম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এফ্‌্‌এ পাশ করিয়া কলিকাতার মেডিকেল কলেজে

পুরুষ ছাত্রদিগের সহিত টক্কর দিয়া ডাক্তারি পড়িতে ব্রতী হন এবং পাশটাস করিয়া যশস্বী হইয়া মেয়েদের চিকিৎসক হইয়া প্রাক্‌টিস্ করিতে থাকেন। এই অবস্থায় তাঁর সহিত স্বনাম-ধন্য, স্বাধীন-চেতা, ৺দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিবাহ হয়। ডাঃ মিসেস্ গাঙ্গুলি জীবনের কোন অবস্থাতেই তাঁর বাল্য-বন্ধু বিনোদিনীকে ভুলেন নাই। চিরদিনই তিনি বিনোদিনীকে ভগিনীর ন্যায় দেখিতেন এবং বিনোদিনীর পুত্র কন্যাকে নিজের সন্তান সন্ততির মত জ্ঞান করিতেন। তিনি আর ইহ জগতে নাই। এমন অমায়িক সরল প্রকৃতির বন্ধু আর আমরা পাইব না। আমি তাঁহাকে যখনই ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি, তখনই তিনি সর্ব্বাগ্রে, সব কাজ ফেলিয়, ছুটিয়া আসিয়াছেন। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ-সাধন করুন এবং ইহ-জগতে তাঁর পুত্র কন্যাগণের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি হয়—আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি।

ষোড়শ উচ্ছ্বাস।

১। "কল্যাণের" মাতার বালিকা-জীবনের গঠন-গাঠন কিরূপে তার পিতৃগৃহে হইয়াছিল—তাহার আভাস দিয়াছি। মেয়েরা বালিকা অবস্থায় পিতৃগৃহ হইতে স্বামীর ঘর করিতে কি মানসিক সম্বল লইয়া যায় তাহার উপর দৃষ্টি রাখা খুবই কর্ত্তব্য, যাঁরা পিতৃ-স্থানীয় তাঁদের পক্ষে। যে মানসিক শক্তি, স্বামীর গৃহের সুবাতাসে, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে, বালিকা অবস্থা হইতে যৌবন-পথে আনিয়া ফেলে, সেই শক্তির বীজই বালিকা জীবনের বাস্তব মূলধন। এই মূলধনটাই নারী-জীবনের পক্ষে অমূল্য। অনেক সময়ে—বালিকারা গহনা-গাটীর ও সিল্কের কাপড়-চোপড়ের ভারে সেই অমূল্য ধনটী হারাইয়া ফেলে। যারা—তা না হারায়—তারাই জীবনে স্বামীর ঘর করিয়া জয়ী হয়; সুখ দেয় ও সুখী হয়।

২। নারী জীবনের সুখের সীমানা—স্বামীর নোটের তাড়াতে বা টাকার থলিতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যাঁদের তাই সীমা—তাঁরা মূর্খ। তাঁরা নিজের মন তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না, গহনার আর সিল্কের চাপে; আর আর্সীতে মুখ দেখিয়া

নিজের রূপে ভুলিয়া যান। তাঁরা খেয়াল করিতে সাবকাশ পান না যে—মন বলিয়া একটা জিনিষ আছে কি না, গুণ ও কর্ম্ম বলিয়া জিনিষ আছে কি না। যাঁরা স্বামীর ঘরে নিজের কর্ম্মের গুণে, নিজের গুণপনার গুণে, আত্ম-হারা হইয়া সেবার গুণে সকলকে মোহিত করিতে পারিবেন—সে সব স্ত্রীরত্নদের স্বামীরা যে তাঁহাদিগকে মাথার-মুকুট করিয়া রাখিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। স্ত্রীরা যেন না ভুলেন যে স্বামীরা রূপ হইতে গুণেরই আদর অধিক করিয়া থাকেন।

৩। বিনোদিনার জীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে যে সে তার স্বামী ক্ষেত্রমোহনের মনের সঙ্গে নিজের মনকে সম্পূর্ণ মিশাইয়া ফেলিতে পারিয়াছিল। এবং সেই গুণেই সে স্বামী-সোহাগিনী হইয়াছিল। যে স্ত্রী স্বামীকে নিজের মানসিক-গুণে জয় করিতে পারে, তার শক্তি, আধিপত্য নিজ সন্তান সন্ততির উপর যে অপ্রতিহতভাবে থাকে তা নিশ্চিত। বিনোদিনীর জীবনে তাহাই হইয়াছিল।

৪। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্ষেত্রমোহন একজন মহাপুরুষ। বিদ্যাতে বুদ্ধিতে, পরোপকার করিতে, স্বার্থত্যাগ করিবার ক্ষমতাতে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। যখন ক্ষেত্রমোহন কলেজের ছাত্র তখন হিন্দু-সমাজ নিতান্তই দলাদলিতে প্রপীড়িত হীন-

প্রভ। তথনকার দিনে হিন্দুধর্ম্মটা যে কি, কেহ তাহা আমাদের যুবকদের বুঝাইতে চেষ্টা করিত না। যে সকল যুবকেরা অধিক চিন্তাশীল এবং মনে মনে একটা মহা আদর্শ খাড়া করিয়া নিজেকে সেই মত গঠন করিতে ব্রতী, তা'দের মানসিক উৎকর্ষ যে ধর্ম্ম-জীবনের ভিতর দিয়া গঠিত হইয়া উঠিতে চায়, তাহা কি খালি দেব দেবীর বাহ্যিক মূর্ত্তি পূজাতে এবং ঐ মূর্ত্তিপূজা সংক্রান্ত হৈ চৈ ব্যাপারে, চীৎকারে, আড়ম্বরে, অথবা পাঁঠা-বলি আর মহিষ-বলির রক্তপাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে? কখনই পারে না।

৫। সেই কারণে তখনকার ছেলে ছোকরারা দলে দলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কেশব সেনের লেক্‌চার শুনিত আর ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিত। জাতীয় উন্নতি সাধন, জাতীয় কুসংস্কার ছেদন, জাতির "জাতীয়তা" তুলিয়া দিয়া ভারতে একটা মহাজাতির সৃষ্টি করিবার প্রেরণা তা'দের প্রাণে আসিয়াছিল। তাই তা'রা নির্ভীক হৃদয়ে, সংসারের সুখ সম্পদ তুচ্ছ করিয়া বরং আপদ কষ্ট জীবনে টানিয়া আনিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়াছিল। তা'রা বীরের কাজই করিয়াছিল।

৬। আমার জামাতা ক্ষেত্রমোহন সেই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রবর্ত্তনের যুগের এক মহাবীর। সৎপথে থাকিব, সত্য কথা বলিব,

মদ স্পর্শ করিব না, বহু বিবাহ করিব না, এক ঈশ্বরকে উপাসনা করিব, জাত মানিব না, কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করিব না ব্রাহ্মণ হইলে পৈতা ফেলিয়া দিব—এই ত ব্রাহ্ম-সমাজের ভিত্তি। উন্নত সাধু চরিত্রের ছেলেরা যদি সে সমাজ-ভুক্ত হয় ত দোষণীয়—কোথায়? হিন্দু-সমাজে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অপণ্ডিত আছেন যাঁরা বস্তুতঃ কিছুই মানেন না, লুকাইয়া সব খাইয়া থাকেন, অথচ তাঁরা হিন্দু সমাজের বড় বড় খিলেন, পিলে, থাম। তখনকার দিনে উন্নতপ্রাণ যুবকেরা স্পষ্টই বলিত যে আমরা লুক্কায়িতভাবে কিছুই করিব না; ভণ্ডামি করিব না; যদি মাংস খাইতে ইচ্ছা যায়—ত প্রকাশ্যভাবে হোটেলে গিয়া খাইয়া আসিব।

৭। হিন্দু-সমাজে অতিশয় ভণ্ডামির প্রশ্রয় পায় বলিয়া যেন হিন্দু-ধর্ম্মটাই হানপ্রভ হইয়া গিয়াছে। আমরা সামাজিক ভাবে সচ্চরিত্রের সৎগুণের বা সৎকর্ম্মের মর্য্যাদা করি না বলিয়া আর কতকগুলি আচারকে ভুল করিয়া ধর্ম্মের আসনে বসাই বলিয়া—আমরা মনুষ্য-সমাজে যেন হেয় হইয়া পড়িয়াছি। ছেলেবেলা থেকে আমাদের ঘরোয়া জীবন এক রকম—আর বাহ্য জগতের জীবন বা সামাজিক জীবন অন্য রকম। এই দোষ; আর আমাদের জাতীয় শ্রেণীগুলাকে অতি কঠিন-নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিবার দোষও আছে।

৮। ব্রাহ্ম-সমাজের বন্যার যুগে যখনই উৎসাহে যুবক বৃন্দ ঐ সমাজে নাম লেখাইয়াছে, তখনই তাদের উপর—নির্য্যাতন সুরু করা হইয়াছে, তা'দের একঘরে করে পিষে ফেলবার চেষ্টা হইয়াছে। তাদের পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ঐ সকল ধার্ম্মিক উন্নত-চেতা সন্তানদের হিন্দু-সমাজ কঠিন হৃদয়ে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া—নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন, অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, অন্যায় করিয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। ছেলেরা কোন ভাল কাজ করিব বলিয়া গোঁ ধরিলে পিতামাতাকে টলিতেই হয়। তারা কি তখন তোমার ক্রোধকে লাঞ্ছনাকে পরোয়া করে ?

৯। ব্রাহ্ম-সমাজের অপরাধ এই যে তাঁরা আধুনিক হিন্দু-সমাজের ব্যাখ্যাত "বর্ণাশ্রম" মানিয়া চলিতে অনিচ্ছুক। ব্রাহ্মেরা বলেন :—"গীতায়, মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা যে "বর্ণাশ্রম" দেখিতে পাই তাহা, জাতিতে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইলেও, গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা পরিমিত। পূর্ব্বে সৎগুণ-সম্পন্ন শূদ্রও নিজ কর্ম্মগুণে বৈশ্যের, ক্ষত্রিয়ের, এমন কি ব্রাহ্মণের পঙ্‌ক্তিতে উঠিতে পারিত। কিন্তু অধুনা মূর্খ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত টীকাকারেরা ঐ সকল শাস্ত্রের সুব্যাখ্যা বা সৎব্যাখ্যা না করিয়া, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজেদের ব্রাহ্মণত্ব-পদ চিরদিন

অথর্ব্ব রাখিবার জন্য, চতুর্ব্বর্ণের প্রত্যেক বর্ণটীকে এমনি কঠিন-নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন যে নিম্নতন বর্ণের লোকেরা হাজার সৎগুণ সম্পন্ন হইলেও উপরের বর্ণে উঠিতে কখনও পারিবে না। আর সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় ব্রাহ্মণ সহস্র পাপ-কার্য্য করিলেও আর নীচের বর্ণে নামিতে পারিবেন না। জাতকে টিকিট মারিয়া থাকে থাকে লাইব্রেরীর সেল্‌ফে বইয়ের মত সাজাইয়া ফেলিলে সে স্পন্দনহীন চলৎ-শক্তি-হীন বই হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইল, নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইল। কিন্তু মনুষ্য সমাজ ত আর জড় বস্তুর সমাজ নয়; তাই শিক্ষার আবেগে, স্বাধীন চিন্তার আবেগে গণ্ডীর বাহিরে লোকে আসিতে লাগিল। গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া হিন্দুরা মিলেমিশে কখনও এক মহাজাতিতে পরিণত হইবেন না, হইতে পারেন না। শাস্ত্রের ভিতর দিয়া টীকাকারদের সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে না পারিলে, শাস্ত্রকার ঋষিদের সৎ-উদ্দেশ্য যাহা দেখিতে পাই, তাহা চিরদিনই ঢাকিয়া থাকিবে। হিন্দুদের চতুর্ব্বর্ণের ঐ নিগড় কাটিয়া হিন্দু-সমাজকে স্বাধীনতার সোপানে বসানই ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্দেশ্য—যাহাতে মিলেমিশে তাঁরা একটা মহাজাতিতে গঠিত ও এক পরমেশ্বরের উপাসক হইয়া পৃথিবীতে হেয় না হইয়া সম্মানিত হইতে পারেন"।

৯। আমি ব্রাহ্ম-সমাজ সৃষ্টির ঐ মুখ্য ও নিগূঢ়-উদ্দেশ্য আমার জামতা ক্ষেত্রমোহনের মুখে শুনিয়াছি। উহাতে আমি ত কিছুই দোষের দেখি না। বিশেষতঃ বৌদ্ধ পূর্ব্ব আর্য্য যুগে—আমাদের ত্রিবেদে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ পদ্ধতি, কি ছিল তাহার সম্পূর্ণ যথাযথ ইতিহাস নাই। তারপর বৌদ্ধ যুগের একাকারে, অবৈদিক-নিরীশ্বরবাদে দেশ ত প্লাবিত হইয়া গেল। আর বস্তুতঃ সেই বৌদ্ধ যুগ সমাপ্ত হইল, কুমারিল ভট্টের হস্তেও নয় আর তৎশিষ্য শঙ্করাচার্য্যের হস্তেও নয়, মুসলমানী যুগ প্রবর্ত্তনের পরে; খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। সেই মুসলমানী যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংসের পর, হিন্দু সমাজ, শ্রীহান উৎখাত বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণী গৃহী ও শিল্পী প্রজাদের লইয়া পুনর্গঠিত হইল। বর্ণাশ্রমের কঠিন গণ্ডী ও সেই সময় হইতেই সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, পুরুষানুক্রমে বর্ণাশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

১০। তারপর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসুন। ঐ তিন শতাব্দীতে মুসলমানের অত্যাচারে প্রলোভনে কত লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তান, কত গ্রামকে গ্রাম, হিন্দুয়ানী ছাড়িয়া একেবারে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে

তাহার কি সংখ্যা আছে! হিন্দু-সমাজ ত তখন ধ্বংসের মুখে। তখনকার দুর্দ্দিনে, যখন উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজেদের পরিবারবর্গের ইজ্জৎ রক্ষার্থ এ গ্রাম হইতে ও গ্রামে পলাইতেন, এক দেশ হইতে অন্য দেশে বসবাস উঠাইয়া লইয়া যাইতেন, তখন "বর্ণাশ্রম" প্রথা প্রচলিত ছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

১১। তারপর ঐ খ্রীষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর শেষভাগে, মনে রাখিবেন, আবিভূ'ত হইলেন মহাপ্রভু—শ্রীচৈতন্য। তখন আমাদের বাংলা দেশ মুসলমানী পরাধীনতার ভিতর এইভাবে স্বাধীন ছিল যে বাংলার তক্তে এক স্বাধীন নবাব রাজত্ব করিতেন; তিনি দিল্লীর তক্তে অধিষ্ঠিত সুলতানদের ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। বাংলার নবাব বাঙ্গালাকে ভালও বাসিতেন আর সময় সময় পীড়নও করিতেন। বাংলার টাকা বাংলা দেশেই ব্যয়িত হইত, দিল্লী যাইত না। বাংলা দেশের লোক তখন পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। আর পেট ভরিয়া খাইতে পাইত বলিয়াই তখনকার দিনে বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তার করিবার কেন্দ্রস্থান নবদ্বীপ ভক্তিহীন নৈয়ায়িকদের দলে ভরিয়া গিয়াছিল। নৈয়ায়িকদের দল নাস্তিকদের দলেরই কেবল নামান্তর। তাঁদের কেবল তর্ক আর বিতর্ক অসীম অনন্ত

গঙ্গার-জল-প্রবাহের মত ভাসিয়া যাইত। কোনও ফল প্রসব করিত না। বাংলা দেশের ঐ অবস্থা, শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব্বে।

১২। শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়—১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু-জাতিকে পুনরুদ্ধার করিয়া একটা মহাজাতিতে গঠিত করিয়া তুলিবার জন্য, নিজে গৃহস্থাশ্রম ও সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বুদ্ধ-দেবের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইয়াও বর্ণাশ্রম বা জাত্যাভিমানকে তুচ্ছ করিয়া তাঁর জ্বলন্ত-ভক্তি-প্রণোদিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে এক নবযুগ সৃষ্টি করেন। তাঁর জ্বালাময়ী শিক্ষাতে কি কোথাও হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজ বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত এ কথা বলিয়া গিয়াছেন? আর এটা অকাট্য যে শ্রীচৈতন্য একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। আর এটাও ঠিক যে তিনি অসত্যকে সত্য বলিয়া বা সত্যকে মিথ্যা সাজাইয়া দেশ-বাসীর নিকট ধরেন নাই। তাঁর শিক্ষাতে ত আমরা এই পাই যে বিষ্ণুকে ভক্তি করিলে, ভগবানকে মানিয়া চলিলে, ভক্তি-মার্গের প্রশস্ত ও অবারিত দ্বার দিয়া এমন কি মুসলমান ও হিন্দু-ধর্ম্ম-ভুক্ত হইতে পারিবে, হিন্দু-সমাজে প্রবেশ লাভ

করিতে পারিবে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর ২৪ বৎসর ভগবানকে কিরূপে ভক্তি করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত নিজদেহে বাক্যে ও কর্ম্মে প্রকাশ্যভাবে জন-সাধারণকে, জাতি নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিয়া নিজ দলভুক্ত করিয়া তিরোহিত হন। তাঁর প্রধান শিষ্যেরা তাঁহার পদানুসরণ করিয়া বঙ্গে বিশেষভাবে বৈষ্ণবী যুগ আনয়ন করেন; এবং তাহার ফলে অধিকাংশ বাঙ্গালীই বৈষ্ণব হইয়া পড়েন।

১৩। ঐ বৈষ্ণবী-যুগ-মাহাত্ম্য আজ নব্য-বাঙ্গালার স্মরণে না থাকিতে পারে কিন্তু বাংলা ভাষায় সেই ভক্তি-লীলার-লহরী স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বৈষ্ণবেরা পাছে তাদের প্রবল ভক্তি-স্রোতে সমগ্র হিন্দু জাতিকে এক করিয়া ফেলিয়া মুসলমানদের কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, এই ভয়ে বৈষ্ণবদের উপর মুসলমান রাজশক্তি ভীষণ অত্যাচার করিতে ছাড়েন নাই। এবং সেই অত্যাচারের ফলে আমরা যে অমৃতময়ী মাতৃভাষা পাইয়াছি তাহার উল্লেখ আমি ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে এইটা বেশ বুঝা যায় যে আমাদের বাংলা ভাষাটাই আমাদের জাতীয়-জীবনের অন্তর্নিহিত দুঃখের একটী মহাগীত।

১৪। বিষ্ণু বা হরি ভক্তির স্রোতে বাংলা দেশ বৈষ্ণবী যুগে যেরূপ প্লাবিত হইয়াছিল, ইংরাজ শাসিত বাংলা দেশও

"রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ" প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোতে অনেকটা সেইরূপ প্লাবিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ১৮৬৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত।

১৫। নানাকারণে ব্রাহ্ম-সমাজ যদিও অনেকটা আজ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এক সময়ে যে ব্রাহ্ম-সমাজ উন্নতমনা যুবকদিগকে খ্রীষ্টানী মিসনারিদের মুখ হইতে টানিয়া রাখিয়াছিল, ভদ্রলোকদের মন্তপান হইতে বিরত করিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজের গুণে আর দৃষ্টান্তে হিন্দু-সমাজের ভিতর নারী-শিক্ষার বিস্তার চলিয়াছে এবং অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দিবার প্রথা খুবই কমিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বারা দেশের—ভারত মাতার—একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজের বিবাহের নিয়মমতে এক জাতির অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ হইতেছে, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন 'প্রভিন্সের" ছেলে মেয়েতেও বিবাহ হইতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজের বিবাহের দ্বার দিয়া, ভারতে কালে এক মহাজাতির স্থষ্টির পথ পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। এইটা ভারতের পক্ষে নিতান্তই শুভ।

১৬। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু-সমাজ যে তার জানালা দরজা বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে, তাহা

হইতেই পারে না। বাঁচিতে গেলেই চলিতে হইবে, সময়ের স্রোতে গা ভাসাইতে হইবে। হিন্দু-সমাজের সংস্কার প্রয়োজন। হিন্দু-সমাজের ভিতর জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব কায়েম রাখিলে অন্যান্য বর্ণের প্রতি একটা মহা অবিচার হয়, ইহা দেশবাসীরা যেন মনে রাখেন। গুণে আর কর্ম্মে ব্রাহ্মণত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু তাহা এখন সহজে করিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব। তবে কি আমাদের উদ্ধারের পথ নাই? আছে; সেটা এই:—যাঁহারা আজ কাল ব্রাহ্মণদের নিম্নস্তরে আছেন তাঁহারা সকলেই যদি "হিন্দু-সন্তান" নাম লইয়া এক নূতন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পৈতা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন একদিনে কি মহাবীর্য্যে ভারত স্পন্দিত হইতে থাকিবে। তখন ব্রাহ্মণকেও "হিন্দু-সন্তান" ভুক্ত হইতে কুন্ঠিত হইবার প্রয়োজন থাকিবে না। ব্যাপারটা কি হইবে একবার ভাবুন দেখি; একদিনে ভারতের সমগ্র হিন্দু-জাতি, পৈতা পরা "হিন্দু-সন্তান" ওরফে "ব্রাহ্মণ" হইবে। একদিনে সংকীর্ণ, থাক্‌বাঁধা হিন্দুজাতি, পৃথিবীতে এক মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তখন বুঝিবেন যে সেই পৈতা গ্রহণই সিদ্ধ যার শক্তিতে ভারতে হিন্দু-জাতি এক-সূত্রে বাঁধা হইল ও এক মহাজাতিতে পরিণত হইল। আমি বৃদ্ধা, পথের ইঙ্গিত,

করিয়া যাইতেছি, আপনারা যুবক, আপনারা কর্ম্মী, ভারত-মাতা আর তাঁর ভবিষ্যৎ যে আপনাদের হস্তে তাহা মনে রাখিবেন।

শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী।

সপ্তদশ উচ্ছ্বাস।

১। আমার "কল্যাণ" কে বুঝিতে গেলে, তার পিতা মাতাকে ভাল করিয়া বুঝিবার দরকার। আর তার পিতা মাতা কে বুঝিতে গেলে "ব্রাহ্ম-সমাজ" কি মহৎ আদর্শ বুকে বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিল তাহা বুঝিবার ও মনে রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন। যদিও আজ কাল শীর্ষস্থানীয় লোকাভাবে ব্রাহ্ম-সমাজ সেরূপ জোরে চলিতেছে না আর অনেকটা হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ক্ষেত্রমোহন ও বিনোদিনীর সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ খুব জোরের সহিতই চলিয়া ছিল। ক্ষেত্রমোহন আর বিনোদিনী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের মহৎ আদর্শ নিজেদের জীবনেও সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপে খাট হইতে দেন নাই।

২। ক্ষেত্রমোহন সংসারী হইয়াও তাঁর মনকে সংসারে লিপ্ত হইতে দেন নাই। তিনি প্রকৃতিতে এত সরল ছিলেন যেন ঠিক মহাদেব বা বুদ্ধের ন্যায়; নিয়তই যেন এক গভীর চিন্তায় তাঁর আত্মা মগ্ন থাকিত; এ কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। সাহিত্য চর্চ্চায়,ধর্ম্ম চর্চ্চায়,সঙ্গীত চর্চ্চায় তাঁর বিশাল চক্ষুদ্বয়,মুখের জ্যোতিঃ

আরও ফুটিয়া উঠিত। বাংলায় গান লিখিবার,পদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁর বেশ ছিল। তাঁর গলা অতি সুমিষ্ট, সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। কি ছেলে, কি বৃদ্ধ—সকলের সঙ্গে প্রীতি, সদ্ভাব স্থাপন করিবার তাঁর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। ভাল ভাল ইংরাজি নভেল পড়া যথা—ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জইলিয়াট তাঁর একটা দৈনিক কর্ম্মের মধ্যেই ছিল। পড়িতে পড়িতে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যেন ঠিক "ব্যোম ভোলানাথ" যোগাসনে। পাঠের সময়—তাঁর শালা শালীরা কত টানা হিঁচ্ড়া বিরক্ত করিত কিন্তু তাঁর সেই তন্ময়তা ঘুচাইতে পারিত না।

৩। কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি অনেক বন্ধু বান্ধব যোগাড় করিয়াছিলেন, বিশেষ ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতরে। সে সব বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে দুইটী বন্ধু যেন ক্ষেত্রগতপ্রাণ ছিল; তাই তাঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটী ৺ আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি মেয়েদের বেথুন কলেজে প্রফেসারী করিতেন। ইনিও একজন ত্যাগী পুরুষ। ব্রহ্ম-সমাজে ঢুকিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহার পিতাও ক্রোধান্ধ হইয়া উঁহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন আর উইল দ্বারা তাঁর সম্পত্তি হইতে পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত করিয়া যান। ইনি বিশেষ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ব্রহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক কাগজে

প্রায়ই এঁর প্রবন্ধ থাকিত। অপরটী ৺ মহেন্দ্র নাথ দাঁ। ইনিও সাহিত্যসেবী। "সৈরিন্ধ্রী" নামে তাঁর এক নভেল বোধ হয় আজও বাজারে পাওয়া যায়। ইনি বহুদিন যাবৎ অ্যালবার্ট কলেজে প্রফেসারী করেন ; পরে বি. এল পরীক্ষা দিয়া আসাম অঞ্চলে তেজপুরে ওকালতিতে অনেক অর্থ উপায় করিয়াছিলেন। ইনি বিপত্নীক হওয়ায়, ক্ষেত্রমোহনের আর আদিত্য বাবুর, ও অন্যান্য হিন্দু-সমাজ সংস্কারকদের বিশেষতঃ "বান্ধব" সম্পাদক যোগীন্দ্র বাবুর উৎসাহে দ্বিতীয়বার যে বিবাহ করেন—তিনি এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের বাল-বিধবা, তিনিও স্বর্গগত।

৪। ক্ষেত্রমোহনের যখন বিনোদিনীর সহিত বিবাহ হয়,—তখন তিনি মালদহে ডেপুটি ছিলেন পূর্ব্বে বলিয়াছি। তার কয়েক মাস পরে তাঁকে হুগলীতে বদলি করে। তখন চুঁচুড়ায় আমাদের দেশের স্বনামধন্য ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক বাসায় থাকিয়া হুগলীতে হাকিমি করিতেন। সেই বাসার অর্দ্ধেক অংশ ক্ষেত্রমোহন ভাড়া পাইয়াছিলেন। বাড়ীটা মস্ত আর ঠিক গঙ্গার উপর। বঙ্কিম বাবুর আর ক্ষেত্রমোহনের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান একটি দেয়াল কিন্তু সে দেয়ালে একটা দরজা ছিল। আমি ক্ষেত্রমোহনের মুখে শুনিয়াছি যে কাচারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বঙ্কিমবাবু সেই দরজা দিয়া ক্ষেত্রমোহনকে অনেক সময়ে ডাকিতেন

এবং নিজে আরাম চৌকিতে শুইয়া, সরবৎ পান করিতে করিতে তাঁর জগৎ বিখ্যাত "আনন্দ মঠ" মনে মনে রচনা করিয়া মুখে অনর্গল বলিয়া যাইতেন আর ক্ষেত্রমোহন তাহা লিখিয়া ফেলিতেন। তিনি ক্ষেত্রমোহনকে ছোট ভায়ের মত দেখিতেন। যে মহেন্দ্রক্ষণে বঙ্কিম বাবু "বন্দে-মাতরম্" গান রচনা সমাপ্ত করেন, তৎদণ্ডেই ক্ষেত্র-মোহনকে দিয়া হারমোনিয়ামে সুর চড়াইয়া ঐ গান তাঁহাকে দিয়া গাওয়ান। সদ্যঃপ্রসূত "বন্দেমাতরম্" যে সুরে ক্ষেত্রমোহন প্রথম গাহিয়াছিলেন, জানি না সে সুর আজও সেই চির-যৌবন ও অমরত্বপ্রাপ্ত "বন্দেমাতরমের" বজায় আছে কি না। খুবই সম্ভব নাই, না—থাকিবারই কথা। ধাইমা শিশুকে আঁতুড়ে যে নেকড়ায় জড়াইয়া ফেলে, তাহা সেই শিশু-অঙ্গে আর কতদিন থাকে ?

৫। তখনকার দিনে চুঁচুড়া বাংলা-সাহিত্য-জগতের একটী কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে যেমন "বান্ধব" সম্পাদক যোগীন্দ্রবাবু, অপরদিকে খোদ্ বঙ্কিমবাবু আর তাঁর খুব নিকটেই বাস করিতেন এবং সাপ্তাহিক "সাধারণী" চালাইতেন সাহিত্য-মহারথী বাবু অক্ষয়কুমার সরকার। ইনিও ক্ষেত্রবাবুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন;

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী।

এবং তাঁর ও তাঁর বন্ধুদ্বয়ের নিকট হইতে প্রবন্ধাদি যোগাড় করিতেন।

৬। সে সময়ে চুঁচুড়াতে ব্রাহ্ম-সমাজের জম-জমাও বেশ ছিল। একটী বন্ধুর বাটীতে প্রত্যেক রবিবারে সম্মিলন বৈঠক্ বসিত এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা চলিত। এই অবসরে বিনোদিনীর অন্যান্য ব্রাহ্ম পরিবার বর্গের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটিত।

৭। চুঁচুড়াতে গঙ্গার ধারের বাটীতে থকিবার বিশেষ সুবিধা এই যে ওপারেই নৈহাটী। সেখান হইতে কলিকাতা, সিয়ালদহ ষ্টেসনে, একঘণ্টার ভিতর আসা যাওয়া চলে। চুঁচুড়ায় থাকিয়া কলিকাতার আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা খুবই সহজ ছিল। অন্যান্য দূর মফঃস্বল সহরে বস-বাস করিলে ঘন ঘন কলিকাতায় আসা যাওয়া চলে না। বাঙ্গালী মাত্রেরই কলিকাতার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হয়। সে সম্বন্ধে ক্ষেত্রমোহন আর বিনোদিনীর সৌভাগ্য ভাল।

৮। খ্রীঃ ১৮৮০ নভেম্বরে বিনোদিনীর প্রথম একটি কন্যা হয় আমার দাদা ব্যারিষ্টার ৺ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খিদিরপুরের বাটীতে আর আমার ভাজ ৺ হেমাঙ্গিনী দেবীর তত্ত্বাবধানে। তাঁরা দুইজনে বিনোদিনীকে

খুবই ভাল বাসিতেন। আমার ভাজের কাছে আমি চিরদিনই—"বিনোদের-মা"।

৯। ৺ হেমাঙ্গিনীর গুণের কথা লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র পুঁথির প্রয়োজন। আমরা দুইজনেই সমবয়সী; ১০।১১ বৎসর বয়সে আমাদের দুজনার পাল্‌টী ঘরে বিবাহ হয়। আজ আমার প্রায় ৭০ বৎসরের স্মৃতিতে হেমাঙ্গিনী জড়িত। আমি বিবাহের পর প্রথম বৌ হইয়া হেমাঙ্গিনীর পিত্রালয়ে যাই। তাঁর পিতা বৌবাজারের সুবিখ্যাত ৺ নীলমণি মল্লিক। তিনি আমার স্বামীর বড় মামা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমার বিবাহের পর আমার দাদার বিবাহ হয়। হেমাঙ্গিনী বৌ হইয়া আমার পিতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্নি গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিমলার বাটীতে উঠেন। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত নিকট, আমাদের দু'জনার ভিতর প্রণয় এত গাঢ় ও মধুর যে ননদে ভাজে এমনটী প্রায় দেখা যায় না। তাই ইচ্ছা আছে এই পুস্তকে তাঁর ও আমার দাদার ছবি দুইখানি দিব। তাঁদের দুই জনের জীবনী লিখিবার সাধ থাকিলেও আর সাধ্য নাই। আশা করি আমাদের সন্তান সন্ততিদের ভিতর কেহ না কেহ উহা লিখিতে সাহসী হইবে।

১০। আমার দাদা যে ব্যারিষ্টারিতে শীর্ষ-স্থান অধিকার

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে কংগ্রেসের একজন প্রধান স্রষ্টা ও উহার প্রথম ও অষ্টম প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিয়াছিলেন, এ সমস্তই আমার বিশ্বাস আমার ভাজের স্বামি-ভক্তির গুণে, ত্যাগ স্বীকারের বলে। আমার দাদার যথাযথ জীবনী কেহ না কেহ অবশ্যই লিখিবেন। তিনি কেবল বাংলা দেশের নহেন, সমগ্র ভারতের। তাঁহার জীবনী না লেখা হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। যে মহাত্মাই সে কার্য্যে ব্রতী হউন তিনি যেন সেই সঙ্গে তাঁর পত্নী হেমাঙ্গিনীকে না ভুলেন।

অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস।

১। বিনোদিনীর প্রথম কন্যার জন্মের কথা বলিতেছিলাম। কন্যাটীর নাম "লীলা" রাখা হয়। বাস্তবিক সে ননীরপুতুল হইয়া জন্মিয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৮১র ফাল্গুন মাসে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পৈতার পর বিনোদিনী তাহার মেয়েকে লইয়া আমার সঙ্গেই ভাগলপুরে আসে এবং আমার কাছে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া চুঁচুড়ায় স্বামীর গৃহে ফিরিয়া যায়। অল্পদিনের মধ্যেই "লীলা"—আমাদের, আমার অন্যান্য ছেলে মেয়েদের এত আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আর বলিবার নয়। আমার কাছ থেকে ফেরত গিয়া সে মেয়ে বেশই বাড়িয়া উঠিতেছিল কিন্তু হঠাৎ খবর আসিল যে সে কঠিন পেটের অসুখে তিন দিনের রোগে মারা পড়িয়াছে। তখন তার বয়স ৭ মাস। সেই খবরে আমরা নিতান্তই শোকগ্রস্ত হইয়াছিলাম; তার নিজের পিতা মাতার ত কথাই নাই।

২। সে সময়ে আমার কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। মনের আবেগে, খেয়াল মত লিখিতাম; আমার স্বামীকে ছেলে মেয়েদের শুনাইতাম; তাহা খাতাতেই জমা থাকিত। উনি উহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে উৎসুক হইলে আমার জামাতা

ক্ষেত্রমোহন তার ভার লয়েন। তিনি তাঁর বন্ধুদ্বয় আদিত্য বাবু, ও মহেন্দ্র বাবুর সাহায্যে "বন-প্রসূন" নাম দিয়া আমার লিখিত পদ্যগুলি খ্রীঃ ১৮৮২তে প্রকাশ করেন। আমি উহা আমার দাদাকে উপহার দিই। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে এত অধিক শোক পাইয়াছি যে খ্রীঃ ১৮৮১তে লীলা যাওয়ার শোক যেন একেবারেই মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। ঐরূপ ভাবে গুরু-শোক, লঘু-শোককে যদি চাপিয়া না রাখিতে পারিত তাহা হইলে মানুষ বোধ হয় বাঁচিতে পারিত না। যিনি প্রাণ দিয়াছেন, তিনি প্রাণ রক্ষার উপায়ও দিয়াছেন যতক্ষণ অবধি প্রাণ ত্যাগ না হয়।

৩। "কল্যাণের" জন্ম হইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রমোহন আর বিনোদিনী "লীলা" যাওয়াতে যে বিশেষ ভাবে ঘা পাইয়াছিলেন এইটাই স্মরণীয়। আমার ক্ষুদ্র কাব্য পুস্তিকা "বন-প্রসূনে" লীলা যাওয়াতে কিছু লিখিয়াছিলাম, তাহা হঠাৎ মনে হইল—পড়িয়া দেখিলাম। "লীলা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাই নামান্তর করিয়া দিলে "কল্যাণ" সম্বন্ধেও ঠিক খাটে বলিয়া, "বন-প্রসূন" হইতেই—"কেন হইল সেদিন" শীর্ষক কবিতাটী কতেক বাদ-সাদ দিয়া এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতে সাহসী হইলাম :—

কেন হইল সে দিন?

(১)

কেন হইল সে দিন?

ঘটিল মহা বিষাদ, পাইলাম কুসংবাদ,

আমার লীলার পীড়া বড়ই কঠিন।

শুনি' সে বিষম বাণী, শিহরিল মমপ্রাণী,

সহসা কাঁপিল অঙ্গ যেন বলহীন।

কেন হইল সে দিন?

(২)

কেন ভাঙ্গিল রে আশা

কেন হ'লরে নিধন, কত সাধের সে ধন,

কতই যতন যায়—কত ভালবাসা?

কেন ভাঙ্গিল রে আশা?

যারে সুস্থ হেরি' কত, আশা হৃদে বিকাশিত,

অকালে কেন রে কাল হরিলি সহসা?

কেন ভাঙ্গিল রে আশা?

(৩)

কেন ঘটিল এমন ?

সে ধন যাবার নয়, তবু গেল অসময় ;—

কে পারে বলিতে কিবা ইহার মরম ?

কেন ঘটিল এমন ?

নিমেষে গলিয়া গেল, হেন সুস্থ সুকোমল,

সুন্দর সে ক্ষুদ্রকায় বলিষ্ঠ কেমন !

কেন হইল এমন ?

(৪)

লীলা কোথায় পলা'ল ?

ধরায় কেন বা এল, ছাড়িয়া কেন বা গেল,

কে দিবে উত্তর তার—কেন রে পলা'ল ?

লীলা কোথায় পলা'ল ?

কেন নিদারুণ বিধি দিয়াছিলে সেই নিধি ?

দিয়া পুনঃ নিলে কাড়ি', দিবার কি ফল ?

লীলা কোথায় পলা'ল ?

(৫)

কোথা হ'তে এসেছিল, কোন পুরে পলাইল ?

খুঁজিলে কি নাহি মিলে কোথায় রহিল ?

লীলা কোথায় পলা'ল ?

পবন উত্তর করে "লীলা গেছে স্বর্গপুরে

এসেছিল যথা হ'তে তথা চলি' গেল।"

লীলা কোথায় পলা'ল ?

(৬)

কে বলিবে লীলাধন কেন তথা গেল ?

মানি আমি স্বর্গপুর, জানি না সে কতদূর ;

সেখানে লীলার কান্তি কিরূপ হইল,

লীলা কোথায় পলা'ল ?

(৭)

আর না পাইব সেই ননীর পুতুল ;

সেই অঙ্গ মনোহর. সেই হাসি কি সুন্দর.

আর না হেরিব সেই নন্দনের ফুল ;

আর না পাইব সেই ননীর পুতুল।

মার কোল শূন্য ক'রে কোথা ভাসাইল তারে ?

শোক ভরা হিয়া মোর হতেছে আকুল ;

আর না পাইব সেই ননীর পুতুল।

(৮)

তারে হারায়েছি হায় !

চিরদিন কাঁদি যদি, পাব না হারাণ নিধি

আর না পাইবে আঁখি হেরিতে তাহায়

তারে হারায়েছি হায় !

আমার নয়ন মণি সহাস্য বদনখানি

আর না দেখিতে পাব সে কোমল কায়

তারে হারায়েছি হায় !

(৯)

কত সাধের সে নাম !

পূরাইয়া সেই সাধ, ঘটায়ে ঘোর বিষাদ

লীলা খেলা করি,—লীলা গেছে নিজ ধাম

কত সাধের সে নাম !

আমার আমার করি পরিণাম অশ্রুবারি

মুছে গেল—মনোমত সেই লীলা নাম

কত সাধের সে নাম !

(১০)

কত যতনের লীলা !

নশ্বর মানব কায়, যতনে না রাখা যায়

যাইবে হইলে সাঙ্গ সংসারের খেলা

কত যতনের লীলা !

গেল যদি থাক্ সুখে, যতনের ধন।

গেছে সে ভাবিলে মনে, দহেপ্রাণ শোকাগুণে

তাই ভাবি বিভু কোলে খেলুক সে ধন ;

সুখেতে থাকুক তথা প্রাণের রতন।

৪। "কল্যাণের" জীবনীর পূর্ব্বাংশ ধারাবাহিক-রূপে এইখানেই সমাপ্ত হইতেছে। এই পূর্ব্বাংশ লিখিতে কেন এত প্রয়াস পাইয়াছি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। পুনরায় বলা নিষ্প্রয়োজন।

তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যদি পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, যে ঐ পূর্ব্বাংশের সহিত "কল্যাণের" নিজ

জীবন, যাহা এখন আঁকিতে চেষ্টা করিব তাহা, খুবই জড়িত এবং আমার ভাষায় যদি আরও জোর থাকিত, কলমের অগ্রে আর মনের আগুনের পিছনে যদি মধু থাকিত, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা যে ভাল ছবি প্রকাশিত হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মধ্যমাংশ।

১

—:*:—
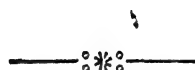
কল্যাণকুমারের জন্ম, শৈশব, বাল্য-জীবন, পিতৃ-বিয়োগ, সাংসারিক অবস্থা, এদেশে ও বিলাতে শিক্ষা এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ঢুকিয়া এদেশে ফেরত আসিয়া কার্য্যে যোগদান, বিধবা মাতার প্রতি ভক্তি, বিবাহ, এবং পরে যুদ্ধে গমন এ সমস্তই এই অংশে বিবৃত হইয়াছে।

ঊনবিংশ উচ্ছ্বাস।

১। "লীলা" যাওয়ার প্রায় দেড় বৎসর পরে আমাদের ভাগলপুরের বাটীতে, খ্রীঃ ১৮৮২র ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় "কল্যাণের" জন্ম হয়। বিনোদিনার শরীর তখন নিতান্তই খারাপ। সে বৎসর অনেকবার— ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া সে রক্তশূন্য হইয়া পড়ে; ইহার উপর "লীলার" শোকে—তার মনেও জোর ছিল না। "কল্যাণ" আট মাসে ভূমিষ্ঠ হয় তার মার রুগ্ন অবস্থায়।

তখন পূজার ছুটী। বিনোদিনার পিতা ও মামা দুইজনেই বায়ু পরিবর্ত্তনে—বিদেশে। বাটীতে আমি একা, ছেলে মেয়েদের লইয়া। ওঁরা বিদেশে যাইবার সময়—বিনোদের মধ্যে মধ্যে খুবই জ্বর হইত। উহার সন্তান যে এত শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হইবে তাহা কাহারও চিন্তার মধ্যেই আসে নাই।

আমার ছেলেরা তখন স্কুলের ছাত্র। বড়টী ১৫য় পড়িয়াছে, মেজোটী ১৩য় পড়িয়াছে মাত্র। উহারাই বিনোদের জন্য ছুটাছুটি করিয়া আমাদের অতি পুরাতন বন্ধুদ্বয় ডাক্তার ৺ নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও ডাক্তার ৺ উমেশচন্দ্র রায়কে

আনিতে যায়। সৌভাগ্যক্রমে এক ব্রাহ্মিকা বন্ধুর সাহায্যে একটী বিচক্ষণ ধাইও সময়মত যোগাড় হইয়া যায়। ডাক্তারেরা আসিবার পূর্ব্বেই, "কল্যাণ" ভূমিষ্ঠ হয়। তার জন্মের পর, দুইজন ডাক্তারই বাটীতে উপস্থিত।

২। "কল্যাণ" যেন মৃত হইয়াই জন্মিয়াছিল। ছেলে কাঁদে না, একেবারেই রক্তশূন্য পাংশুবর্ণ। নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছিল, অতি ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডও নড়িতেছিল। এই ভরসা। তাই দেখিয়া ডাক্তারেরা আশ্বাস দিয়া গেলেন :—"যে ছেলে হয়ত—বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু উহাকে খুব সাবধানে রাখিতে হইবে। ওর মার দুধ, জ্বরে জ্বরে বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে; ছেলে মায়ের দুধ আদপে খাইবে না।"

সে রাত্রে বিনোদের খুব জ্বর। ছেলের মুখে, মধু গরম জলে মাড়িয়া নেকড়া করিয়া চোষাইতে সে খুব ঘুমাইয়া পড়িল। বিনোদও ঘুমে বিভোর।

৩। আমার ঘোর উদ্বিগ্নের দিন, অতি উচাটনের সন্ধ্যা,—ভগবানের কৃপায় শান্ত স্নিগ্ধ রজনীতে পরিণত হইল। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা কে কখন খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, স্মরণ নাই। এইটাই স্মরণ আছে যে আমি গভীর রাত্রে, সেই নিস্তব্ধ ও সর্ব্ব-সুপ্ত বাটীতে, বিনোদেরই একপাশে যখন গড়াইয়া পড়ি—তখন হঠাৎ

মনে এই ভাবের উদয় হয়—যে ভগবানের কৃপায় যে শিশু ঘরে আসিল সে যেন নিজের রাস্তা নিজেই ঠাণ্ডাভাবে বাহির করিয়া লইল এবং আমাদের উদ্বিগ্ন মনকে শান্তি দিল। সদ্যো জাত শিশুতে একটা শুভ লক্ষণ যেন আমি সেই গভীর রাত্রে প্রতীয়মান দেখিলাম। ইহাতে আমি নিজের মনে শান্তি পাইলাম এবং জোরও পাইলাম; তারপর আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৪। পরদিন প্রাতে বিনোদের ছেলে হইবার খবর অনেক আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠান হইল। কল্যাণের পিতা ছুটীতে তাঁর পিতার কাছে কাশীধামে ছিলেন। তার পরদিন তিনি সেখান হইতে ফেরত আসিলেন। কৈলাসবাবু নাতি হওয়ার খবরে খুব খুসী হইয়াছেন শুনিলাম। কল্যাণের মাতামহের ফিরিতে এক সপ্তাহকাল দেরী হইল। তিনি জলপথে "কলম্বো" বেড়াইতে গিয়াছিলেন।

৫। বিনোদ অতি ধীরে ধীরে সুস্থতালাভ করিল। ডাক্তারদের হুকুমে তার নিজের দুধ আর ছেলের পেটে পড়িল না। ছেলের জন্য দুধওয়ালী ধাত্রী রাখিতে হইল। সে দুধও অতি অল্প পরিমাণে কল্যাণ সহ্য করিতে পারিত। ক্রমশঃ কল্যাণ চিঁ চিঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার গলার স্বর-বদ্ধতা

দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। আমার ভয় ছিল পাছে ছেলে বোবা হয়; কারণ. ইহার পূর্ব্বে এত দুর্ব্বল ও না-কেঁদো শিশু কখন দেখি নাই।

৬। ক্রমশঃ বিনোদ ও খোকা দুজনেই সুস্থ হইয়া উঠিলে আমার চক্ষে ভগবানের মঙ্গলময়, কল্যাণময় লালাটাই যেন অধিকতর প্রতীয়মান হইল। তাই আমি খোকার নাম রাখিলাম "কল্যাণ কুমার"। ধাত্রীর দুধের গুণে কল্যাণ গোলগাল হইয়া উঠিল। দেখিতে ছোটখাট হইলেও তার ভিতরে একটু জোর আছে প্রকাশ পাইল। শান্তমুখে খোকাটীর একটু হাসি দেখা দিল, সে দেখিতে সুন্দর হইল, আর সকলেরই আদরের পাত্র হইয়া উঠিল।

৭। ক্ষেত্রমোহন খ্রীঃ ১৮৮৩র জানুয়ারী মাসে চুঁচুড়ায় গঙ্গা-ধারের বাটী ছাড়িয়া ব্যাণ্ডেলে বাটী ভাড়া করিলেন; এবং বিনোদিনীকে লইয়া যাইতে ভাগলপুরে আসিলেন। বিনোদিনা একাই স্বামীর সঙ্গে গেল। আমি সেবার কল্যাণকে ছাড়ি নাই। দুর্ব্বল ছেলে, তার পক্ষে ধাত্রী পরিবর্ত্তন নিষিদ্ধ। তার পরেই কল্যাণের জ্বর ও ব্রংকাইটিস্। আমিত ভাবনায় অস্থির। ভগবানের কৃপায় সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিল এবং বেশ বড় হইতে লাগিল।

সেই বৎসর বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রমোহন ও বিনোদ ভাগলপুরে আসিয়া এক সপ্তাহ থাকিয়া ছেলের সঙ্গে চেনা-শুনা ও আলাপ করিয়া তাকে লইয়া ব্যাণ্ডেলে চলিয়া গেলেন। দুধওয়ালী ধাইও সঙ্গে গেল। কল্যাণকে ছাড়িয়া দিতে আমার অত্যন্তই মন-কেমন করিয়াছিল। পরের ছেলেকে মানুষ করার ঐ বিড়ম্বনা।

৮। ক্ষেত্রমোহনের পিতা ইচ্ছা জানাইলেন যে পৌত্রের 'অন্নপ্রাশন" বা "নামকরণ"টা যেন দশজনকে জানাইয়া করান হয়। সেই মতই ব্যাণ্ডেলের বাটীতে উদ্যোগ হইতে লাগিল।

ক্ষেত্রবাবুর প্রথম পক্ষের একমাত্র কন্যা "সুমতা" তখন পাঁচ বৎসরের। পিতামহ কৈলাসবাবুই তাকে মানুষ করেন। "সুমতা" দেড় বৎসর বয়সে মাতৃহারা হয়। কৈলাসবাবু সুমতাকে লইয়া—ব্যাণ্ডেলের বাসায়—ঐ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আসেন এবং পৌত্রকে লইয়া খুব আমোদ আহ্লাদ করেন।

সুমতাও তার নূতন-মা ও ভাইকে পাইয়া একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখনও জীবিত এবং স্বামী পুত্রাদি সহ সুখে কলিকাতায় বসবাস করিতেছেন; ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৯। অন্নপ্রাশন ২৫শে বৈশাখ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সেই উপলক্ষে ক্ষেত্রমোহনের হিন্দু ও ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত অনেক বন্ধু-বান্ধবগণ সপরিবারে বাসায় উপস্থিত হইয়া সেই শুভকার্য্যে যোগদান করেন। উপাসনা, আমোদ আহ্লাদ, গান বাজনা, ভোজ—যথেষ্টই হইয়াছিল। আমি কল্যাণের মাতামহের নিকট তার সমস্ত বিবরণই শুনি। আমাদের বাটী হইতে উনিই সে যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কৈলাসবাবু ওঁর বহু পুরাতন বন্ধু; আর ওঁদের ভিতর বিবাহসূত্রে একটা দূর কুটুম্বিতাও ছিল। এবার নূতনসূত্রে দুই বেহাইয়ে পুনর্মিলন হইল।

১০। সেইদিন—বহুজনসমাগমে, কল্যাণ নাকি একবার খুবই বাহিরের বৈঠকখানায় কাঁদিয়া উঠে। ভগিনী সুমতী বেশ গিন্নিপনা দেখাইয়া ভাইকে শান্ত করে, আর হাঁসাইয়া ফেলে। তাতে কৈলাসবাবু সুমতীকে বলেন "তুমি যে এত পাকা গিন্নি হ'য়ে উঠেছ তাহা আমি জানতাম্ না, নূতন-মার কাছ থেকে সব শিখেছ দেখ্‌ছি"। এতে একটা খুব হাসির রোল উঠে।

১১। ভাতের পর সেই দুধওয়ালী ধাই আর রহিল না। নিজের ঘরকন্নার নানা উছিলা করিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিল। কোন এক ডাক্তারের পরামর্শে কল্যাণকে সেই

অবধি গাধার দুধে জল দিয়া খাওয়ান আরম্ভ হয়। তাতে তার বিশেষ উপকার হয়; শরীর বলিষ্ঠ হইয়া উঠে।

শ্রাবণ মাসের শেষে বিনোদ পুনরায় অসুস্থ হইয়া ভাগলপুরে পিত্রালয়ে আসে। কল্যাণ তার দিদিমাকে যে ভুলে যায় নাই, তাহা তার হাবভাবে, শিশু আচরণে, প্রকাশ করিয়া ফেলিত। তখন তার বয়স ৯ মাস মাত্র। দেখিতে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। শিশুর সদাই হাসি মুখ, আমাদের সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত।

বিংশ উচ্ছ্বাস।

১। খ্রীঃ ১৮৮৩র নভেম্বরে বিনোদের এক কন্যা হয়। যদিও কল্যাণ তখন মাত্র এক বৎসর এক মাসের ছেলে, সে ছোট ভগিনীটীর উপর কিছুমাত্র হিংসা করিত না, খুবই ভালবাসা দেখাইত।

ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে আমার দাদা ও ভাজ আমাদের ভাগলপুরের বাটীতে দিন কয়েক আসিয়া থাকেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যে "কল্যাণ" তাঁদের সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া লইল। আমি ভাবিয়াছিলাম আমার দাদার খুব লম্বা দাড়ী দেখিয়া কল্যাণ হয়ত ভয়ে তাঁর কাছে যাইবে না। ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, সে তাঁর কাছে-কাছেই থাকিতে চেষ্টা করিত। আমার দাদার এক দস্তুর ছিল যে, যে কোন ছেলে মেয়েদের তিনি পছন্দ করিতেন তাদেরই তিনি তাঁর নিজের এক ডাক্ নাম দিয়া ডাকিতেন। কল্যাণের ডাক নাম তিনি দিলেন, "কলিয়ান-জংসান"। ঐ নামের একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেশন বোম্বায়ের পথে পাওয়া যায়।

২। আমার ভাজ হেমাঙ্গিনী "কল্যাণ"কে ডাকিতেন

"আমার সোণামুখী কল্যাণ" বলিয়া, আর "কল্যাণ" তাঁহাকে "সোণামুখী দিদিমণি" বলিয়া ডাকিত।

কল্যাণের সুমিস্ট কথায় ও প্রকৃতিতে আমার দাদা ও ভাজ খুবই প্রীত হইয়া যান। এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তার জন্য সুন্দর একটী ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছোট ঘোড়া এবং ঘোড়ার জিন ভাগলপুরে পাঠাইয়া দেন।

সেই ঘোড়াতে কল্যাণ, তখন মাত্র এক বৎসর চার মাসের ছেলে, নির্ভয়ে চড়িত এবং চড়িয়া আমোদ পাইত। সহিসটা অনেক দূরে লইয়া গেলে আমি রাগ করিতাম, সহিসটাকে বকিলে সে উত্তর দিত যে "বাচ্চা যানে মাংতা থা"।

৩। কল্যাণের আর একটী গুণ অতি অল্প বয়সেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। হিন্দু পরিবারের ছেলে হইলে অনেক প্রকার আত্মীয়দের সঙ্গে মিশিতে হয় এবং দূর সম্পর্কের হইলেও তাহাদিগকে নিকটে টানিয়া লইতে হয়, সদ্ব্যবহারে ও সুমিষ্ট আচরণে। কল্যাণ শিশুকাল হইতেই দূর আত্মীয়দের আপন করিয়া লইতে শিখিয়াছিল, নিকট আত্মীয়দের ত কথাই নাই। বয়সে যাঁরা গুরুজন তাঁহাদিগকে সম্মান-সূচক ভাষায় কল্যাণ ডাকিবে, কথাবার্ত্তা বলিবে।

বিনোদের সেজো কাকার মাতৃহীনা কন্যা, "প্রমোদিনী" আমার

কাছেই থাকিত। প্রমোদিনী কল্যাণ অপেক্ষা অতি অল্পই বড়। কিন্তু প্রমোদিনীকে কল্যাণ বরাবরই "খুকী মাসীমা" বলিয়া ডাকিত। বিনোদের ছোট কাকার ছেলে "ফুলু," সে কল্যাণের এক বৎসরের বড়; তাকেও কল্যাণ বরাবর "ফুলু মামা" বলিত। নিজের আচরণে কাহাকেও মনঃকষ্ট বা দুঃখ দিবার ধার দিয়াও সে যাইত না। ঝি চাকরদের সঙ্গেও সহৃদয়তা অমায়িকতা কল্যাণ দেখাইত।

৪। একদিন কল্যাণ আমার দাদাকে বলিল; "বড়দাদু, তোমায় আমি, দাড়িদাদু, বলে ডাকব। আমার আরও অনেক বড়দাদু আছেন কি না—কিন্তু তোমার মত দাড়ি কারুর নাই"। তখন কল্যাণের বয়স ৪৷৷ বৎসরের অধিক হইবে না। উহার ঐ কথা শুনিয়া খুব একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। আর তারপর হইতে অন্যান্য সকল নাতি নাতিনীরা—আমার দাদাকে "দাড়িদাদু" বলিয়াই সম্বোধন করিত।

৫। খ্রীঃ ১৮৮৪তে ক্ষেত্রমোহন ব্যাণ্ডেল হইতে ঝেনিদাতে বদলি হয়েন। তখন কল্যাণের তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর ফেলিয়া তার পিতামাতা নূতন কর্ম্মস্থানে যান। সেই বৎসর গ্রীষ্মের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় শিশু "কল্যাণ" অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। কেবল কাঁচা আম পোড়া, বাতাবি লেবু,

আনারস ইত্যাদি ফল খাওয়াইয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়।

৬। সেই রুগ্ন অবস্থার সময়ে আমার ছোট-জা কল্যাণকে মধ্যে মধ্যে কোলে করিয়া আমাদের বাগানেই বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন্ ফলের কি গাছ, তাহাকে দেখাইয়া দিতেন। ইহাতে আমার জা'র ছেলে "ফুলুর" মনে কিঞ্চিৎ হিংসা হইত, "কল্যাণকে" তার মার কোলে দেখিয়া। তারপর পূজার বন্ধে যখন বিনোদিনী ভাগলপুরে আসে তখন কল্যাণ তাহাকে দেখিয়াই বলে, "মা তুমি ফুলু মামাকে কোলে নিয়ে বাগানে বেড়াবে চল"। তাতে বিনোদিনী বলিল "তোমার ফুলুমামা এখন বড় হয়েছে, সে নিজে খুব চলতে জানে, সে আপনি হেঁটে হেঁটে বাগানে যাবে"। তাতে কল্যাণ বলে "আমি যে, মা, ফুলুমামার মা'র কোলে চড়ে বাগানে যেতুম, আর ফুলুমামা খুব কাঁদত। আমি কিন্তু মা, কাঁদ্‌ব না। তাই ফুলুমামা দেখুক, তুমি ওঁকে কোলে করে নাও—দেখ আমি কাঁদব না"।

"ফুলু" তখন তিন বৎসরের ছেলে। সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, আর কোনমতে বিনোদের কোলে উঠিল না। কল্যাণ যে রকমে ফুলুর ঋণ পরিশোধের জন্য জেদ্

করে তার মাকে ধরেছিল—এইটাই সকলকার চক্ষে বড়ই আশ্চর্য্যের মত লাগিয়াছিল।

৭। কল্যাণ ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। তার ছোট ভগিনী পরিমলের উপর মায়া পড়িতে লাগিল। পাড়ার নিকট-বর্ত্তী বাড়ীর ছোট বড় সকল ছেলেরাই কল্যাণের সঙ্গে খেলিতে আসিত। যদিও আমাদের বাটীতে কল্যাণের সঙ্গী ছিল, "ফুলু" আর "খুকী"—এরা দুজনে কল্যাণের চেয়ে বয়সে বড় হইলেও সকল খেলাতেই কল্যাণই যেন মুরুব্বিগিরি করিত। অন্যান্য ছেলেরা তার হুকুমেই আনন্দে খেলা ধূলা করিত। কল্যাণের বয়স তখন তিন বৎসর হইলেও সে খুবই প্রভুত্ব দেখাইত এবং খেলো দিগকে নিজমতে চালাইত এবং তাহারাও উহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিত।

৮। খেলিতে খেলিতে যদি কাহারও সঙ্গে মতের মিল না হইত তাহা হইলে কোন কথায় রাগ প্রকাশ না করিয়া কল্যাণ সটান ঘরে ফিরিয়া আসিত এবং ছবির বই দেখিতে বসিত কিম্বা আমার সেলাইয়ের জিনিষ লইয়া ঘাঁটিতে লাগিত। তার সঙ্গীরা অবাক্ হইয়া আমার কাছে আসিয়া দরখাস্ত করিত এবং বলিত, "বড় মা, কল্যাণকে খেল্‌তে আসতে বল—ও কেন খেলবে না?" আমি ওকে খেলতে যেতে বললে এই উত্তর

দিত :—"খেলে খেলে আমার পেট ভরে গেছে, এখন তুমি কামরাঙ্গার গল্প বল"—অন্যান্য সব ছেলেরাই সে গল্প শুনিতে বসিয়া যাইত।

৮। যদি কখন খেলিতে খেলিতে কল্যাণ আড়ি করিয়া চলিয়া আসিত, আর তার সঙ্গীরা আমার কাছে আসিয়া এই বলিয়া নালিস করিত :—"দেখ বড় মা, ও খেলতে খেলতে হেরে গিয়ে এ রকম করে পালিয়ে এসেছে"। তার উত্তরে কল্যাণ খালি "হুঁ" বলিত। সঙ্গীরা যদি বলিত "তোমারই ত সব দোষ।"—উত্তর হইত "হুঁ"।

৯। ঐ সমস্ত "হুঁর" ভিতরে লক্ষিত হইত—আত্মম্ভরিতা, তেজ, ও গর্ব্বিতভাব। কল্যাণের স্বভাবটী, খুব ছোট বেলা হইতেই ছিল তেজস্বী ধরণের; আর মিথ্যার উপর খুবই অসন্তোষের ভাব। সে নিজে কখনও মিথ্যা কথা বলিত না। আমি কখনও তার মিথ্যা কথা ধরিতে পারি নাই। এবং কল্যাণ যে কখনও কাহারও কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছে তাহা উহার বন্ধু বা সহপাঠিদের নিকট শুনি নাই। বরং সে সত্যবাদী, এই খ্যাতিটা ছেলেবেলা হইতেই কল্যাণের সহপাঠিদের ভিতর ছিল।

১০। "কল্যাণ" ছেলেবেলা হইতেই কখনও কাহাকেও

অমান্য করিয়া কথা বলিত না। ঝি চাকরদেরও নহে। তার বেহারার—কি দাইয়ের—কাজ পছন্দ না হলে বলিত."তুমি জাননা, এত ভাল হয়নি—বড়মা করে দিবেন এখন"। সে কখনও কাহারও নামে নালিস করিত না। তার কাহারও উপর রাগ হইলেই সে গাল ফুলাইত—আর তার মুখ লাল হইয়া যাইত।

১১। আমার স্বামীর বন্ধু-বান্ধবেরা—মক্কেলরা অবধি সেই তেজস্বী বালকের গম্ভীর, সরল ভাব ও মুচ্‌কি হাসি দেখিতে ভালবাসিতেন। কোন কোন হিন্দুস্থানী মক্কেল কল্যাণকে ডাকিয়া বলিতেন, "তুঁহি ব্রিন্দাবনকো কিষন্‌জি হুই;" তাহাতেও সে একটু মুচ্‌কি হাসিত। যিনি তাকে আদর করিয়া ডাকিতেন তাঁরই কাছে সে পরিচিতের মত যাইত; কখনও ভয় পাইত না বা পিছু হঠিত না।

১২। আমার স্বামীর মক্কেলরা খেল্‌না বা টাকা কল্যাণের হাতে দিলে সে একটু নাড়াচাড়া করিয়া—"বেশ সুন্দর" বলিয়া—তাহা রাখিয়া দিয়া, চলিয়া আসিত। আগ্রহের সহিত নিজ সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া অন্যান্য ছেলেদের মত বুকে করিয়া আনিত না।

একবিংশ উচ্ছ্বাস।

১। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেত্রমোহন নিজ্ কলিকাতায়— বদ্‌লি হয়েন এবং সিমলা অঞ্চলে তাঁর পিতার বাড়ীর নিকটেই বাড়ী ভাড়া করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। সেই বৎসর অগষ্ট মাসে কল্যাণের মেঝো ভাই "কমল" আমার নিকটে ভাগলপুরেই জন্মগ্রহণ করে। তারপর বিনোদিনা কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেও কল্যাণ আমার কাছে থাকিয়া যায়।

২। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে আমার কনিষ্ঠ কন্যা চারুহাসিনীর বিবাহ হয়। তারপর হইতেই আমার স্বামীর ক্রমান্বয়ে অনেকবার জ্বর হওয়াতে ডাক্তারদের পরামর্শে তাহাকে লইয়া আমাদের ৬ মাসকাল দার্জ্জিলিঙ্গে থাকিতে হয়। বিনোদিনা তার ছেলে মেয়েকে লইয়া আমাদের সঙ্গে তথায় কয়েকমাস থাকার পরই কল্যাণের ও তার ভগিনীর পীড়া হওয়াতে বিনোদিনাকে কলিকাতা চলিয়া আসিতে হয়।

৩। তারপর পূজার ছুটিতে আমার দাদা ও ভাজ তাঁহাদের সপরিবারে আমাদের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙ্গে এক বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। কল্যাণ তখন কলিকাতায় খুবই ভুগিতেছিল। আমাদের

ইচ্ছামত আমার ভাজ তাকে সঙ্গে করিয়া দার্জ্জিলিংএ লইয়া আসেন।

দার্জ্জিলিং যাত্রার কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন আমার ভাজ বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া ছেলেকে প্রস্তুত রাখিবার জন্য বলিয়া আসেন; আর কল্যাণকে ডাকিয়া বলেন, "কি হে বুদ্ধিমান তোমার কি মত, তোমার বড়মার কাছে আমরা যাচ্ছি। তুমি কি যাবে আমাদের সঙ্গে?"

তাতে কল্যাণ এই উত্তর দেয়:—"যেতে পারি কিন্তু গাড়ীতে যদি তোমাদের কষ্ট দিই, আমার শরীর ভাল নেই, আমার গরম লাগলে কে হাওয়া করবে, কে আমাকে বার্লি করে দেবে? কে আমাকে কাপড় পরিয়ে দেবে? কে আমার বিছানা করে দেবে?"

তাতে আমার ভাজ তাকে খুব আশ্বাস দিয়া বলেছিলেন, "তোমার এত ভাবনার দরকার নেই, আমার আয়া সঙ্গে যাচ্ছে সে তোমার সব কাজ করে দেবে।" তখন ছেলের খুবই স্ফূর্ত্তি আর খুব আগ্রহের সহিত দার্জ্জিলিঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল; এবং তার মাকে তার কাপড় চোপড় বাক্সবন্দী করিবার জন্য উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কল্যাণ তখন নিতান্তই রুগ্ন, রক্তশূন্য ও দুর্ব্বল।

৪। রেল গাড়ীতে তার "দাড়িদাদুর" সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল :—"আচ্ছা, আপনি কি করে বড়মাদের বাড়ীটা চিন্‌বেন, আপনি ত সে বাড়ী দেখেন নি ?" তাতে আমার দাদা উত্তর দেন :— "তুমিত চেন, তুমি আমাদের চিনিয়ে নিয়ে যাবে, তাইত তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

তাতে কল্যাণ একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিল :—"আমার মনে আছে, আর ষ্টেশনের কুলিরাও চেনে।" তার পরদিন দার্জ্জিলিঙ্গে ট্রেণ ১টার সময়ে পৌঁছিল। আমার দাদা ও ভাজ তাঁদের তিন ছেলে দুই মেয়ে, ইংরাজী নার্স, আয়া, চাকর-বাকর লইয়া নামিলেন।

৫। কল্যাণ তখন গাড়ীতেই বসিয়াছিল ; আমাকে দেখিতে পাইয়াই দুই হাতে চোক্ চাপা দিয়া কান্না আরম্ভ করিল। আর যেই আমি কাছে গিয়া তাকে কোলে করিলাম, তখন কান্নার বাঁধ যেন আরও ভাঙ্গিয়া গেল, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেখানে যতগুলি পরিচিত লোক ছিলেন সকলেই কল্যাণকে লজ্জা দিয়া বলিলেন, "ছিছি ! তুমি এত বীরপুরুষ হয়ে কেঁদে ফেল্লে ! দেখ তোমার কান্না দেখে সকলে হাস্‌চে।"

তখন সে আমার কোলে মুখ লুকায়ে, চুপ করে আমার সঙ্গে ডাণ্ডিতে উঠিল এবং বাটীর পথে আসিতে আসিতে বলিল :—

"আমি তোমায় কত ডাক্‌তুম, তুমি আস্‌ছিলে না কেন? মা কি একলা পারেন? ঝি ত খোকাকে নিয়েই থাকে। আমি বড্ড একলা থাকি।" এইরূপে সে তার মনের দুঃখের কথা আমায় অনেক জানাইল।

৬। দার্জ্জিলিঙ্গে আমরা "মারজরিভিলা" ভাড়া লইয়াছিলাম। সে বাড়ী কল্যাণ পূর্ব্বে দেখিয়া যায় নাই। বাড়ীতে নামিয়াই বলিল ঃ—"এ কোন্ দার্জ্জিলিঙ্গ, বড়মা," ? অসুখের দার্জ্জিলিঙ্গ কোথা গেল?" তখনও কল্যাণ অধিক চলা ফেরা করিতে পারিত না, পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিত।

আমার দাদার মেঝোছেলে কালীকৃষ্ণ কল্যাণকে খুব স্নেহ করিত এবং তার পায়ের দুর্ব্বলতা দেখে তাকে প্রায়ই কোলে লইয়া বেড়াইত। আমার দাদার ছোট ছেলে রতনকৃষ্ণ (এর বাটীতে ডাক্‌নাম "টিনী" বা "টাইনি-মাইট") কল্যাণ অপেক্ষা ৮ মাসের ছোট। সে অনেক সময়ে কল্যাণকে কালীর কোলে দেখিয়া, বিদ্রূপ করিয়া হাসিত। হাসি দেখিয়াই কল্যাণ লজ্জায় নামিয়া পড়িত।

৭। আমার দাদার সেজছেলে সরলকৃষ্ণের সহিত কল্যাণ খুব বন্ধুতা পাতাইয়া লইয়াছিল। সরলকৃষ্ণের ডাক্‌নাম ছিল "কিটি"। রতনের বিদ্রূপ করার সম্বন্ধে কল্যাণ সরলকৃষ্ণের

কাছে এইভাবে নালিস্ করিত ঃ—"দেখ ভাই কিটি মামা, আমার অসুখের জন্যে আমার পায়ে লাগে কি না, তাই কালী মামা আমাকে কোলে করেন। আমি তাঁকে কোলে নিতে বলি না, তবুও কোলে করেন। আর অমনি টিনীমামা হেসে দেন।" সেই নালিস্ শুনে রতন বেশ স্নেহের স্বরে উত্তর দিত "আচ্ছা ভাই আর আমি হাসব না, তোমার পায়ের ব্যথা সেরে গেলে তুমি ফের হাঁটা ফেরা করিও"।

৮। দার্জ্জিলিঙ্গে দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে, এক বাড়ীতে, ৪টী ছেলে ২টী মেয়ে একসঙ্গে খেলা ধূলা করিত কিন্তু একদিনও ঝগড়া বিবাদ মারামারি হয় নাই। আমার ভাইপো, ভাইঝি-দের সাহেবি কেতা, তাদের ইংরাজি কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণে কল্যাণ খুবই লক্ষ্য রাখিত। তাদের ভিতর কোনও খেলনার জিনিস বা ছবির বইটই লইয়া কাড়াকাড়ি, ছুটাছুটি হইলে, কল্যাণ তাহাদের বুঝাইয়া বলিত ঃ—"আমি ভাই, আমার ছোট বোন 'বিবির সঙ্গে অমনতর করি না।"

৯। আমার দাদা শুয়েশুয়ে নভেল পড়িতেন, আর ছেলে মেয়ে-দের কথাবার্ত্তায় লক্ষ্য রাখিতেন; আমাকে বলিতেন যে "কল্যাণ বাহবা পাবার উপযুক্ত ছেলে, ওর খুবই মিস্ট স্বভাব"। তিনি কল্যাণকে কোলে ও কাঁধে করিয়া কত আদর ও রঙ্গ করিতেন।

১০। কল্যাণ পুনরায় সুস্থ হইয়া আসিলে আমরা নভেম্বরের মাঝামাঝি নামিয়া আসি। কলিকাতায় কল্যাণ তার বাপ মা ও ভাই ভগিনীদের পাইয়া খুবই আনন্দিত হইল এবং সকলকেই সে দার্জ্জিলিঙ্গের গল্প, ঘোড়ায় চড়িয়া জ্বালা-পাহাড়ে বেড়াইবার গল্পটল্প না বলিয়া তৃপ্তি পাইত না।

১১। বড়দিনের পর পুনরায় কল্যাণ আমার সঙ্গে ভাগলপুরে আসে। সেখানে আসিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; কলিকাতা অপেক্ষা সে ভাগলপুরে থাকিতে অধিক পছন্দ করিত। ভাগলপুরে সেই গঙ্গা, সেই মস্ত বাগান তার বড়ই প্রীতিকর লাগিত। আর বাটীতে সে তার নিজের খেলিবার ঘরে, নিজের খেলনা লইয়া খেলা করিতে খুবই আমোদ পাইত।

কল্যাণ ফের ভাগলপুরে আসিয়াছে শুনিয়া তার পুরাতন খেলীদের ভিতর আনন্দ আর ধরিত না; যেন কত দেব-দুর্লভ লোক আসিয়াছে।

১২। সরস্বতী পূজার বন্ধে, ক্ষেত্রমোহন আসিলেন, ছেলেকে তাঁর সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য। ছেলের মন কলিকাতার প্রতি আকর্ষণ করিবার ফন্দিতে তার কাছে নানা রকম কলিকাতার গল্প বলিতে লাগিলেন :—

"কলিকাতায় কেমন চিড়িয়াখানা, ভাগলপুরে কোথা ?"

ছেলে মুচ্‌কী হাসিয়া, বাপের হাত ধরিয়া ভাগলপুরের গাছপালা, নীল আকাশ, কাক চীল পাখী উড়িতেছে, দেখাইয়া দিল।

"কলিকাতায় কেমন ট্রাম আছে, জলের কল আছে, ভাগলপুরে তা কোথা?"

ছেলে উত্তর দিল:—"এমন গঙ্গা ত কলকেতায় নেই, নৌকাও নেই, জাহাজও নেই। জাহাজ এলেই আমরা চড়ে বেড়াই, জাহাজও ট্রামের মত শব্দ করে। তারপর জলের কল, "ঐ দেখ"—বলিয়া বাপের হাত ধরিয়া, আমাদের জলের ঘরে, যেখানে একটা চীনেমাটীর ফিল্‌টার থাকিত, লইয়া যাওয়া হইল। ফিল্‌টারের মুখ খুলিয়া দিয়া বাপকে বলা হইল "এও এক রকমের কল"।

তাহাতে ক্ষেত্রমোহন আমাকে বলিলেন যে "ছেলে বড় তুখোড় হচ্ছে।" আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম যে "ও মোটে ত চার বৎসর পূর্ণ করেছে, আর একটু বড় হলেই লইয়া যাইও"। সে বৎসর কল্যাণ আমার কাছেই রহিয়া গেল।

১৩। ফের পূজার ছুটী আসিল। আমরা সেবারেও কল্যাণকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গ গিয়াছিলাম। ষ্টেশনের নিকট, কার্ট রোডের উপর তখন এক হোটেল ছিল, আমরা সেইখানে থাকি। ক্ষেত্রমোহন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কিছু দেরি করিয়া আসিবেন,

লিখিয়াছিলেন। তাই আর ঐ হোটেলে ঘর পাওয়া গেল না। তাঁদের জন্য স্যানিটেরিয়ামে থাকিবার বন্দোবস্ত হইল।

১৪। কল্যাণ তার দাদুর সঙ্গে রোজ ষ্টেশনে বেড়াইতে যাইত। রেল গাড়ীর ঘড়ঘড়ানিতে সে খুব আমোদ পাইত ; আর বাটীতে অনেকগুলা খালি দেশালাইয়ের বাক্সে সুতা দিয়া বাঁধিয়া, এক গোল টেবিলের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া "রেলগাড়ী" খেলা করিত। যত রকমের আওয়াজ ইঞ্জিনে করে, তা সে করিত, তার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনগুলির নামও আবৃত্তি করিত।

১৫। তার বাবা শীঘ্রই আসিবেন সে জানিত—তাই বাপকে দেখিতে পাইবার জন্য মেল ট্রেণ আসিবার সময় রোজই তার উপর লক্ষ্য রাখিত।

একদিন হঠাৎ আসিয়া কল্যাণ আমাকে বলিল "বড়মা, এই ডাক গাড়ীতে বাবু আছেন আমি দেখতে পেয়েছি।" এই বলিয়াই সে সিঁড়ি দিয়া দুড়দুড় করিয়া নামিতে লাগিল। আমি পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ধরিয়া বলিলাম "এত ভীড়ে তুমি একা কোথা যাবে"।

উত্তর:—"আমি খুব পারব, বাবু ত স্যানিটেরিয়ামের পথ চেনেন না—আমি দেখিয়ে দোবো" এই বলিয়াই—

ছুট। ষ্টেশন যদিও খুব নিকটে, তবু আমি তার পিছু পিছু একটা বেহারাকে পাঠাইয়া দিই।

কল্যাণ বাপকে সঙ্গে লইয়া স্যানিটেরিয়ামে গিয়া হাজির। সেখানে তার দাদুও গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে কল্যাণের কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দ পাইয়াছিলাম।

১৬। অক্টোবরে দার্জ্জিলিং হইতে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া কল্যাণের হাতে খড়ি হয়। তখন তার পূর্ণ ৫ বৎসর বয়স। তিন মাসের মধ্যেই সে বর্ণপরিচয় পড়িতে ও শ্লেটে লিখিতে আরম্ভ করে।

কল্যাণের দ্বিতীয় ভগিনী তখন মাত্র ৯ মাসের। তার নাম হইয়াছিল সতী। ইহাকে আমার কাছে রাখিয়া বিনোদ ও ক্ষেত্রমোহন সরস্বতী পূজার বন্ধে আসিয়া কল্যাণকে লইয়া গেলেন—কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন বলিয়া। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র তখন বিলাতে, কনিষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় পড়ে। কল্যাণ ভাগলপুর হইতে যাওয়াতে আমার বিশেষ মনঃকষ্ট হইয়াছিল। ভাগলপুরের বাটী যেন খালি হইয়া গেল।

১৭। কল্যাণের লেখাপড়ার সরঞ্জাম কত। মালিকে দিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে বড় পাথরের টালি আনাইয়া, তার উপরে

বসিয়া তাহাতেই খড়ি-পাথর দিয়া ক, খ, ইত্যাদি লেখা হইত। আর ঘরের দুই সঙ্গীকে, প্রমোদিনী (খুকী) আর ফুলুকে বলা হইত "তোমাদের ছোট শ্লেটে বেশী লেখা ধরে না, আমি তাই বড় শ্লেট আনিয়েছি "।

সে পাথরটা এত ভারি যে সে নিজে তাহা নড়াইতে পারিত না; কিন্তু তাহাকে রোজ কয়লা দিয়া মাজা হইত, মাজার পর ধোয়া পোঁছা হইত। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে "ক" "খ" লিখিয়া সে সঙ্গীদের নিকট জাঁক ফলাইত "দেখ কেমন বড় বড় লিখেছি, দাদু বলেছেন বড় বড় করে লিখলেই, লেখা ভাল হয়"।

১৮। কলিকাতায় যাইবার দিন, বাপকে বলা হইল—"বাবু আমার বড় শ্লেটখান্ যেন নিয়ে যেতে ভুলে যেওনা" তার-পর বাটীর অন্যান্য সকলের কাছে গিয়া বলা হইল "আমি কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি হতে যাচ্ছি, ছুটীর সময় আবার আসব। সেখানে মামাও পড়চেন, আমিও পড়বো"।

কল্যাণের সঙ্গীরা, নিজ বাড়ীর কি অন্য বাড়ীর, সকলেই বয়সে কল্যাণ অপেক্ষা অল্প বিস্তর বড়। তথাপি তাহারা কল্যাণকেই মুরব্বি মানিয়া চলিত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ তার হইত না।

১৯। কল্যাণ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার পর, তার সঙ্গীরা তার সেই বড় শ্লেটখানা ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রাখিত। তার হাতে পোঁতা ফুলগাছে জল দিত। সেই ফুল গাছে ফুল ফুটিলে, তুলিয়া আনিয়া ফেলা-লেফেপায় পূরিয়া, আঠা দিয়া বন্ধ করিয়া, বেহারা-দের হাতে দিয়া যাইত, ডাকে কল্যাণের নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য। আবার বাড়ীতেই সেই ফেলা-লেফেপাগুলি ফুলসুদ্ধ ফেরত দিয়া যাইত, ডাকঘরের পিওনগুলা।

২০। শিশু অবস্থায় সঙ্গীদের নিকট হইতে কল্যাণ যেরূপ অযাচিত ভাবে ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অর্জ্জন করিয়াছে তাহা খুবই বিরল এবং উহা পৃথিবীর মহাপুরুষদের জীবনের লক্ষণ বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। উহাতে আমাদের মনে একটা বিশেষ অহ্লাদ হইত তাহা বলা বাহুল্য।

দ্বাবিংশ উচ্ছ্বাস।

১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কল্যাণ কলিকাতায় তার বাপ মায়ের কাছে যাইলে, তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী আমার কাছে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সতী অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহাকে শীঘ্রই বিনোদের কাছে রাখিয়া আসাই শ্রেয়ঃ বোধ হইল। কল্যাণকে ছাড়িয়া আমি বড়ই মনঃকষ্ট পাই। তাই পুনরায় পরের ছেলেপুলে মানুষ করিয়া নিজের জীবনের ঝঞ্ঝাট আর বাড়াইব না, ঠিক করি। এক ছুটীতে সতীকে বিনোদের কাছে রাখিয়া আসি।

২। বিনোদের মামার বাড়ীর অল্প দূরেই ক্ষেত্রমোহনের বাসা তখন ছিল। বৈকালে বিনোদের ছেলে মেয়েকে লইয়া ঝি সেখানে বেড়াইয়া আসিত। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী রাজ-লক্ষ্মী অনেকটা আমার মতই দেখিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সতী তাঁর কোলে ঝাঁপাইয়া যাইত। এক-দিন নাকি রাজলক্ষ্মী সতীর গালে এক চুমো দেন, আর তৎক্ষণাৎ সতী তাঁর কোল হইতে নামিয়া যায়। কল্যাণ সেটী লক্ষ্য করিয়া বলে ঃ—"ছোট্ট দিদিমণি, তুমি কেন সতীকে কিসি দিলে?

বড়মা ত কখন ও কিসি দেন না। তুমি কিসি দিলে বলেই সত্তী নেমে গেল।”

৩। বাস্তবিক ছোট ছেলেদের মুখে চুমো খাওয়া বা তাদের চটকান আমার কখনও অভ্যাস নয়। তা সত্ত্বেও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে আমার ত খুবই ঘনিষ্ঠ হইত। কিন্তু কল্যাণের শিশু অবস্থায় আমার অভ্যাস সম্বন্ধে অত তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখাটাই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ছোট বড় সকল বিষয়েই কল্যাণের শিশুকাল হইতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত; এবং তাহা স্মরণ রাখিয়া সে বুদ্ধিমানের মত কথা বলিত। অমন বয়সে ছেলেরা মোটেই সামান্য বিষয়েও নজর রাখিতে পারে না।

৪। কলিকাতায়, কল্যাণকে এক বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি করান হইয়াছিল। প্রাতে ক্ষেত্রমোহন তাহাকে পড়াইতেন। আর সন্ধ্যায় সে তার মার কাছে পড়িত। গ্রীষ্মের ছুটী হইলেই সে ভাগলপুরে আমার কাছে চলিয়া আসিবে, এই মনে স্থির করিয়া কল্যাণ নিজেকে এমনভাবে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল যে ভাগলপুরের কাহারও নাম অবধি করিত না। তা ছাড়া তার ছোট মামা সেই বাটীতে থাকিয়াই কলেজে যাইত বলিয়া কল্যাণ তার নিজের মনটা ভাল রাখিতেই চেষ্টা করিত। ভাগলপুরের সংস্রব ত ছিল।

৫। এ দিকে তার ভাগলপুরের সঙ্গীরা কল্যাণের অভাবে যেন মুহ্যমান হইয়া গিয়াছিল, বিশেষ আমার মধ্যম দেবরের কন্যা প্রমোদিনী—"খুকী"। তার ছয় মাস বয়সে মাতৃ-বিয়োগ হওয়াতে সে আমার কাছে থাকিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে খাইতে শুইতে কাঁদিত আর আমার উপর রাগ করিত। "মা তুমি কল্যাণকে কেন যেতে দিলে?" সে বল্‌বে আর ফুলে ফুলে কাঁদবে। খুকী কল্যাণের শ্লেট ও খেলনা সব কুড়াইয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিত, ঝাড়ঝোড় করিত। এমন কি কল্যাণের ছেঁড়া জুতাটী অবধি ফেলিতে দিত না।

৬। ১৮৮৮ খ্রীঃ, এপ্রিল মাস, গ্রীষ্মের ছুটী। বিনোদিনী ছেলে মেয়েদের লইয়া ভাগলপুরে আসিয়াছে। কল্যাণকে পাইয়া তার সঙ্গীদের আনন্দের ধূম দেখে কে। তারা যেন কি অমূল্য নিধিই হাতে পাইল। কতই গল্প, হাসি, খেলা উহাদের ভিতর চলিত। নূতন জিনিস কল্যাণের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতে সকলের ব্যগ্রতা, উৎসাহ কত। ঝরিয়া-পড়া শুষ্ক নিচু, গোলাপজাম, ক্ষিরণি-ফল, বকুলের ফল, কল্যাণের কাছে কতই উপঢৌকন আসিত। কল্যাণও সে সব খুব আদর ও আগ্রহের সহিত লইত আর জমা করিয়া রাখিত—ঠিক যেন ঐ সব সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নি। প্রত্যহ বৈকালে সকল ছোকরারা

একসঙ্গে বেড়াইতে যাইত। কল্যাণের প্রতি অন্যান্য ছেলেদের এত সদ্ভাব, ভালবাসা, বন্ধুতা দেখিয়া আমরা সকলেই আনন্দ পাইতাম।

সেবার বিনোদ ১৫ দিন থাকিয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া যায় কিন্তু কল্যাণ, তার ভগিনী পরিমল (বিবি) আর ভাই কমল, তিনজনে আমার কাছে থাকিয়া যায়। ছোট দুইজনে কাঁদাকাটী, গোলমাল করে নাই।

৭। এই সময়কার একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একদিন বেড়াইয়া আসিয়া খুকী (প্রমোদিনী) রাগ করিয়া বসিয়া আছে। কি হইয়াছে, আমি জিজ্ঞাসা করায় সে এই নালিস করে :—"কল্যাণ আমার চুল ধরে টেনেছে, জুতার ঠোক্কর দিয়েছে, পায়ের উপর মুড়া ঢেলে দিয়েছে, আমি কল্যাণের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি, ওর সঙ্গে আর খেলবও না, বেড়াতেও যাব না।"

আমি কল্যাণকে ডাকিয়া ঐ নালিসের কথা বলিলাম। সে এই উত্তর দিল :—"বেশত, আমি যা যা করেছি, খুকী মাসীও তাই তাই আমার উপর করুন। আড়ি করবার দরকার কি?"

আমি খুকীকে বলি :—"কল্যাণ শাস্তি নিতে চেয়েছে ;

তুমি ওকে শাস্তি দিয়ে ভাব কর।" খুকী তাহাতে রাজী হইলে কল্যাণ বলিল "খুকী মাসী, তুমি বুট জুতা খোলো—আমি সুজুতায় তোমার বুটের উপর ঠোক্কর দিয়াছি, আমি বুট পরে নিই। খুকী বলিল :—আমার বড় চুল তুমি জোরে টেনেছ, তোমার ছোট চুল। কল্যাণ :—"তুমি খুব মুটো করে জোরে টেনো"। মুড়ী এক চুপড়ী পূর্ব্বেই কুড়াইয়া আনা হইয়াছিল। সব ঠিক হইল। কল্যাণ শাস্তি লইবার জন্য দাঁড়াইল।

খুকী জুতার ঠোক্কর একটু আস্তে দিতেই কল্যাণ বলিয়া উঠিল "উহুঁ হলো না, মনে রাগ আনো আর জোরে মার। কিন্তু বেশী জোরে হলে আমি আবার মারব।" চুল টানিবার সময়ও ঐরূপ বোল-চাল। মুড়ী ঢালার পরেই ভাব হইয়া গেল। আবার বেশ স্ফূর্ত্তিতে খেলা আরম্ভ হইল। দর্শকেরা ত হেসেই অস্থির।

ফুলু, বিবি, কল্যাণকে ক্ষেপাইতে লাগিল :—"কেমন মজা, বড়মা কেমন শাস্তি খাওয়াইলেন"।

কল্যাণ উত্তর দিল :—"এ আর মজাটা কি? দোষ করেছি শাস্তি খাব না? খুকী মাসী যদি মুড়ীগুলা ফেলে না দিতেন ত ওঁকে আমি মারিতাম না—ভাগ্‌গিস্ আমি মুড়ীগুলা কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম তাইত সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেল।"

৭। ঐ ঘটনার মাস দুই পরে কল্যাণ তার ছোট ছোট ভাই ভগিনীদের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিল। তারপর নূতন স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার ও লেখাপড়া শিখিবার উৎসাহে কল্যাণের মন ক্রমশঃ কলিকাতাতেই সংযত হইতে লাগিল; ভাগলপুরের জন্য উতলা হওয়ার ভাব ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। আমিও সুস্থির হইলাম।

৮। কল্যাণ আর শিশু নাই বালকত্ব প্রাপ্ত হইল। স্কুলের পড়া শুনার চাপও উচিতমত তার উপর পড়িতে লাগিল। ক্ষেত্রমোহন কল্যাণকে খুব যত্ন করিয়া তাহার স্কুলের পড়া বলিয়া দিতেন। উঁহারা সিমলা বাজারের নিকট যে বাসা বাড়াতে থাকিতেন তাহা ছাড়িয়া শাঁখারীটোলায় এক বড় বাগানওয়ালা বাড়াতে উঠিয়া যান। সেখানে বাগানে ছেলে মেয়েদের পক্ষে খেলা ধূলা ছুটাছুটী করিবার খুব সুবিধা। বিনোদিনা আর ক্ষেত্রমোহন ছেলেপুলে লইয়া খুব সুখেই সেই বাটীতে ছিলেন।

৯। ইতিমধ্যে আমি স্বামার সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইয়া আসি। প্রায় ৮ কি ৯ মাস আমার সঙ্গে কল্যাণের দেখা হয় নাই। ১৮৮৯ অক্টোবর মাসে কল্যাণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশলকুমারের জন্ম হয়। তারপর অগ্রহায়ণ মাসে কোনও এক বিবাহ উপলক্ষে আমাদের ভাগলপুর হইতে কলিকাতা

আসা হয়। উনি আমাকে বৌবাজারের বাটীতে রাখিয়া বিনোদিনীকে তার শাঁখারীটোলার বাড়ীতে দেখিতে যান।

সে দিন কলিকাতায় খুব দুর্য্যোগ; সমস্ত দিন আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার। কখনও খুব জোরে হাওয়া বহিতেছে কখনও বা মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে ভয়াবহ মেঘ গর্জ্জন আর বিদ্যুৎহানা চলিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী পাল্কীর চলাচল এক প্রকার বন্ধ।

১০। কল্যাণ তার দাদুকে দেখিয়া বলিল :—দাদু, বড়মার কি খুব কাজ? তিনি আস্‌তে পারেন নি? তাহাতে উনি উত্তর দিলেন "পাল্কী কি গাড়ী পেলেই তোমার বড়মা আসবেন"। উনি সেখান থেকে ফিরিয়া আসিবার পরই কল্যাণ বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। তার ভাই ভগিনীরা টের পাইয়া ক্ষেত্রমোহনকে জানাইল। ক্ষেত্রবাবু তাহাকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশে ডাকিতেছেন—এমন সময়ে আমার পাল্কী গিয়া উহাদের দরজায় লাগিল। "কে এসেছেন, দেখবে এস" বলিয়া ক্ষেত্রমোহন ডাকিতেই কল্যাণ বড় বড় চোক রগড়াতে রগড়াতে আমার কাছে উপস্থিত। তখনও কান্নার বেগ একেবারে থামে নাই। আমার কোলে মুখ লুকাইয়া খুব কান্না হইল। অনেক কষ্টে কান্না সামলাইয়া আমাকে অভিযোগ

দেওয়া হইল "তুমি এত দেরিতে কেন এলে—এখন রাত্তির হয়ে গেল, আমি সকাল থেকে রাস্তা দেখছিলুম—তুমি এলে না, তাই আমার কান্না পেলো।"

১১। আমি উহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, কত দেশ বেড়াইয়া আসিয়াছি—তাহার গল্প জুড়িয়া দিলাম এবং সেই সব স্থান হইতে উহাদের জন্য কত কি খেলনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা সব বণ্টন করিয়া দিলাম।

কল্যাণের বয়স এখন পূর্ণ ৭ বৎসর। এতদিন পরে সে তার নিজের মন-কেমন ও কাঁদিয়া ফেলার দুর্ব্বলতা নিজমুখে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিল।

বৌবাজারেরদিকে ভাল বাংলা স্কুল না থাকায়, ক্ষেত্রমোহন কল্যাণকে ভাল স্কুলে দিবার জন্য পুনরায় সিমলা বাজারের কাছে বাটী ভাড়া করিলেন।

ত্রয়োবিংশ উচ্ছ্বাস।

১। তারপর এপ্রিল মাসে কল্যাণ তার ভাই ভগিনীদের সঙ্গে ভাগলপুরে বেড়াইতে আইসে। একমাস মাত্র থাকে। তখন তার লেখাপড়ায় বেশ মন বসিয়াছে। বিশেষ ভূগোল-সূত্রটা তার বড়ই ভাল লাগিত। তার মামাদের একটা পুরাতন গ্লোব ছিল, সেটা লইয়া সে ক্রমাগত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিত কি করিয়া আমেরিকা নীচে যায় আর এসিয়া খণ্ড উপরে আসে, ফের এসিয়া নীচে যায় আর আমেরিকা উপরে আসে, আর কি করিয়া বা অত বড় বড় নীল সমুদ্রের ভিতর ভূ-খণ্ড সকল না ডুবিয়া গিয়া দেহ তুলিয়া থাকে। আমাকে সেই প্রশ্ন ক্রমাগতই করা হইত। আমি তার মনোমত উত্তর দিতে না পারিলে বলা হইত যে "কলিকাতায় গেলে বাবু ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।"

২। ছুটীর পর কলিকাতায় গিয়া আমাকে নিজে চিঠি লিখিবার ধূম পড়িয়া গেল। বিনোদের কাছে তখন একটী ভদ্র ঘরের বাল্য-বিধবা থাকিত, ছেলেরা তাঁকে মাসীমা বলিত। কল্যাণ তাঁর কাছে বসিয়া আমাকে চিঠি লিখিত। তিনি যা যা

লিখিতে শিখাইয়া দিতেন তাহা তার খুব মনের মত হইত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁর পুনরায় বিবাহ হইয়া যাওয়াতে কল্যাণ সে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। কল্যাণ তখন নিজেই চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল; ঠিক হইত না বলিয়া রাগ করিয়া চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিত। তাহাতে বিনোদ হাসিত। বিনোদের সাহায্য কল্যাণের তত পছন্দ হইত না।

৩। সে বৎসর (১৮৯০ খ্রীঃ) পূজার বন্ধের পরেই কলিকাতায় আমার দাদার খুব ব্যারাম হয়। আমার ভাজ শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী তাঁর ছেলেমেয়েদের লইয়া তখন বিলাতে। সেখানে ঐ সময়ে তাঁর বার বৎসরের ছেলে, কিটি (সরলকৃষ্ণ), হঠাৎ মারা পড়াতে আমার দাদার অসুখ আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর শুশ্রূষার জন্য আমাকে ভাগলপুর ছাড়িয়া প্রায় ছয় মাস কলিকাতায় থাকিতে হয়।

তখন রবিবারে রবিবারে, কি ছুটীর দিনে, কল্যাণ আমাকে আর তার দাড়িদাদুকে দেখিতে বিনোদের সঙ্গে আসিতে ছাড়িত না। কিন্তু তখন তার লেখাপড়ায় ঝোঁক খুবই বাড়িয়াছে দেখিলাম। বৌবাজারে আসিয়া অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করিতে আর তার ইচ্ছা করে না; স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখা পছন্দ হয় না।

৪। আমার দাদা ১৮৯১য়ের মার্চ্চ নাগাৎ সুস্থ হইয়া উঠিলে আমি ভাগলপুরে ফিরিয়া যাই। তার পরেই ক্ষেত্র-

মোহনের অবস্থার নিতান্ত পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁর পদোন্নতি হয়। একপক্ষে তাহা যেমন সুখকর, অপর পক্ষে তাঁর পদোন্নতিই যেন তাঁর কাল হইল। প্রথমেই ত তাঁহাকে কলিকাতার বাটী ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত সংসার ভাগলপুরে আনিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতে হয়।

৫। ক্ষেত্রমোহন তখন বিহার অঞ্চলে এক্সাইজ্ (মদ,ভাং আফিং) ডিপার্টমেণ্টের সুপারিনটেণ্ডাণ্ট্ হওয়াতে, তাঁহাকে নানা স্থানে সরকারি মদের ভাঁটির তদারক করিয়া বেড়াইতে হইত। কল্যাণকে ভাগলপুরে বাংলা স্কুলে ও তার ভগিনী পরিমলকে বালিকা স্কুলে ভর্ত্তি করান হইল। কয়েক মাস পরেই ঐ কাজ করিতে করিতে ক্ষেত্রমোহন পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতার ব্যারাম হয়। তিনি তিন মাসের ছুটী লইলেন এবং ভাগলপুরেই থাকিলেন। সেই সময়ে তিনি হিন্দি ও কায়েথী ভাষা শিখিয়া লইলেন।

৬। তিন মাস পরে ক্ষেত্রমোহনকে মেদনীপুর ডিষ্ট্রীক্টে, গড়বেতায়, বদলী করিয়া দেয়। কল্যাণ, পরিমল আর কমল আমার কাছেই থাকিয়া যায়। ক্ষেত্রমোহন বিনোদিনীকে এবং অন্যান্য ছেলেপুলেদের লইয়া কার্য্য স্থানে গমন করেন। গড়বেতায় থাকিয়া ক্ষেত্রমোহনের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না

হইয়া বরং খারাপই হইতে লাগিল। চার পাঁচ মাস সেখানে অসুস্থ অবস্থায় কাজ কর্ম্ম করিতে হয়। কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ১৮৯২য়ের এপ্রিল মাসে আলীপুরে বদলী করে। তখন তিনি তাঁর পিত্রালয়ের নিকটস্থ এক বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকেন।

৭। সেই বৎসর কল্যাণ ও পরিমল দুজনেই লোয়ার ভারণা-কুলারে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া মাসিক ছয় টাকা হারে আর চার টাকা হারে বৃত্তি পায় এবং কলিকাতায় পিত্রালয়ে আসিয়া কল্যাণ হেয়ার স্কুলে ও পরিমল বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হয়। কল্যাণ তিন বৎসর বাংলা স্কুলে পড়াতে উহার ইংরাজীতে যেরূপ দখল হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। সে দোষ খণ্ডন করিবার জন্য ক্ষেত্রমোহনের বন্ধু আদিত্যবাবু কল্যাণকে খুব যত্ন করিয়া পড়াইতেন। কল্যাণের তখন লেখাপড়ায় খুব মন ও যত্ন।

৮। আদিত্যবাবু বেথুন স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে কল্যাণের চেয়ে এক মাসের বড়; দেখিতে রাজপুত্রের মত মূর্ত্তি। তাকে কোনও বাংলা স্কুলে দেওয়া হয় নাই। সে কল্যাণের নীচের ক্লাসে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইল। কল্যাণ তার কাছে দাঁড়াইলে, তার গলা

অবধি হইত। তার রং ঠিক ইংরাজদের ছেলের মত ফরসা। কল্যাণ তার কাছে দাঁড়াইলে কল্যাণের রং ময়লাই বোধ হইত। কিন্তু প্রতিভায় কল্যাণ তাকেও নিজের অধীনে রাখিয়া খেলা করিত।

৯। আদিত্যবাবুর সহিত ক্ষেত্রমোহনের প্রণয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি অতি সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন মারা যাইবার পর, আদিত্যবাবু অনুমান বৎসর বার জীবিত ছিলেন। আদিত্যবাবুর পত্নীর কাল তাঁহার পূর্ব্বেই হয়। তারপর আদিত্যবাবুর অনেক ছেলেরা মানুষ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মারা পড়ে। তাঁহার সেই রাজপুত্রের মত প্রথম সন্তান এক পুত্র আর বিধবা পত্নী রাখিয়া বহুদিন হইল মারা পড়িয়াছেন। আদিত্যবাবুর দুই সন্তান এখনও সৌভাগ্যক্রমে জীবিত আছেন। তাঁরা দুজনেই ভাল ভাল চাকরী করিতেছেন।

১০। আদিত্যবাবু ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতাও তাঁহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাস্তবিক ব্রাহ্মের' খুব ভাল রকমের হিন্দু। আমি নিজে ব্রাহ্মদের আর তথা-কথিত হিন্দুদের ভিতর কোনই প্রভেদ দেখিতে পাই না। আজ কাল আইন অনুসারে ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা হিন্দু-সমাজের ভিতর গণ্য হইতেছেন। ইহা দেশের

পক্ষে নিতান্তই কল্যাণকর। পূর্ব্বে, এক পুরুষে ব্রাহ্মদের পিতারা কেন নিজ নিজ সন্তানদের উপর ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হওয়াতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ত্যাজ্য করিয়া যাইতেন তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

১১। ইহ-সংসার ভাবিয়া দেখিতে গেলে সর্ব্বতোভাবে এক পান্থশালা। বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন, ঘরকন্না, টাকা-কড়ি সবেরই সঙ্গে দু'দিনের সম্পর্ক। আমাদের সকলকেই সংসারের মায়া মমতা পরিহার করিয়া যাইতে হইবে। তবে "ত্যাজ্যপুত্র" করিয়া নিজের ছেলেদের সঙ্গে মনো-মালিন্য, বাদ-বিসম্বাদ বাড়াইয়া কি ফললাভ হয়? উহাতে নিজের আত্মম্ভ-রিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনে কষ্ট পাওয়াও আছে আর ত্যাজ্যপুত্রের মনে কষ্ট দেওয়াও আছে। যে সব পিতারা ত্যাজ্যপুত্র করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন তাঁহারা কি বস্তুতঃ ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন? উহাতে কি তাঁহাদের ইহ-জগতে পুণ্য আর মানসিক শান্তি সঞ্চয় হইয়াছে? এই সকল গভীর প্রশ্নের উত্তর দেশবাসীরা নিজ নিজ মনে ভাবিয়া দিবেন।

চতুর্বিংশ উচ্ছ্বাস।

১। কল্যাণের সুখের শৈশব, সুখের বাল্যকাল হঠাৎ অন্ধকারময় হইয়া পড়িল। ক্ষেত্রমোহনের হৃৎপিণ্ডের পীড়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি দুরারোগ্য বলিয়া প্রকাশ পাইল। অনেক চিকিৎসা পত্র হইল, অনেক দিন ধরিয়া উঁহাকে ভাগীরথীর পবিত্র বায়ু সেবনের জন্য নৌকায় রাখা হইল। রোগের স্থায়ী উপকার না হওয়াতে তিনি আমার দাদার পার্কষ্ট্রীটের বাটীতে মাসাবধি বাস করিলেন। তখন অক্টোবর মাস।

সেই সময় তাঁহার পিতা কৈলাসবাবুর হৃদয় নিতান্তই আর্দ্র হইয়া গিয়াছে; ক্ষেতুর আরোগ্যের জন্য তিনি নিতান্তই ব্যাকুল। ছেলেকে দেখিতে তিনি পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে অনেকবারই আসিতেন। ক্ষেত্রমোহনের ইচ্ছানুযায়ী একদিন কৈলাসবাবু তাঁর পদধূলি পুত্রের মাথায় দিলেন।

পিতা পুত্রের এরূপ সম্মিলনে, সকলেরই চক্ষে জল আসিয়াছিল। কৈলাসবাবু নিজে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ছেলেকে বলিলেন "বাবা যতদূর চিকিৎসা চলে, আমি সব করাইব। তুমি আর মামা-শ্বশুরের বাটীতে থাক্‌বে কেন? তুমি তোমার বাপের

বাড়ী এস, তুমি ত আমার একটী, তুমি শীঘ্র এস—আমি তোমার জন্য সব বন্দোবস্ত করে কাল প্রাতেই গাড়ী পাঠাইয়া দিব —"

২। সেইরূপই হইল। ক্ষেত্রমোহন পিতার গাড়ীতে পিত্রালয়ে বিনোদিনীকে লইয়া উঠিলেন। সেখানে দিন দুয়েক থাকার পরেই নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি তাঁহার মৃত্যু হয়। সে সময় তাঁহার সরকারি আফিসে বেশ সুনাম পড়িয়াছে, পদবৃদ্ধি হইয়াছে, মাহিয়ানাও বাড়িয়াছে এমন কি কলিকাতায় তিনি গাড়ী ঘোড়াও করিতে পারিয়াছিলেন। কল্যাণ, পরিমল বাপের সঙ্গে গাড়ী করিয়া স্কুলে যাইত। যখন কল্যাণের পিতৃ-বিয়োগ হইল তখন তার বয়স পূর্ণ ১১ বৎসর একমাস মাত্র।

৩। ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুতে কি বিপদে, কি শোকে আমরা পড়িলাম তাহা বর্ণনার অতীত। বৃদ্ধ পিতার ঐ একমাত্র পুত্র। আমাদের অদৃষ্টে বিনোদিনী তিন পুত্র, আর দুই কন্যা লইয়া পুনরায় বিধবা হইল। সে ক্ষেত্রমোহনের মত স্বামী হারাইয়া কেমন করিয়া বাঁচিবে এই ত হইল এক সমস্যা—তার অতগুলি নাবালক ছেলে-পুলেদের আমরা কি প্রকারে মানুষ করিয়া তুলিব, এই দ্বিতীয় সমস্যা আমাদিগকে নিতান্তই অভিভূত করিয়া তুলিল। ক্ষেত্রমোহন অল্প টাকারই জীবন বীমা করিয়াছিলেন তা ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

৪। যার জোরে বিনোদ শ্বশুর বাড়ীতে দুই দিন ঘর করিতে ঢুকিয়াছিল—সেই যখন আর নাই, তখন কিছুদিন শ্বশুরের বাটীতে থাকিয়া তার তথায় আর মন টিকিল না। ব্রাহ্ম ধরণে শ্রাদ্ধাদি হইবে তাই সে শ্বশুরের সম্মতি লইয়া, তাঁরই বাটীর নিকটে সিম্‌লা পাড়ায় একটী ছোট বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে লাগিল।

কৈলাসবাবু তখন খুবই যত্ন দেখাইতেন. প্রত্যহ বাস-বাটীতে আসিয়া বিনোদের, নাতি নাতিনীদের, খোঁজ খবর লইতেন। তাঁর নিজের গাড়ীতে তাঁর ভাইপোর ছেলেরা কলেজে পড়িতে যাইতেন। তাঁহাদিগকে কৈলাসবাবু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন যেন তাঁরা ক্ষেতুর ছেলে মেয়েদেরও সঙ্গে করিয়া গাড়ীতে স্কুলে লইয়া যান।

৫। কলেজের ছেলেদের দেরিতে লেক্‌চার সুরু হয়—রোজ ১০॥টায় তাহাদিগকে হাজরী দিতে হয় না—তাই বিনোদের দুই ছেলে সিম্‌লা হইতে পটলডাঙ্গায় হাঁটিয়া স্কুল যাইতে আরম্ভ করে—পাছে গাড়ীর অপেক্ষায় থাকিলে স্কুলে দেরি হইয়া যায়।

একদিন কল্যাণের দাদাবাবু উহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা গাড়ীতে যাওনা কেন?" কল্যাণ উত্তর দিয়া-

ছিল :—"গাড়ীর অপেক্ষায় থাকিতে গেলে স্কুলে পৌঁছিতে দেরি হইয়া যায়, ক্লাস বসিয়া যায় : তা ছাড়া আমাদের কি আর গাড়াতে যাওয়া মানায় দাদাবাবু।" কৈলাসবাবু সেই বালকের আক্কেল দেখিয়া নাকি একটু কাঁদিয়াছিলেন এবং কল্যাণের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

৬। কৈলাসবাবু ধনী হইলেও তাঁহাকে তাঁর ভ্রাতার বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। তা ছাড়া তাঁর নিজের এক বিধবা কন্যা ও তাঁর দুটি ছেলে কৈলাসবাবুর নিকটেই থাকিতেন। ক্ষেত্রমোহন পিতার অমতে ব্রাহ্ম হইয়া বিধবা বিনোদিনাকে বিবাহ করিয়া বিদেশে কার্য্যগতিকে দূরে দূরে থাকিয়া পিতৃ-স্নেহ ও অনুরাগ হইতে খুবই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বিনোদিনার পিতৃহীন ছেলে মেয়েদের, কৈলাসবাবু, অবশ্যই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন—কিন্তু স্নেহের হৃদয়ে বোধ হয় দেখিতেন না। ইহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে কৈলাসবাবুর বোধ হয় সুবিধা হয় নাই। বিনোদিনার সংসারের ভার তার পিতাই বহন করিতেন। সিমলা অঞ্চলে তাঁর একটা ছোট বাড়ীতে বিনোদিনী ছেলে মেয়েদের লইয়া থাকিত।

৭। কল্যাণ হেয়ার স্কুলে লেখাপড়া বেশই করিতে লাগিল। কোন বৎসর সে একই ক্লাসে পড়িয়া থাকে নাই,

বরাবরই বাৎসরিক পরীক্ষায় পাশ হইয়া প্রোমোশন পাইয়াছে। কল্যাণ লেখাপড়ায় খুব কষ্ট সহিষ্ণু ও যত্নবান ছিল কিন্তু খুব যে চালাক চতুর তা ছিল না। পিতৃ-বিয়োগ যে কি ভয়াবহ ব্যাপার তাহা সে অল্প বয়সে বিলক্ষণই উপলব্ধি করিয়াছিল। তার মার বিধবার বেশ, বিধবার আহার ইত্যাদিতে কল্যাণ মানসিক কষ্ট খুবই পাইত। এই সব চাপে তার প্রকৃতি ক্রমশঃ অতি গম্ভীর হইয়া পড়িল।

৮। ক্ষেত্রমোহন মারা যাইবার চার বৎসরের ভিতর আর এক মহাবিপদ আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বিনোদিনীর পিতা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে বিশেষ রকম রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। ভাগলপুরে ওকালতী কাজ হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি লইয়া স্বাস্থ্যের জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে প্রবাসী হইতে হইল; সমুদ্রের বায়ু সেবনের জন্য হংকং অবধি ঘুরিয়া আসিতে হইল। পুনরায় ১৮৯৮য়ের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে করসিয়ঙ্গে ও তৎপরে দার্জ্জিলিঙ্গে তাঁহাকে থাকিতে হয়।

৯। কল্যাণ তাহার মাতামহের খুবই আদরের ছেলে। সে বৎসর এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া কল্যাণ ও তার ভাই কমল তাঁর কাছে দার্জ্জিলিঙ্গে যায়। সেখানে থাকিতে থাকিতেই কল্যাণের পাশের খবর পৌঁছে।

৯। সে খবরে কল্যাণ খুব প্রফুল্ল না হইয়া যেন মুখখানি মলিন করিয়া বসিয়া পড়িল; কারণ সে উচ্চ ডিভিসানে পাশ হয় নাই। কল্যাণের দাদু ছেলের ঐ দশা দেখিয়া খুব আদর করিয়া বলিলেন "তুমি যে বৎসরটা হারাও নাই এই তোমার বাহাদুরী, তোমার দুঃখ করিবার কারণ কিছু নাই; তুমি যে পাশ হইতে পারিবে, আমি মোটেই সেটা আশা করি নাই।" এই বলিয়া তিনি কল্যাণের হস্তে ১০৲ টাকা পুরস্কার দেন। তখন কল্যাণের খুব আহ্লাদ। ঐ টাকা সে আমার কাছে জমা রাখে।

১০। বিনোদিনীর মামারাও তাহাকে সাহায্য করিতেন। কল্যাণের পাশের খবরে তাঁহারাও খুব আহ্লাদ করিয়াছিলেন। কল্যাণ কলিকাতায় ফার্ষ্ট আরটস্ পড়িতে আরম্ভ করিল।

বিনোদিনীর পিতার স্বাস্থ্য দার্জ্জিলিঙ্গে আরও খারাপ হওয়ায় আমরা তাঁহাকে লইয়া সেই বৎসর নভেম্বরে কলিকাতায় ফিরিলাম। ডিসেম্বর মাসে বিনোদিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা পরিমলের বিবাহ হয়। তার এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৯৯ জানুয়ারীতে বিনোদিনীর পিতার কাল আমার দাদার পার্ক ষ্ট্রীটের বাটীতে হয়।

১১। আমাদের সকলের পক্ষেই সে শোকে সংসার অন্ধকারময়; কল্যাণের পক্ষে ত অকুল পাথার। তার তখন মাত্র ১৭ বৎসর বয়স। তার দাদুইত তাকে 'আদরের গোপাল' করিয়া মানুষ করিতেছিলেন। তাঁর কল্যাণ সম্বন্ধে বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে সে ফার্ষ্ট আর্টস পাশ করিয়া ডাক্তারি শিক্ষা করে। কল্যাণ তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সে ঐ পরীক্ষা পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে আরম্ভ করে।

১২। আমার পিসতুত ভাই ৺ সত্যহরি চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজের পাশ করা খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন—আর অনেকদিন ঐ কলেজের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমার স্বামীর কাছে কল্যাণকে ভাল করিয়া ডাক্তারি শিখাইবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন। সত্যহরি কল্যাণকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করা সম্বন্ধে এবং ভর্ত্তি হইবার পর শক্ত শক্ত ডাক্তারি পুস্তক বুঝাইয়া দিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

১৩। সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কল্যাণের পিতামহের কাল হয়। শেষাশেষি তিনি বিনোদিনীর ও তার ছেলে মেয়েদের উপর খুবই দয়ালু হইয়াছিলেন। প্রায়ই বিনোদিনীকে

ও তার ছেলে মেয়েদের ডাকাইয়া পাঠাইতেন; বিনোদিনীর হস্তে খাইতে ভাল বাসিতেন। ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর কৈলাস বাবু উইল করিতে বাধ্য হন এবং উইলে বিনোদিনীর তিন পুত্রকে কিছু কিছু দিয়া গিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ উচ্ছ্বাস।

১। এক বৎসরের ভিতর কল্যাণ মাতামহ আর পিতামহ দুইজনকে হারাইয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে তার মায়ের মাথার উপর আর কোন পুরুষ গুরুজন রহিল না যাঁহাদের উপর আপদে বিপদে সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে।

আমার দাদা ১৯০২য়ের এপ্রিল হইতে বিলাতে, তথায় পার্লেমেণ্টের সভ্য হইবেন আর প্রিভিকাউন্সিলে প্রাক্‌টিস্ করিবেন বলিয়া একরূপ দেশত্যাগী হইয়াছিলেন।

আমার ছোট ভাই সত্যধন, তিনি বিনোদকে খুব স্নেহ করিতেন—সময়ে সময়ে টাকা-কড়ি দিয়া সাহায্য করিতেন—বিপত্নীক হইয়া বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি তিনটী কন্যা রাখিয়া ১৯০২য়ের অক্টোবরে মারা পড়েন। সত্যধনের মৃত্যুতে বিনোদিনীর অনেক আদরের সিমলার মামার বাড়ী যেন দীপ-শিখার মত নিবিয়া গেল।

২। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বিনোদিনীর ও তার ছেলে মেয়েদের দুঃখে সহানুভূতি —তাদের আব্দার পালিবার লোক সব যেন বিলীন হইয়া গেল।

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিল বটে বিনোদিনীর নিজের দুই ভাই আর আমার মধ্যম ভগিনী সুখদার ছেলেরা। কিন্তু তারা সকলেই বিনোদিনীর চেয়ে ছোট বলিয়া তার চক্ষে তারা সব বালক ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? আর তারাও ঐ সব গুরুজন-দিগকে হারাইয়া, নিতান্তই কাতর অবস্থায় স্ব স্ব কাজ কর্ম্মে এতই ব্যস্ত হইতে বাধ্য হইল যে কে কাহাকে তখন দেখে তার ঠিকানা নাই। কল্যাণ তাহা বেশই বুঝিতে পারিয়াছিল।

৩। আর সেইজন্যই কল্যাণ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষার পুস্তক সকল পড়িত ; হাঁসপাতালে কাজ ও কাটা-কুটি শিখিতে যাইত। বাটীতে সে তার মার বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইল। ছোট ছোট ভাই ভগিনীদের স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার উপর নজর রাখিতে সে ভুলিত না। তার মায়ের সংসার চালাইবার গুরু ভার যেন তার স্কন্ধে পড়িয়াছে এই ভাবিয়া সে নিজেকে শান্ত সংযত করিয়া চলিত। যাতে তার দুঃখিনী মাকে সে কিঞ্চিৎ সুখ দিতে পারে সেইটাই তার যেন জীবনের ব্রত হইল। কল্যাণ ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হইয়া দাঁড়াইল।

৪। সুবিধা বা ছুটী পাইলে মধ্যে মধ্যে কল্যাণ আমার কাছে আসিয়া তার মনের আবেগের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। আমি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তার কোমল

৬। চক্ষের জলের সঙ্গে আমার মনে শান্তি পাইতাম —এই ভাবিয়া যে ভগবানের জগতে যে এত শোক, দুঃখ, কষ্ট তার মর্ম্মই হইতেছে মানুষকে মানুষ করা—মানুষ কোন্ পথে যাইবে তাহা নির্দেশ করা। কল্যাণ তার পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে যদি নানারূপ মনঃকষ্টে না পুড়িত—তাহা হইলে তার হৃদয়ের ভাব অন্যরূপ হইয়া যাইত তাহা নিশ্চয়। মৃত্তিকা যত পুড়িবে ততই শক্ত মজবুত হইতে থাকিবে। বাহ্য-জগতের এই নিয়মটী আমাদের অন্তর-জগতেও খুব খাটে।

কল্যাণের জীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে যে সৎপথে নিজেকে সংযমী করিয়া চলিতে সমর্থ হইবে আমার মনে এ বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হইল। সে তার জীবনের উচ্চপথের আভাস পাইয়াছে—এইটা জানিয়া আমার মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল। সে যে তার দুঃখিনী মায়ের ভাল ছেলে হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

ষড়্‌বিংশ উচ্ছ্বাস।

১৯০৬য়ে কল্যাণ মেডিকেল কলেজের ডিগ্রীপ্রাপ্ত হইয়া ডাক্তারি করিতে বাহির হইল। তখন তাহার বয়স ২৩৷৷০ বৎসর। প্রথমে ৺ ক্ষেত্রমোহনের বন্ধু, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীনীলরতন সরকার, খুব আনন্দ সহকারে কল্যাণকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া তাঁর ডাক্তারি কাজকর্ম্ম ব্যাপারে ঘুরিতেন। উহাতে কল্যাণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তখন তাহার মনে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ইচ্ছা এতই বলবৎ হইয়া উঠে যে সে একটা জাহাজের ডাক্তার হইয়া হংকং, জাপান অবধি ঘুরিয়া আসিতে গেল।

২। ইতিমধ্যে আমার দাদার, বিলাতে—তাঁর ক্রয়ডনের বাটীতে, ২১শে জুলাই প্রাণত্যাগ হয়। আমাদের বিপদের উপর বিপদ—সে ধারার যেন আর বিরাম নাই। এখানে আমরা সকলেই মহা শোকার্ত্ত; কল্যাণ জাহাজি কাজ হইতে ফেরং আসিয়া সে খবর পাইয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

কল্যাণের বরাবরই মতলব ছিল যে সে বিলাতে গিয়া পাশ করিয়া একটা ভাল ডাক্তার হইয়া আসে। এ সম্বন্ধে তার

দাড়িদাত্রর সঙ্গে সে নাকি চিঠি লেখালেখি করিয়াছিল আর তিনিও তাহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, হয়ত সাহায্যও তাহাকে করিবেন বলিয়াছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে ছুটীর সময় তাঁর ক্রয়উনের বাটীতে তার থাকিবার সুবিধা হইবে, সে ভাবিয়াছিল। সে সমস্ত আশাই নিরাশায় পরিণত হইল।

৩। তথাপি সে স্বপ্ন, সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা! "বিলাতে গিয়া ডাক্তারি পাশ দিবে" মন হইতে সে এ বাসনাকে কিছুতেই তাড়াইতে পারিল না। তার সোণামুখী দিদিমা, আমার ভাজ—তখন বিলাতে। কল্যাণ তাঁর কাছে মনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া চিঠিপত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। এবং তলে তলে টাকা-কড়ির যোগাড়ও করিতে লাগিল। যাহাতে তার নিজের রোজগারের টাকা হইতে সে বিলাতে পড়িবার গুরুভার বহন করিতে পারে সেইজন্য সে পুনরায় ডাক্তার নীলরতনের সঙ্গে ঘোরা ফেরা আরম্ভ করিল। তাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যম থাকিলে (আর তাহারই অপর নাম তপস্যা, সাধনা, যাহাই বল) ভগবান সদয় হইবেনই হইবেন।

৪। এই সময়ে নীলরতনবাবুর সুপারিসে, এক মফঃস্বলের রাজা, তাঁর কার্ব্বঙ্কেলের অপারেসানের পর, কল্যাণকে নিযুক্ত করিলেন, সময়োচিত সেবা পাইবার জন্য

প্রত্যহ ক্ষতস্থান দেখাইবার জন্য। মফঃস্বলে কল্যাণ সেই রাজার সঙ্গে তাঁর রাজবাটীতে প্রায় দেড় মাসকাল ছিল; আর রাজার সেবা করিয়া তাঁর খুব প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা বেশ আরাম হইয়া কল্যাণকে একস্যুট ভাল ইংরাজী কাপড় এবং নগদ ৯০০ শত টাকা দেন।

৫। ১৯০৭ য়ে, ফেব্রুয়ারী মাসে, বিনোদের দ্বিতীয় কন্যা সতীর বিবাহ হইয়া যাইবার পর হইতেই কল্যাণ তিন মাসকাল খুব অনুসন্ধান করিয়া ফের এক জাহাজি-ডাক্তারের চাকরি যোগাড় করিল। "জাহাজ" জুন মাসে ছাড়িবে, বিলাত অবধি যাইবে, কল্যাণ ঐ চাকরিতে খোরাক্ পাইবে আর মাত্র ৩০৲ টাকা বেতন পাইবে; এই বন্দোবস্ত হইল। প্রত্যেক বন্দরে বন্দরে মাল বোঝাই করিতে করিতে 'জাহাজ' যাইবে—দেড় মাসে ফরাসী বন্দর মারসেল্‌সে পৌঁছিবে।

তারপর আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া সে তার সোণা-মুখী দিদিমণিকে বিলাতে সব লিখিয়া দিল আরও বলিয়া দিল যে সম্ভবতঃ সে জুলাই মাসের অমুক তারিখে লণ্ডন বন্দরে পৌঁছিবে। সেই জুন মাসেই কল্যাণ বিলাত যাত্রা করিল।

৬। ওদিকে আমার ভাজ হেমাঙ্গিনী তাঁহার তৃতীয় কন্যার বিবাহ কার্য্য কলিকাতায় সমাধা করিবার উপলক্ষে

মিঃ ডভ ব্রেয়ার।

শ্রীমতী নন্দিনী ব্রেয়ার।

সেই জুনমাসেই পুত্রকন্যাদিসহ বিলাত হইতে রওয়ানা হয়েন। তাঁহার ক্রয়ডনের বাটী তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনীর, তাহার স্বামী মিঃ জর্জ্জ ব্লেয়ারের ও ব্লেয়ার সাহেবের মাতার জিম্মায় রাখিয়া আইসেন। কল্যাণের চিঠি আমার ভাজ বিলাত ছাড়িবার পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এবং তাহার যাহাতে ক্রয়ডনের বাটীতে থাকিবার সুবন্দোবস্ত হয় তাহা নলিনীকে বলিয়া আসিয়াছিলেন।

৭। কল্যাণ যখন জুলাই মাসে বিলাতে পৌঁছিল তখন তার নলিনী মাসিমা ও মিঃ জর্জ্জ মেশো মহাশয় যত্ন করিয়া তাকে লণ্ডন হইতে ক্রয়ডনের বাটীতে লইয়া গেলেন। সেখানে থাকিয়া কল্যাণ লণ্ডনে মেডিকেল কলেজে পড়িতে, লেক্‌চার শুনিতে যাইত। ক্রয়ডন লণ্ডন হইতে ১২ কি ১৩ মাইল দূরে। রেলপথে, লণ্ডন হইতে ক্রয়ডনে ২০ মিনিটে যাওয়া যায় আর ২৪ ঘণ্টার ভিতর, শুনিয়াছি নাকি ২০০ শত ট্রেণ লণ্ডন আর ক্রয়ডনের মধ্যে যাতায়াত করে।

৮। কল্যাণের নলিনী মাসিমা আর মিঃ জর্জ্জ ব্লেয়ার দু'জনেই তাহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক ছয়মাসের মধ্যে তাহাকে একটা ডাক্তারি পাশ দিতে হয়। ঐ পাশ দিবার পর তাহাকে "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস্"

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন করিতে হয়। সে পড়ার জন্য যে সকল লেক্‌চার শুনিতে হয় বা হাঁসপাতালের কার্য্য-কলাপে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় তাহা লণ্ডনে না করিয়া লিভারপুলে গিয়া করিলে কল্যাণের পক্ষে সুবিধা হইবে, এইরূপ ধার্য্য হয়। বিশেষতঃ ব্লেয়ার সাহেব লিভারপুলে কার্য্য করিতেন, তাঁহার সহিত লিভারপুলের হাঁসপাতাল ইত্যাদির বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে জানাশুনা ছিল। আমার ভাজ কলিকাতা হইতে পুনরায় ক্রয়ডনে ফিরিয়া যাইলে, নলিনী ব্লেয়ার সাহেব, তাঁর মাতা ও কল্যাণ লিভারপুলে যাইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

৯। আমার ভাজ বিলাত হইতে এখানে জুলাই মাসে পৌঁছিলেন। তাঁর তৃতীয় কন্যার ও কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি সেই বৎসর অক্টোবর মাসে পুনরায় বিলাত যান। তিনি ক্রয়ডনের বাটীতে নভেম্বর মাসে পৌঁছিলে, কল্যাণ, তার নলিনী মাসি ও ব্লেয়ার সাহেবের সঙ্গেই লিভারপুলে যায় এবং তথায় উঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া নিজের পড়া শুনার সুবন্দোবস্ত করিয়া লয়। কল্যাণ আমাকে আর বিনোদিনীকে উঁহাদের আদর-যত্নের কথা খুবই সুখ্যাতি করিয়া লিখিত।

নলিনী নাকি একবার বিনোদিনীকে এই মর্ম্মে লেখে যে "দিদি, তোমার ত তিনটী ছেলে, আর আমি নিঃসন্তান; তুমি কল্যাণটীকে আমায় দাও।" বিনোদিনীও নাকি সে প্রস্তাবে সন্তোষ-জনক উত্তর দিয়াছিল।

১০। কল্যাণ ১৯০৮ য়ে দুইটা ছুটীই আমার ভাজের নিকট ক্রয়ডনে আসিয়া কাটাইয়া যায়। তিনি সেই বৎসর অক্টোবর মাসে ক্রয়ডনের বাটী বিক্রয় করিয়া, বিলাতের পাট একরূপ তুলিয়া দিয়া তাঁর অবিবাহিত মধ্যম ও কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১১। আমার কাছে একদিন আমার ভাজ কল্যাণ সম্বন্ধে এই মনের কথা প্রকাশ করেন:—"কল্যাণ বেশ মেধাবী, লেখাপড়ায় খুব যত্নশীল, খুব বুদ্ধিমান ছেলে; তার লোকের সঙ্গে বেশ ভাব, আলাপ করিবার ক্ষমতা আছে। পাঁচজনের সঙ্গে সে কথাবার্ত্তায় রঙ্গরস করিতে পারে—ঠাট্টা তামাসা করিতেও পারে আর নিজের ঘাড়ে লইতেও পারে। সে একটা মানুষ হয়ে উঠবে—তা ঠিক। কিন্তু দেখ, বিনোদের মা, তার চরিত্রের ভিতর অহঙ্কারের ভাবটা, আত্মম্ভরিতার ভাবটা একটু বেশী। সে ভাবে যে তার বিবেচনায় যেটা ঠিক সেইটা বাস্তবিকই ঠিক; সেটা একেবারে অকাট্য, তাতে আর ভুলচুক হ'তে পারে না। এই যুবা বয়সে

ঐরূপ প্রকৃতির ছেলেরা যেমন একদিকে কিছু নীচ কাজ করবে না—নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক হয়ে জীবনে দাঁড়াতে সহজে পেরে উঠবে, অপরদিকে ভয় হয় পাছে মনটীতে দেমাক্ ঢুকে পড়ে। ঐ দেমাকী হইয়া পড়ার আশঙ্কা খুব আছে—তা ছাড়া, সে সোণার টুক্‌রো ছেলে; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে দোষটা কাটিয়া যাইবে আশা করা যাইতে পারে।”

১২। যুবা বয়সের ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিবার, তাহাদের অন্তরের ভাব বুঝিয়া ফেলিবার, সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুস্থান অধিকার করিবার ক্ষমতা আমার ভাজের যত ছিল—অত বোধ হয় সচরাচর কোন প্রবীণা নারীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কত রকমের দেশের ছেলেরা বিলাতে—বিদেশে, আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে মিসেস্ বনর্জীর নিকট মনের কথা বলিতে, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিতে, দাদার ক্রয়ডনের বাটীতে আসিত তার ঠিকানা নাই। যুবকদের চরিত্র কি ভাবে গঠিত হইতেছে ইহা শীঘ্র বুঝিয়া ফেলিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। আর বুঝিতে পারিতেন বলিয়াই তিনি তাহাদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশিতেও পারিতেন।

১৩। কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁর ঐ বিচক্ষণ উক্তি আমার কাছে যে খুবই শ্লাঘার সামগ্রী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিনোদিনী

আমার নিকট হইতে তার মামীর ঐ উক্তি শুনিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল ফেলিয়াছিল আর মনে মনে কল্যাণ সম্বন্ধে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল। মায়েরা যুবাবয়সের ছেলেদের হিতার্থ আর ইহ সংসারে কি করিতে পারে?

১৪। আমার সঙ্গে আমার ভাজের যে বিশেষ রকমের প্রণয় ও ভালবাসা ছেলেবেলা হইতে ছিল তাহা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইয়া যায় কলিকাতায় ১৯০৯ য়ের নবেম্বরে আর তার পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। পুণ্যবতী ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী আমাদিগকে শোকে ফেলিয়া দেহত্যাগ করেন। কল্যাণের সহিত তাঁর ইহ জগতে আর দেখা হইল না।

সপ্তবিংশ উচ্ছ্বাস।

১। সেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেই কল্যাণ আই, এম, এস, পরীক্ষায় পাশ হইয়া সৈনিকদিগের ডাক্তারি কাজে নির্ব্বাচিত হয়; তার পূর্ব্বে আর একটা পরীক্ষা দিয়া ৫০৲ পাউণ্ড স্কলারশিপ পায়। সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের পরীক্ষায় পাস হইয়া সে নামের শেষে "পি, এইচ ডি" বসাইবার অধিকার পাইয়াছিল।

উক্ত মেডিকেল সারভিসে ঢুকিবার পরেও উহাকে সৈনিক দিগের কার্য্য কলাপ শিক্ষা করিবার জন্য অতিরিক্ত ছয় মাস কাল বিলাতে থাকিতে হয়। বিলাতে যেখানে যেখানে সৈনিকদিগের আড্ডা সেই সব স্থানে কল্যাণকে ছয় সপ্তাহ কি দুই মাস করিয়া থাকিয়া সৈনিকদের সহিত মিশিবার দক্ষতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ্ সৈনিকদের ধরণ-ধারণ প্রকৃতি, অভ্যাস সমস্তই সৈনিকদের ডাক্তারদের পক্ষে জানা বিশেষ প্রয়োজন।

২। ঐ সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত করিয়া, কল্যাণ সৈনিক-দিগের ডাক্তার হয় ও প্রথমে মাসিক ৪০০৲ শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়। ঐ ডাক্তারি কাজের ঐ দস্তুর এবং সেই দস্তুরানু-

যায়িক সে একদল সৈনিকদের সঙ্গে, সৈনিকদের জাহাজে সেই বৎসর অক্টোবর মাসে দেশে ফিরিয়া আইসে।

৩। কল্যাণের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হওয়াতে, তাকে পুনরায় কলিকাতায় ফেরত পাওয়াতে—তার মায়ের ও আমাদের সকলেরই আনন্দের সীমা ছিল না।

সেবার তিনমাস কলিকাতায় থাকিবার পর তাহাকে ভারতের উত্তর পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশে, সৈনিকদিগের আড্ডা কোহাটে, সৈনিকদিগের ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইল। তারপর আর ছুটী ব্যতীত কলিকাতায় আসিবার তার সুবিধা হইত না। সে ছুটীও দিন ১০, ১২ মাত্র হইত, যাওয়া আসা ধরিয়া।

৪। কলিকাতায় সেই সব ছুটীতে আসিয়া কল্যাণ একেবারে বাঙ্গালার ছেলে—বাঙ্গালী হইত। সাহেবী বেশ ছাড়িয়া, পরিত সে ধূতি আর পাঞ্জাবী। প্রাতঃকালে সে সকল আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিয়া ঘুরিয়া আসিত। আহার করিত সে মাটীতে বসিয়া—তার মায়ের হাতের রান্না। তাহাতেই সে খুব আমোদ পাইত। আহারান্তে সে তার মায়ের কাছেই থাকিত—তাঁর আহারের কাছে বসিয়া গল্প করিত। বৈকালে জলটল খাইয়া পুরাতন বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ-খবর লইয়া, দেখা-শুনা করিয়া

আসিত। রাত্রে বই পড়িয়া তার মাকে শুনাইত—তার মা ছিল তার দেবতা, সঙ্গী এবং ইয়ার। কত রঙ্গ ও তর্ক সে তার মার সঙ্গে করিত।

৫। নিকটে বাড়ী বলিয়া—বিনোদিনীর মাস্‌তুত ভগিনীরা হাঁটিয়া আসিয়া কল্যাণের গল্প শুনিত। সকলেই হাসিয়া আমোদ করিয়া যাইত। কোন কোন দিন প্রাতে সে বৌ-বাজারে আসিয়া আমার তরকারী কোটার জায়গায় চৌকাটের উপর কিংবা একটা পিঁড়ার উপর বসিয়া আমার সহিত গল্প করিত।

বিলাত হইতে সে একটা সাদা কুকুর আনিয়াছিল; তার নাম দিয়াছিল "রাইজানা"। সেটাকে সে রাখিয়া গিয়াছিল তার মার কাছে, কোহাটে যাইবার সময়। ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়া কল্যাণ সেই কুকুর সঙ্গে করিয়া বাড়ী বাড়ী ফিরিত। কুকুরকে সে বেশ পোষ মানাইয়া সংযত করিতে পারিয়াছিল। আমার কাছে বসিয়া কল্যাণ কুকুরকে বলিত "দেখিস্ যেন বড়মার কিছু ছুঁস্‌না, চুপ করে বসে থাক্"। কুকুরটাও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

৬। ১৯১২তে কল্যাণের খুব সুখ্যাতির সহিত ১০০৲ শত টাকা বেতন বাড়িল। তার ভাই কমলেরও বিবাহ হইয়া গেল।

তারপর সকলেই কল্যাণের বিবাহের জন্য তাহাকে পেড়াপিড়ি করিতে আরম্ভ করিল; তাকে "আইবুড়ো কার্ত্তিক" বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল।

৭। ১৯১৩তে জুন মাসে কল্যাণ নিজ ব্যয়ে তার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশল কুমারকে আর্ট শিখিবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেয়।

সেই বৎসর ৺ পূজার বন্ধের সময় কলিকাতায় আসিয়া কল্যাণ শুনিল যে কমলের সন্তান হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সে ঐ খবর শুনিয়া বলিল "কমলের ছেলে যে তার জ্যেঠতাতের বিবাহে বরযাত্র যাইবে, সেটা বড় লজ্জার কথা হইবে, তাই এই বেলা একটা বিবাহের যোগাড় করে ফেলা যাক।"

৮। কল্যাণ সেই ছুটীতে ঘুরে ঘুরে বিবাহের চেস্টায় কয়েকদিন ফিরে, যোগাড়ও করিয়া ফেলিল। কুচবিহারের রাজবংশের শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী বিভাকে পছন্দ করিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি সে মেয়েকে দেখেছ, তোমার পছন্দ হয়?"

সে প্রশ্নের উত্তরে আমি যতদূর জানিতাম বলিলাম—"মোট্ কথা আমি বিশেষ কিছুই জানিতাম না। আমি তাহাকে মাঝে মাঝে দার্জ্জিলিঙ্গে দেখিয়াছি এইমাত্র, তখন সে ৪, কি ৫ বৎসরের বালিকা আর এখন ১৮, কি ১৯ বৎসরের পূর্ণ

যৌবনা। এখন কেমনটী হইয়াছে আমি কি করিয়া জানিব—
হবে, যদিও মেয়েটী ফরসা নয়—তবু বোধ হয় আমার চেয়ে ফরসা
হবে—তোর যদি পছন্দ হইয়া থাকে ত বিয়ে কর!" আমাকে
কল্যাণ উত্তর দিল "বড়মা, আমি তোমাকে মনের কথা বলি,
আমি কোন ভদ্রবংশের মেয়েকে বিবাহ করিতে চাই; আমার চোখে
সবাই ভাল—কেউ কিঞ্চিৎ গৌর-বরণ, কেউ কিঞ্চিৎ কাল"—
তাতে আমি বলিলাম "তুই যে বিয়ে করিবার ইচ্ছায়, বেশ
কবি আওড়াচ্চিস্—তবে তোর বেশই পছন্দ হয়েছে, এখন শীঘ্র
শীঘ্র ঐখানে বিয়ে করে ফেল।"

৯। ঐ পাত্রীর সহিত বিবাহ প্রস্তাবে বিনোদিনীরও মত
ছিল। সেই বৎসর বড়দিনের ছুটীর সময়, কল্যাণ বিবাহ
করিবে বলিয়া আর এক মাস অধিক ছুটী লইয়া কোহাট্ হইতে
আসিল। এবং ১৯১৪তে ১৮ই কি ১৯শে জানুয়ারী, ব্রাহ্ম-
সমাজ-পদ্ধতি অনুসারে, খুব ঘটা করিয়া কল্যাণের শুভ-বিবাহ
শ্রীমতী বিভার সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। কল্যাণের বড়মা
বরকর্ত্তা হইয়া সে বিবাহে গিয়াছিল।

কল্যাণ যে বিবাহ করিল, তাহাতে আত্মীয়-স্বজন সকলেই
খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কল্যাণের ছুটীর দিন ফুরাইয়া আসিল। নব-বধূকে

বিনোদিনীর কাছে রাখিয়া সে তার কার্য্যস্থানে কোহাটে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

১০। বিবাহ করিবার পর হইতেই কল্যাণের ইচ্ছা হইল যে কোন গতিকে বাঙ্গালা দেশে সে বদলি হইয়া আইসে। উপর-ওয়ালা সাহেবদের সহিত পরামর্শ করিয়া সে নিজের সুবিধা-জনক বদলি হইবার যোগাড়ও করিয়া লইয়াছিল।

কোহাট হইতে এপ্রিল মাসে ইষ্টারের ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়া আমাদিগকে সে জানাইল যে "বাঙ্গালা দেশেই বদলি হইবার যোগাড় করিয়াছে; মে মাস হইতে তার উপর ম্যালেরিয়ার মশা ধ্বংস করিবার ভার পড়িবে এবং অনুমান হুগলী কি চুঁচুড়া অঞ্চলে উহাকে স্থায়িভাবে থাকিয়া ঐ মশা মারার ব্যবস্থা করিতে হইবে—আবাদে জলায় ধানক্ষেতে ঘুরিয়া মশা ধরিয়া মারিতে হইবে। তবে আর একবার কোহাটে গিয়া তল্পি-তল্পা গুছাইয়া, তৈজসপত্র গুটাইয়া চালান করিতে হইবে।"

১১। কল্যাণের বদলির হুকুম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে মালপত্র লইয়া কলিকাতায় ফিরিল; এবং কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া খুব উৎসাহে হুগলীতে ম্যালেরিয়ার মশা মারার ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেল। চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাড়ী লইয়া, সাজাইয়া, তার মাকে ও বৌকে লইয়া যাওয়া হইল।

সে নিজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া মশা ধ্বংসের কি ব্যবস্থা করিত ঠিক জানিনা। কিন্তু সে ম্যালেরিয়া-বিষাক্ত ভয়ানক ভয়ানক মশার ফটো তুলিয়া সকলকে দেখাইত। তখন জুন মাস।

১২। তারপর একদিন আগ্রহের সহিত আমাকে এমনকি তার ছোট মামার পরিবারদের অবধি চুঁচুড়ায় লইয়া গিয়া বাড়ী বাগান, ফুলগাছ ইত্যাদি দেখান হইল।

আমি কায়মনোবাক্যে কল্যাণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৌবাজারে ফিরিলাম।

তখন আমরা কেহই ভাবি নাই যে ইউরোপ খণ্ডে কোন যুদ্ধ বাধিবে বা সে যুদ্ধ এত জগৎ-জোড়া হইয়া পড়িবে যে তার বাজ গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া আমার কল্যাণের শিরে পড়িবে! আমরা যাহা ভাবি না তাহাইত জীবনে ঘটে!

অষ্টাবিংশ উচ্ছ্বাস।

১। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ হইতেই ইউরোপ খণ্ডের শক্তি পুঞ্জের মধ্যে এক বিষম যুদ্ধ বাধিবে এইরূপ খবরে পৃথিবী তোলপাড় হইতে লাগিল। ২রা আগস্ট তারিখে জরমানী কোনও শক্তিদের কথা না শুনিয়া, বিশেষ ইংরাজদের অনুযোগ না মানিয়া, ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল এবং এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দখল করিবে বলিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ সুসজ্জিত সৈনিক গণকে দলে দলে নিজ সীমানা অতিক্রম করিয়া, বেলজিয়মের সীমানা অবৈধ ভাবে ভাঙ্গিয়া—বেলজিয়মের যে নগরী বাধা দিবে তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া ফ্রান্স আক্রমন করিবার কড়া হুকুম জারি করিল।

২। জরমান-বাহিনী বেলজিয়মের নগরের পর নগর অবৈধ ভাবে ধূলিসাৎ করিতে করিতে প্যারিস-অভিমুখে ছুটিয়াছে এই খবর ইংলণ্ডে ৩রা আগস্ট পৌঁছিবা মাত্র ইংলণ্ড স্থির থাকিতে পারিল না। জরমানীর পক্ষে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হওয়াতেই যে সে অবৈধ ভাবে নিরীহ বেলজিয়মের

সীমানা ভাঙ্গিয়া ফ্রান্স আক্রমণ ও প্যারিস নগর দখল করিবে তাহা কখনই সহ্য করা যাইতে পারে না।

জরমানীকে ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত করিতেই হইবে—বেলজিয়ম হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া তাহার নিজ সীমানায় তাহাকে পুনঃ প্রবেশ করাইতেই হইবে। ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত একযোগ হইয়া যতদূর সাধ্য জরমানীকে বাধা দিবে—এই কৃতসংকল্প হইয়া ঐ তারিখে রাত ১২টা অবধি ইংলণ্ডের তরফ হইতে জরমানীকে ক্ষান্ত হইতে শেষ অনুরোধ করা গেল। সে অনুরোধ জরমানী যদি না শুনে ত রাত ১২টার পর হইতে অর্থাৎ ইংরাজী হিসাবে '৪ঠা আগষ্ট হইতে ইংলণ্ডে আর জরমানীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে'—এইরূপ হুকুম বিলাতের পারলিয়ামেণ্ট হইতে ঘোষিত হইল।

৩। জরমানী কোনরূপেই তখন ক্ষান্ত হইল না। ৩রা আগষ্টের রাত ১২টা বাজিয়া গেল। তার পর-মুহূর্ত্ত হইতে ইংলণ্ডে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এখানে সেই যুদ্ধারম্ভের খবর ৪ঠা আগষ্ট বেলা ২টার সময় পৌঁছিল। দেশে একটা ভূমিকম্প হইলে লোকে যেমন ত্রস্ত হয় আমরা সকলেই সেইরূপ ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম।

৪। কল্যাণ যদি তখন কোহাটে থাকিত তাহা হইলে ঐ

যুদ্ধ ঘোষণার খবরে আমরা তাহার জন্য নিশ্চয় ব্যাকুল হইতাম। কিন্তু সে তখন একরূপ সৈনিকদের ডাক্তারি পদ হইতে অব্যাহতি পাইয়া অন্য কাজে নিযুক্ত হইয়াছে তার জন্য আর ভাবনার কোন-প্রয়োজন নাই—আমরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে সুখে নিদ্রা যাইতাম।

৫। সেপ্টেম্বর মাস গত হইতে না হইতেই গোপনে সংবাদ আসিল যে "তুরস্ক জরমানীর সহিত একযোগ হইয়াছে বলিয়া ইংলণ্ডকে তুরস্কের সহিত এসিয়া খণ্ডে মেসোপোটেমিয়াতে লড়াই করিতেই হইবে। পারস্য উপসাগর ইংরাজদের কবলে রাখিয়া তাহার উত্তর উপকূলে তুরস্কের যে বাসরা নগর আছে সেই খানে ইংরাজদের শিবির স্থাপন করিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধ চালাইতে হইবে। কোহাটে ইতিপূর্ব্বে যে সকল অফিসারেরা ছিলেন বা যুদ্ধারম্ভের সময় আছেন তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের সমস্ত-সারঞ্জাম সহ বাসরায় যাইবেন এবং তথায় পোঁছিয়া জেনেরালের হুকুম মত যুদ্ধের কার্য্য তাঁহাদিগকে করিতে হইবে, সকলকেই গোপনে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে এবং টেলিগ্রাম পাইলেই বাহির হইতে হইবে"।

৬। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে তুরস্ক কেন জরমানীকে যোগ দিল আর কেনই বা ইংরাজদের বিপক্ষে গেল? এই

প্রশ্নের বিষদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে যাইলে বর্ত্তমান ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের ৫০ বৎসরের রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের আলোচনার প্রয়োজন। ততটা না করিয়া, সংক্ষেপে এই বলিলেই চলিতে পারে ঃ—

(১) তুরস্ক দেখিল যে ঐ যুদ্ধে ফ্রান্স, ইংলণ্ড আর রুশিয়া এক দিকে, অপরদিকে জরমানী আর অষ্ট্রীয়া—তুরস্কের এত নিকটে অষ্ট্রীয়া যে ইহাদের দলভুক্ত না হইলেই বিপদ, রুশীয়ার গ্রাস হইতে তুরস্কের রাজধানী কন্‌সটান্টিনোপল বাঁচান তুঃসাধ্য হইবে; জরমানীর দলে তুরস্ক থাকিলে, উহাকে জরমানী রুশীয়ার হাত হইতে রক্ষা করিবেই। (২) জরমানী বহুবৎসর ধরিয়া তুরস্ককে সহানুভূতি দেখাইয়া, উহাদিগকে টাকা ধার দিয়া, উহাদিগের নিকট রণপোত বিক্রয় করিয়া, নিজ জেনেরালদের দ্বারা তুরস্ক সেনানীকে আধুনিক ভাবে গঠন করাইয়া, তুরস্কের ভিতর নিজ আধিপত্য বিলক্ষণ বাড়াইয়া লইয়াছিল। (৩) তুরস্কের পুরাতন সুলতান আবদুল হামিদ তুরস্কের "নূতন দল" দ্বারা বিতাড়িত হইবার পর, ঐ "নূতন দল" ইংরাজদের নিকট যে সহায়তা চাহিয়াছিল তাহা পায় নাই; কাজেই ঐ "নূতন দলের" মনে এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ইংরাজ তাহাদের বন্ধু নয়। (৪) তুরস্ক বরাবরই

মিসরের মালিক—ইংরাজদের মিসরের প্রতি রাজনৈতিক ব্যবহারে তুরস্ক বুঝিয়াছিল যে ইংরাজরা উহাদিগকে কোনমতেই সাহায্য করিতে পারে না। কাজেই তুরস্ক নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই জরমানার দলে যোগ দিয়াছিল।

৭। তুরস্ক জরমানাকে যোগ দেওয়াতে ইংরাজরা ভাবিলেন যে যদি তুরস্ককে এসিয়া খণ্ডে আক্রমণ করিয়া উহার বীর ও রণপটু সেনানীকে না আটকান যায় ত তাহারা জরমানা দ্বারা চালিত হইয়া পশ্চিম ইউরোপে বা ফ্রান্সে গিয়া জরমানাকে সাহায্য করিবে। সেই সাহায্য যাহাতে জরমানা না পায়—তাই ভারতবর্ষ হইতে তুরস্কের এসিয়া খণ্ডের মেসোপোটেমিয়া প্রদেশ সম্পূর্ণ ভাবে আক্রমণ করিবার ও দখল করিয়া লইবার ব্যবস্থা ও বিপুল আয়োজন হইয়াছিল।

৮। মেসোপোটেমিয়া প্রদেশে ইংরাজদের যুদ্ধ চালাইবার ও দখলের চেষ্টার আরও কয়েকটি কারণ ছিল। ঐ প্রদেশের উত্তরে আনাটোলিয়া প্রদেশ এবং তাহার ও উত্তরে টরাস পর্ব্বত শ্রেণী। উহা অতিক্রম করিলেই ক্ষুদ্র বসফোরস-উপসাগরের সম্মুখীন হওয়া যায়। ঐ উপসাগর তুরস্কের ইউরোপীয় প্রদেশের আর তুরস্কের এসিয়া প্রদেশের মধ্যস্থিত।

অল্প আয়াসেই উহা পার হওয়া যায়। ঐ আনাটোলিয়া প্রদেশে আর টরাস প্রদেশে তুরস্ক জরমানীর সাহায্যে দুইখণ্ড বড় বড় রেলের রাস্তা প্রায় তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছিল। ঐ দুই রেলপথ একসঙ্গে মিলিত হইয়া গেলে জরমানীর পক্ষে মেসোপোটেমিয়াতে রেলপথ তৈয়ারী করিয়া উহার উত্তর পশ্চিমে বাঘদাদ আর দক্ষিণ পূর্ব্বে বাসরা, এই দুই স্থান ভেদ করিয়া পারস্য উপসাগরে পৌঁছিতে বিশেষ কষ্ট সাধ্য হইবে না। শত্রুপক্ষীয় কোন শক্তিকে ভারতবর্ষের নিকটে পৌঁছিতে দেওয়া ইংরাজ কখনই পছন্দ করিতে পারেন না।

৯। পারস্য উপসাগরের মাহাত্ম্য অনেক। উহার উপকূলে আর পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অনেক স্থানে পেট্রোলিয়াম বা মোটার গাড়া চালাইবার তৈল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া এক বড় ইংরাজী কোম্পানী অনেক কোটী টাকা ব্যয় করিয়া ঐ সব তৈলের স্থানগুলিতে কারখানা খুলিয়া খুবই বড় রকমের তৈলের ব্যবসা চালাইতেছিলেন ও চালাইতেছেন। ইংরাজদের সমস্ত রণপোতে ঐ তৈল ব্যবহার করা হয়। জরমানী মেসোপোটেমিয়াতে পৌঁছিলে ঐ তৈল পাওয়া বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ।

১০। যদি তুরস্কের সাহায্যে জরমানী একবার রেলপথেই পারস্য সাগরের উপকূলে ইউরোপ হইতে পৌঁছিতে পারে তাহা হইলে ঐ সকল প্রদেশে ইংরাজদের ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র, যুদ্ধের প্রারম্ভেই মেসোপোটে-মিয়া প্রদেশ দখল করিয়া লওয়াই ইংরাজদের পক্ষে শ্রেয়ঃ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করা হইল। এবং ১৯১৪য়ের সেপ্টেম্বর মাস হইতেই ভারতবর্ষ হইতে অল্প-স্বল্প করিয়া যুদ্ধের ফৌজ আসবাব সরঞ্জাম দলে দলে খেপে খেপে অথচ গুপ্তভাবে কারাচী হইতে আরব্য ও পারস্য সাগরদ্বয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাসরা সহরে প্রেরিত হইতে লাগিল।

১১। এই অংশের শেষে একটী ছোট মানচিত্র সংযোজিত হইল। ইহাতে কারাচী হইতে উক্ত সাগরদ্বয় পার হইয়া বাসরা, তথা হইতে মেসোপোটেমিয়া পার হইয়া বাঘদাদ এবং বাঘদাদ হইতে বসফোরাস পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের একটা মোটামুটি আন্দাজ পাঠকগণ পাইবেন। বিশেষভাবে উল্লিখিত স্থানগুলিতে × এই ভাবে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ-তুরস্কের যুদ্ধ ব্যাপার, এই মানচিত্র দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হইবে।

১২। কল্যাণকে কেহ কেহ তার আত্মীয় বন্ধুরা মেসো-পোটেমিয়ার এই যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, চাকরী

ছাড়িয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিল কিন্তু তাহাতে সে কর্ণপাত করে নাই। উত্তরে সে বলিয়াছিল :—"এখন আর সে কাপুরুষের রাস্তা লওয়া চলে না—তাহা হইলে জন-সমাজে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। আমি এখন কুণো হইয়া ঘরে লুকাইয়া বসিয়া থাকিলে সমস্ত বাঙ্গালা জাতিকে অপমান সহ্য করিতে হইবে। আমার দ্বারা ওরূপ নেমক-হারামী কাজ হইতে পারে না। যখন বাঙ্গালা হইয়াও স্পর্দ্ধা করিয়া ইংরাজদের হাত হইতে সম্মানের বা লড়াই করিবার অস্ত্র শস্ত্র, তরোয়াল, বন্দুক পাইয়াছি—যখন আমি লড়ায়ে রাজ-আজ্ঞা পালন করিব বলিয়া শপথ করিয়াছি তখন—আমি পেছ-পা হইয়া, কুণো হইয়া কাজ ছাড়িয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না। আর আমার একটা প্রাণের জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে, ভীরু কাপুরুষ নেমক-হারামের বদনাম খাওয়াইতে পারিব না। আমাদের জাতের সে বদনাম ত আছেই—তবু সেটা কাটিয়ে আমরাও যাতে বীরজাতির ভিতর গণ্য হইতে পারি, আমার সেদিকেও ত দৃষ্টি রাখা দরকার। তোমরা কি বলছ ? একটা প্রাণের জন্য আমার ইজ্জৎ খোয়াইব ? তাহলে ত আমার গলায় দড়ি দিয়ে এখনি কড়িকাঠে ঝুলে পড়া উচিত। ছি ! ছি !"

ঊনত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। কল্যাণ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের প্রলোভনে, যুদ্ধে যাইবার সম্বন্ধে যে অটল রহিল তাহাতে আমাদের মনে আনন্দও হইল আর তার সঙ্গে সঙ্গে উহার জীবনের জন্য ভয়েরও উদ্রেক হইল। কিন্তু ও সব মহৎ ব্যাপারে ক্ষুদ্র মানব নিজেকে ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। তিনিই কল্যাণের মঙ্গল সাধন করিবেন এই বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া আমাতে আর বিনোদিনাতে আমাদের মনে জোর আনিলাম।

২। কল্যাণ খুব উৎসাহে মিলিটারি আফিস অঞ্চল হইতে নিজের সম্বন্ধে হুকুম আনিত এবং সেই মত কাজ করিত। এই সময়ে তাহাকে অনেকবার কোহাটে রাউলপিণ্ডিতে বা জব্বলপুরে—অর্থাৎ সৈনিকদিগের একত্র জমায়েতের স্থানসমূহে—ঘোরাঘুরি করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে সে দিন দশ পনের কলিকাতাতেও কাটাইয়া যাইত।

৩। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাস হইতে নভেম্বর অবধি আমরা ক্রমাগতই জরমান সৈনিকদের সর্ব্বত্রই জয় হইতেছে—

এই খবরই জানিতে পাই। এর ভিতর জরমান বাহিনী প্যারিস নগর আক্রমণ না করিয়া মার্ণ-নদীর তীর হইতে পশ্চাৎ-পদ হইল, এই খবরে আমাদের আশা হইয়াছিল যে হয়ত হঠাৎ যুদ্ধ থামিয়া গিয়া একটা সন্ধির খবর কল্যাণ এদেশ ছাড়িবার পূর্ব্বেই পাওয়া যাইবে।

৪। সেই নভেম্বর মাসে বিনোদিনীর কাছেই কল্যাণের এক কন্যা হয়। বেশ সুন্দরী কন্যা হইয়াছিল। কন্যা হইবার তিন সপ্তাহ পরে প্রসূতির খুব পান্ বসন্ত হয় আর তিনি ভাল হইতে না হইতেই মেয়েটীর ও ঐ রোগ হয়। বিনোদিনীর যত্নে বধূও পৌত্রী সুস্থ হইয়া উঠিল। তখন কল্যাণ বিদেশে; ডিসেম্বর মাসে সে একেবারে কলিকাতায় আসিতে পারে নাই।

৫। তারপর জানুয়ারী মাসে কল্যাণ ও তাহার এক পঞ্জাবী বন্ধু ডাক্তার পুরী দুইজনেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। তাহারা কেবলই যুদ্ধে যাইবার যোগাড় যন্ত্র ব্যাপারে কলিকাতায় মিলি-টারি অফিস্ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইত। ডাক্তার পুরী কল্যাণের সঙ্গে বিনোদিনীর বাটীতেই ছিলেন। কল্যাণের মেয়েটী তখন আড়াই মাসের, সবে একটু একটু হাসতে শিখ্‌ছে।

৬। কল্যাণ তার মেয়েটিকে খুবই ভাল বাসিত, কোলে

করিত, তাকে লইয়া খেলা করিত। ডাক্তার পুরী ও তার সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি ও তাকে আদর করিয়া কোলে পিঠে করিতেন। কল্যাণের কন্যা বলিয়া সে সকলেরই আদরের পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিল। কল্যাণ খুব আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিল "বিনতা"। মেয়ের নাম-করণের পর, মাত্র এক সপ্তাহ কলিকাতায় থাকিয়া কল্যাণ ও ডাক্তার পুরী দু'জনেই পশ্চিমাঞ্চলে দূর দূর সৈনিকদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিতে বাহির হইল।

৭। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কল্যাণ তাহার আসবাব ইত্যাদি—যেখানে যাহা রাখিবার তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। ইহা একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে মার্চ্চ মাসেই কল্যাণকে ও ডাক্তার পুরীকে উহাদের স্ব স্ব রেজিমেণ্টের সঙ্গে কারাচী বন্দর হইতে বাসরার জন্য জাহাজে উঠিতে হইবে—আর কারাচী বন্দর হইতে যেদিন জাহাজ ছাড়িবে তাহার খবর তারে কল্যাণের কাছে পৌঁছিলেই তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া কারাচীর জন্য রেলে চড়িতে হইবে। তাই সে কলিকাতাতেই সেই তার না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিল।

৮। কল্যাণ একে একে সব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়গণের নিকট গিয়া বিদায় ও আশীর্ব্বাদ লইয়া আসিল। এই সময়ে

সে তার মার কাছেই বেশী থাকিত এবং তাঁহাকে নানা রকমে বুঝাইত ; উতলা হইতে নিষেধ করিত। একদিন সে তার মাকে বলিল ঃ—"মা, আমিত তোমার আটাসে ছেলে ? দেখ, ভগবান্ যদি এ যুদ্ধ স্থান হইতে আমাকে নিরাপদে বাঁচাইয়া আনেন তাহা হইলে তুমি বাঙ্গালার মেয়েদের মধ্যে এক বীর-মাতা হইবে। তোমার কত গৌরব হইবে, ভাব দেখি। কাতর হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িও না। মনে প্রবল আশা রাখিও"।

৯। ডাক্তার পুরী ১০ই মার্চ্চ (১৯১৫ খ্রীঃ) কোহাট হইতে কলিকাতায় আসিলেন এবং তিনি আর কল্যাণ দু'জনে দুই দিন ধরিয়া ক্রমান্বয়ে দিনমানের অধিকাংশ-ভাগই কলিকাতার কেল্লায় কাটাইতেন। বৈকালে দু'জনে বাটী ফিরিতেন।

তারপর ১৩ই মার্চ্চ তার আসিল "যেমন আছ অমনি বাহির হও"। তাহার পূর্ব্বদিনে আমি কল্যাণের সহিত বৈকালে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বিনতা তখন বেশ পুট পুটে বিলাতি ডলের মত হইয়া উঠিয়াছে। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর মুখে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া সে একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল। তাই তাকে পুনরায় হাসাইবার জন্য কল্যাণ তাহার মুখের কাছে রুমাল এবং

কমলালেবুর খোসা ঘুরাইতে লাগিল কিন্তু বিনতা তখন আর হাসিল না। তাহাতে কল্যাণ বলিল "বড়মা, দেখছি মেয়েটি বড় গোমড়া হইবে—আমি নিজে কি ও-বয়সে অমনি ছিলাম" ? মেয়ের উপর কত টান বুঝিলাম।

১০। আমি সেই মেয়েটিকে কোলে করিয়া সে সন্ধ্যায় কল্যাণের কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম। তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটী ফিরিলাম। আমার সহিত তাহার সেই শেষ দেখা। তাহার মহাযাত্রার দিন আর আমার সহিত দেখা হয় নাই। এখন তাহার মঙ্গল কামনায় কেবল মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়াছি। ভাবি নাই যে ইহ জীবনে তাহাকে আর দেখিতে পাইব না।

১১। ডাক্তার পুরী আর কল্যাণ ১৩ই মার্চ্চ সন্ধ্যার মেলে আগ্রার জন্য রওয়ানা হন; সেখান হইতে মাউ নগরে পেঁ ৗছিয়া —সেটি সৈনিকদের জমায়েতের একটি কেন্দ্রস্থান—বিনোদিনাকে এক টেলিগ্রাম পাঠান হয়, তারপর একসপ্তাহ বাদে করাচী বন্দরে পেঁ ৗছিয়া বিনোদিনাকে কল্যাণ লিখিয়াছিল :—"বড়মার কাছে গিয়া চিঠি পড়িও। আলাহিদা লিখিবার সময় নাই। এখানে দেশী ও বিলাতি সৈনিকগণ অনেক আসিয়া পড়িয়াছে, একটি হৃদয়বিদারক কথা তোমায় বলি—আমরা যে কি-

ভয়ানক কাজে যাইতেছি তাহা জেন জানিয়াও বুঝিতেছিনা। আমাদের অপেক্ষা পশুরা বেশী বুঝিতে পারিয়াছে। এক হাজার মিউল বা খচ্চড় বাসরায় পাঠাইবার জন্য কারাচীতে আনা হইয়াছে। তাহাদের জাহাজে উঠানের দৃশ্যটী যে কি কষ্টকর তাহা দাঁড়াইয়া দেখিলে প্রাণটা চমকাইয়া উঠে। প্ল্যাটফরম হইতে মিউলদের খোঁয়াড় অবধি পুরু করিয়া ঘাস বিছাইয় দিয়াছে, তবুও তাহাদের খোঁয়াড় হইতে বাহির করে কাহার সাধ্য। শুয়ে পড়িয়া সাম্‌নের পা দু'টা লম্বা করিয়া দিয়া কি কাতর চিৎকার আরম্ভ করিয়া দেয়! ঠিক যেন পায়ে ধরে কাঁদছে মনে হয়।

আগে মিউলের পাল জাহাজে উঠিয়া গেলে, আমাদের অর্থাৎ সৈনিকদের পালকে তোলা হইবে।

মিউলদিগকে হাঁটাইয়া জাহাজে তুলিতে পারিল না। তাদের চার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া, বাঁশে ঝুলাইয়া তুলিতেছে।

আজ তোমাদের "গুড্‌বাই" কল্লুম। আগামী কাল আমাদের জাহাজ বসরার জন্য কাবাচী ছাড়বে। সেখানে পেঁাছাইতে বোধ হয় এক সপ্তাহ লাগিবে।

তোমরা ভাবিও না। বসরায় পেঁাছাইয়া সুবিধা পাইলেই চিঠি লিখিব। ইতি তোমার কল্যাণ।"

১২। চিঠি পড়াইয়া বিনোদিনী স্বগৃহে ফিরিয়া যাইলে আমি সেই রাত্রে কল্যাণের কথা ভাবিতে ভাবিতে তার যুদ্ধ যাত্রার উপলক্ষে আমার খাতায় চারিটি লাইনের ছোট্ট কবিতা লিখিয়া রাখি।

তাহা এই :—

"যাও বৎস,—

যাও কর্ত্তব্যের পথে—হ'য়ে আগুয়ান
যথা কর্ম্ম তথা ধর্ম্ম—তুচ্ছ এ পরাণ—
কর্ম্মের সরল পথ—যা ধরেছ তুমি—
সত্য সেই পথে—ধন্য তব জন্মভূমি॥

মধ্যমাংশ সমাপ্ত।

উত্তরাংশ।

এই অংশে মেসোপোটেমিয়া বা ইরাক প্রদেশে তুরস্ক-ব্রিটিশের যুদ্ধ ও কল্যাণ কুমার তথায় যে যে যুদ্ধে ছিল এবং কি পরিশ্রম ও কষ্ট করিয়া সে তার কর্ত্তব্য, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শেষ অবধি পালন করিয়াছে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। কল্যাণ আর ডাক্তার পুরী অনেক ফৌজদের সঙ্গে কারাচী বন্দর হইতে বাসরা যাত্রা করিল আমরা মধ্যমাংশে দেখিয়াছি। কল্যাণই কারাচী হইতে তাহার শেষ চিঠিতে লিখিয়াছিল যে সম্ভবতঃ উহাদের বাসরায় পোঁছাইতে এক সপ্তাহ কাল লাগিবে। উহারা সমুদ্র বক্ষে দোদুল্যমান জাহাজে গন্তব্য পথে চলুক।

২। এই অবসরে উহারা যে মেসোপোটেমিয়া প্রদেশে যাইতেছে সে স্থানের মাহাত্ম্য কি তাহা সহৃদয় পাঠকের জানা নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আমি উহা যতদূর সম্ভব চুম্বকে ব্যাখ্যা করিব। ব্যাখ্যার মধ্যে নূতন নূতন স্থানের নাম পাইলেই এই পুস্তকের ম্যাপে তাহা দেখিয়া লইবেন।

৩। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০—৪০০০ বৎসর হইতে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে "মেসোপোটেমিয়া" ভূখণ্ড পর পর অনেক সাম্রাজ্যের মাতৃভূমি হইয়া, তাহাদের উত্থান ও পতন দেখিয়াছে; বহু শতাব্দী ধরিয়া সভ্যতা বিস্তারের কেন্দ্র স্থান হইয়াও তাহা স্থায়ী হয় নাই। বিদেশী শত্রুর ঈর্ষায়, দ্বেষে ও সংঘর্ষণে তাহা সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

৪। উত্তরে টাইগ্রীস আর দক্ষিণে ইউফ্রেটীজ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূখণ্ডের নামই মেসোপোটেমিয়া। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় বৈদিক কি উপনিষদাদির যুগে, তখনকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিশালী নরপতিরা ঐ স্থান হইতে অনেক ধন দৌলত লইয়া গিয়াছেন। উহার অন্যতম প্রাচীন নাম "ইরাক"। ইউরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে ইহাকে সেই প্রাচীন নাম দেওয়া হইয়াছে। যতদূর সম্ভব এই পুস্তকে ইরাক নামই ব্যবহৃত হইবে।

৫। ঐ স্থানে সুমেরুয়েরা, আসারিয়েরা, ব্যাবিলোনিয়েরা গ্রীকেরা, পার্থীয়েরা, স্যারাসেনেরা, রোমানরা, পারশীকের, আরবীরা পর পর সাম্রাজ্য স্থাপন ও ভোগ দখল করিয়া গিয়াছে। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলীয়েরা "ইরাক" আক্রমণ করে ও বাঘদাদ দখল করে; এবং ঐ অঞ্চলে শস্যে ও ফসলে জল দিবার যে অতি সুন্দর ও প্রাচীন কেনালের বন্দোবস্ত ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া যায়।

৬। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ টাইমুর লঙ্গ বা ট্যামার লেন ঐ দেশ দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়া বহু সংখ্যক প্রজাকে হত্যা করিয়া যান। লোক সংখ্যা তথায় ঐ কারণে এত হ্রাস হইয়া যায় যে তাহার ২০০ শত বৎসর পরেও "ইরাকের" নাম

গন্ধ পাওয়া যায় না। তারপর ঐ দেশ লইয়া ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ চলে। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" ইহারই স্বার্থকতা বজায় রাখিয়া পারস্য হটিয়া যায়।

৭। তার পর হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'ইরাক' তুরস্ক সাম্রাজ্যের একটী প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। ইউরোপীয় যুদ্ধান্তে উহা কিছুদিন ইংরাজদের তত্ত্বাবধানে থাকে। তারপর ঐখানকার এক সম্ভ্রান্ত "সেখ" বা চীফ্ "ইবন ফাইজলকে" 'ইরাকের' রাজা করিয়া রাখা হইয়াছে। "ইবন ফাইজল" বরাবরই তুরস্কের বিপক্ষে আর ইংরাজদের বন্ধুভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

৮। যে প্রদেশকে মেসোপোটেমিয়া বা "ইরাক" বলা হয় তাহা দুই অংশে বিভক্ত :—

"উচ্চ" আর "নিম্ন"। "বাগ্দাদ" হইতে ৩৭৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে "রাসেল-আইন" পর্য্যন্ত উচ্চ ইরাক। উহারও উত্তরে টাইগ্রাস আর দক্ষিণে ইউফ্রেটীজ প্রবাহিত। যেখানে "রাসেল-আইন" সেখানে ঐ দুই নদীর ব্যবধান ২০০ শত মাইলের কম হইবে না। ঐ দুই নদী পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বাগ্দাদের নিকট বিশেষভাবে মিলিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তাহা না

পারিয়া যেন নিজেদের মধ্যে রাগারাগী করিয়া ৬০ কি ৬২ মাইল ব্যবধান রাখিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সমুদ্রাভি-মুখে ছুটিয়াছে। উহারা মিলিত হইয়াছে বিখ্যাত "বাসরা" সহরের দক্ষিণে। ঐ যুক্ত বেণীর নাম "শাটেল আরাব"। উহা প্রস্থে ১৷৷০ মাইল আর লম্বে বাসরা হইতে ৬২ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া "ফাও" নামক স্থানে সাগরে পড়িয়াছে। বড় বড় জাহাজ অনায়াসে "ফাও" হইতে বাসরার নিকট অবধি যাইতে পারে। "বাগ্‌দাদ" হইতে "ফাও" পর্য্যন্ত "নিম্ন ইরাক ;" উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫০ মাইল।

৯। 'উচ্চ আর নিম্ন' দুই ইরাকের আবহাওয়া খুবই খারাপ ; কলেরা, প্লেগ ত লাগিয়াই আছে। ভাল পানীয় জলের বিশেষ অভাব। মাটির উপর দিয়া যাতায়াতের ভাল রাস্তা নাই। বৃষ্টি সেখানে খুব কমই পড়ে। নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের ভিতর যে সকল প্রাচীন কেনাল ছিল তাহা বন্ধ হইয়া গিয়া শুষ্ক জঙ্গলী অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এক এক শুষ্ক কেনালে কোটি কোটি ব্যাঙের বাসা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িলে, কিংবা নদীদ্বয়ের ভিতর অধিক জল আসিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে, ঐ সব শুষ্ক কেনাল জলে ভরিয়া যায়। জল নির্গমের ভাল পথ নাই। ডোবার জল ডোবাতেই শুষ্ক হইতে

দেওয়া হয়। দেশে ম্যালেরিয়া আর মশার বিরাম নাই। বৃষ্টি পড়িলে কিংবা নদীর জলে দেশ ভাসাইয়া দিলে যে কাদা হয় তাহাতে এক রকম আঠা আঠা ভাব—লোকে চলিতে ফিরিতে পারে না। রাস্তার দু'ধারে ডোবার ধারে সর্ব্বত্রই খেজুর গাছ।

১০। বাসরা সহর শুনা যায় যে খালিফ হারুণ আল রসিদের সময়ে তাঁর গোলাপ-বাগ ছিল। বাসরার গোলাপ ত জগৎময় প্রসিদ্ধ কিন্তু তাহার চিহ্ন মাত্র সেখানে নাই। নগর ও বন্দর অতি প্রাচীন; কিন্তু এমন ভাল ভাল কি বড় বড় বাড়ী নাই যেখানে আজকালকার সভ্য ভদ্রলোকেরা থাকিতে পারেন। এমন বড় বড় গুদাম ঘর নাই যেখানে প্রচুর মাল বা আসবাব পত্র রাখা যায়। এমন মস্ত খোলা মাঠ নাই যেখানে তাঁবু গাড়িয়া অনেক সৈন্য সামন্ত রাখা চলে। বেশী মাত্রায় সৈন্য সামন্ত বাসরায় লইয়া যাইলে, নদীর কূলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে গ্রামে তাহাদিগকে অল্প অল্প সংখ্যায় ভাগ করিয়া তাঁবু গাড়িয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়।

১১। এ সকল অসুবিধা সত্বেও ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিবার বহু পূর্ব্ব হইতে ব্যবসা বাণিজ্য ও কারবার করিবার জন্য অনেক ইংরাজী প্রজা ও ভারতবর্ষীয় প্রজা বাগদাদে ও

বাসরায় বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ভারতের কারাচি বন্দর আর ইরাকের বাসরা বন্দরের মধ্যে মালপত্র লইয়া বড় বড় জাহাজ ঘনঘনই যাতায়াত করিত।

১২। "শাটেল-আরাব"নদীর মোহানা "ফাওতে" ঢুকিয়া অল্প কয়েক মাইল উত্তরবাহিনী হইলেই ঐ নদীর বাম কূলে "আবাদান" বন্দরের নাম ম্যাপে দেখিতে পাইবেন। ওখান হইতে ১৫০ শত মাইল উত্তরে, পারস্য রাজ্যের মধ্যে, কিন্তু সন্ধিও করদসূত্রে ইংরাজদের দখলী প্রেট্রোলিয়ামের অনেক খনি আছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ইংরাজ সেখানে ঐ প্রেট্রোলিয়াম তোলাই সাফাই ও চালান করিবার সুবৃহৎ কল কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১৫০ মাইল লম্বা পাইপে করিয়া ঐ তৈল আবাদানে বড় বড় গুদামে পৌছে আর ঐ তৈলের বড় বড় জাহাজ বন্দরে পৌছিলে উহা ভর্ত্তি করিয়া ঐ তৈল চালান দেওয়া হয়। ইংরাজরাজের সমস্ত রণ-পোত নাকি ঐ তৈলে চালিত হয়। আবাদানেও ইংরাজ ও ভারতের প্রজার অনেক বসতি।

১৩। এই তৈল বিনা বিঘ্নেও রীতিমতভাবে পাইবার জন্য ইংরাজ রাজ অবশ্যই দেখিতে বাধ্য যাহাতে জগৎ জোড়া যুদ্ধের অনল তুরস্কে আর পারস্যে প্রবেশ না করে; আর যাহাতে

শাটেল্ আরাবে যাতায়াতের পথ পরিষ্কার থাকে। ঐ পথ রোধ করিতে তুরস্ক চেষ্টা করিলেই ইংরাজ তুরস্কে যে যুদ্ধ হইবে তাহা নিশ্চিত। আর তাহাই ঘটিল।

১৪। ঐ জগৎযোড়া যুদ্ধে তুরস্ক না যোগ দিলে, বা যোগ দিয়া জরমানীকে ইংরাজদের বিপক্ষে সহায়তা না করিতে চেষ্টা করিলে, নিজেরই হিত সাধন করিতেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের অনল ইউরোপের চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন তুরস্ক জরমানীর উপর অর্থবলের জন্য, সৈনিকদিগকে সংগঠনের জন্য আধুনিক যুদ্ধশাস্ত্র সৈনিকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এতই নির্ভর করিত যে তুরস্কের পক্ষে জরমানীর প্রলোভনে না পড়া বা জরমানীর হুকুম মত কাজ না করা একেবারেই খাটিত না।

১৫। "আবাদান" বন্দর ছাড়িয়া নদীপথে আরও কয়েক মাইল যাইলে ম্যাপে দেখিবেন "কারুণ" নদী। পারস্যের খুজিস্থান ও আরবিস্থান প্রদেশ দ্বয়ের ভিতর দিয়া আসিয়া, উহা শাটেল্-আরাবে "মোহাম্মেরা" বন্দরের নিকট মিলিত হইয়াছে। পারস্যে যাইবার জন্য ঐ "মোহাম্মেরা" বন্দরে নামিতে হয়—আর ঐ "কারুণ নদী" ধরিয়া যাইতে হয়। পারস্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের কারবার চালাইবার পথ ঐ। ওখানেও অনেক ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় প্রজার বসতি। এই

কারণেও ইংরাজ রাজের পক্ষে "শাটেল-আরাবের" পথ যাহাতে রুদ্ধ না হয় তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা ঐ যুদ্ধারম্ভের সময় খুবই কর্ত্তব্য। এবং তদনুরূপই কার্য্য ইংরাজ রাজের কর্ম্মচারারা করিয়াছিলেন।

১৬। ইংরাজদের তরফে তাঁহাদের নায়েব ও মন্ত্রীর প্রতিনিধি স্বরূপ বড় বড় কর্ম্মচারী তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে, বাগ্‌দাদে, বাসরায়, পারস্য সম্রাজ্যের উপকূলে বুসায়ারে, টেহেরাণে, মোতায়েন থাকিতেন আর যখন ইউরোপীয় যুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিল তখনও ছিলেন।

একত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। স্মরণীয় ৪ঠা আগস্টে (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে) যখন যুদ্ধের অনল ইউরোপ খণ্ডে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, যখন কোনও বাধা না মানিয়া জরমানীর লক্ষ লক্ষ সেনানী বেলজিয়াম ভেদ করিয়া প্যারিস অভিমুখে দলে দলে রণ-রক্ত-মুখী ও উন্মাদ হইয়া ছুটিতে ছিল, তখন হইতে বিলাতের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, "তোমাদের যা কিছু ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈনা-সামন্ত আছে তাহা যত শীঘ্র পার ইউরোপ খণ্ডে, ফ্রান্সে পাঠাইয়া দাও।"

২। সেই জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার যোগাড়ে ব্রতী হইলেন এবং যে দল ফ্রান্সে যাইবে তাহা "এ" ফোর্স নামে অভিহিত হইয়া যাইবে এইরূপ হুকুম জারি করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে আর এক দল "বি" ফোর্স নামে মিসর দেশে যাইবে—তথায় সুয়েজ কেনাল রক্ষা করিতে—তার হুকুম ও জারি হইল।

৩। ইরাক হইতে ১৪ই আগস্টের মধ্যে খবর আসিল যে সেখানকার অবস্থা এতই সংগীন যে—তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে

লড়াই করিবে বলিয়া মোল্লাদের দ্বারা সর্ব্বত্র "জেহাদ" হাঁকিতেছে আর বাগ্‌দাদে, বাসরায়, মোসলে, প্রত্যেক স্থান হইতে ত্রিশ হাজার করিয়া সৈনিক যোগাড় করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। যে কোম্পানির জাহাজে বাগ্‌দাদ হইতে ইংরাজ প্রজা বাসরা যাইতে পারিত সে কোম্পানির নিকট হইতে তুরস্কের কর্ম্মচারীরা কয়লা, তৈল সব কাড়িয়া লইয়াছে। এক পুরাতন জরমান জাহাজে বালি আর পাথর ভর্ত্তি করিয়া তাহাকে 'শাটেল-আরাব' নদীতে ডুবাইয়া ঐ জলপথ বন্ধ করিবার আয়োজন চলিতেছে—শীঘ্রই তুরস্ক ইংরাজদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিবে। বাগ্‌দাদের ও বাসরার ইংরাজরাজের প্রতিনিধিরা—বড় বড় কর্ম্মচারীরা উপর্য্যুপরি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট সৈন্য-সামন্ত তথায় চট্‌ পট্‌ পাঠাইবার জন্য তার পাঠাইতে লাগিলেন।

৪। ঐ সকল রাজ প্রতিনিধিরা ও কর্ম্মচারীরা শশব্যস্ত হইয়া বিলাতেও তার পাঠাইতে লাগিলেন। ইরাকের ব্রিটিশ প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য—আবাদানের তেলের পাইপ রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য পাঠাও, রণপোত পাঠাও এই মর্ম্মে বিলাত হইতে ও তার আসিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অথচ বিলাতি তারে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া ছিল

যে "দেখ যা করিবে তাহা অতি গুপ্ত ভাবে—যেন তুরস্ক কিংবা ভারতের মুসলমান প্রজারা টের না পায়—কারণ, এখনও তুরস্ক প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, হয়ত সে যুদ্ধে যোগ নাও দিতে পারে।"

৫। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগাড় করিয়া উঠা অতীব বৃহৎ ব্যাপার। ভারত গভর্ণমেণ্ট খুবই শীঘ্র শীঘ্র "এ" ফোর্সের সৈন্য-সামন্ত ইউরোপ খণ্ডে পাঠাইতে, আর "বি" ফোর্সের সৈন্য-সামন্ত মিসরে পাঠাইতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন কিন্তু দুই মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। ঐ দুই মাসের মধ্যে প্রত্যহই তারে বিলাত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যুদ্ধের খবর আসিয়াছে আর সুবিজ্ঞ উপদেশও আসিয়াছে যে—এই করিবে ঐ করিবে, তুরস্কের সম্বন্ধে, ইরাকের সম্বন্ধে, ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্বন্ধে, আবাদানের তেলের পাইপ বাঁচাইবার সম্বন্ধে।

৬। ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তা তখন বড়লাট লর্ড হার্ডিং। আর জঙ্গি-লাট বা কমাণ্ডার-ইন-চীফ স্যার বীচাম ডফ্। তাঁহাদের মতে, ২রা অক্টোবরে, ঠিক হইল, ঐ "এ" ফোর্স বোম্বাই হইতে ১০ই অক্টোবরে ইউরোপের জন্য যাত্রা করিবে; আর তাহারি সঙ্গে গুপ্তভাবে একদল সৈন্য "ডি" ফোর্স নামে অভিহিত হইয়া যাইবে এবং ঐ "ডি" ফোর্সের গন্তব্য স্থান "বসরা"

—"ফ্রান্স" নহে, তাহা মাঝ সমুদ্রে উহাদিগকে জানাইয়া উহাদিগের মধ্যে কতক কতকগুলিকে জাহাজে করিয়া সেই স্থানে পৌঁছাইতে হইবে।

৭। তারপর "এ" ফোর্স পাঠাইতে দেরি হইয়া যাওয়াতে সে খবর এখান হইতে বিলাতে পাঠান হয় এবং প্রকাশ্যভাবে বিলাতকে বলা হয় যে "যে ফৌজ এখান হইতে বসরা যাইবে তাহাতে কুলাইবে কি না কুলাইবে—আমরা এখান হইতে বিবেচনা করিতে অক্ষম"—আর এই মর্ম্মে প্রশ্নও করা হয়—"আমরা এখান হইতে তুরস্ককে আক্রমণ করিতে যাইতেছি, যুদ্ধ বাধিলে তোমরা কি বিলাতের অ্যাডমিরালটি আফিস হইতে চালাইবে না আমরা এখান হইতে চালাইব?"

তাহার উত্তরে বিলাত বলেন "তোমরা যে লোকজন এখন "ডি" ফোর্স বলিয়া পাঠাইতেছ উহা কেবল আবাদানের তেলের ট্যাঙ্ক আর পাইপ রক্ষা করিবার জন্য; ইহার পরে যদি বস্তুতঃই তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তখন যে বড় গোছের সৈন্য-দল যাইবে তাহা তাহাদের স্থলে নামিতে সাহায্যের জন্য। ভারত হইতে তোমাদিগকেই তুরস্কের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ যাহা হয় তাহা চালাইতে হইবে। কি পরিমাণে তোমরা চালাইবে তাহা পরে জানিতে পারিবে। এই সমস্ত মনে রাখিয়া ধীরে ধীরে

রেলপথে ও জলপথে করাচী বন্দরে সৈনা সামন্ত আর খচ্চড় সমবেত করিয়া রণ সজ্জায় প্রস্তুত হইতে থাক।"

৮। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবরে ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল ডিলামেন সাহেবকে 'ইরাক' আক্রমণের নেতা মনোনীত করিয়া তাঁহাকে এই হুকুম করিলেন "যে—"এ" ফোর্স বোম্বাই হইতে ১৬ই অক্টোবরে ইউরোপে যাইবার জন্য যাত্রা করিবে সেই সঙ্গে তুমি "ডি" ফোর্সের নায়ক হইয়া যাত্রা করিবে। তোমার অধান "ডি" ফোর্সকে মাঝ-সমুদ্রে "এ" ফোর্স হইতে পৃথক করিয়া লইয়া তুমি উহাদের সঙ্গে পারস্য সাগরে যাইবে। পারস্য সাগরে বিহারিণ দ্বীপ-খণ্ড যাহা ব্রিটিশ অধিকারে আছে, তুমি সেই খানে তোমার দলবল লইয়া খবর লইবে যে তুরস্ক আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে কতদূর প্রস্তুত। যে মত বুঝিবে সেই মত করিবে। তোমার সাহায্যের জন্য এখান হইতে আর একদল সৈন্য-সামন্ত শীঘ্রই পাঠান হইতেছে। তুমি দেখিবে যে পারস্য সাগরের মাথার উপর ব্রিটিশ রাজের যে হক্ ও স্বার্থ আছে তাহা যেন বজায় থাকে; মোহাম্মেরার সেখ আমাদের বন্ধু, তাঁহাকে সাহায্য করিবে—আর যুদ্ধ বাধিলে, বসরা রক্ষার জন্য যাহা যাহা করিতে হয় তাহা করিবে।"

৯। বোম্বাই সহরে জেনেরাল ডিলামেন সাহেবের হস্তে ১৩
অক্টোবরে সিমলার মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের একজন বিশ্ব
কর্ম্মচারী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ হুকুম দেন। ১৬ই অক্টোব
পূর্ব্বোক্ত "এ" ফোর্স, "বি" ফোর্স এবং তাহাদের সঙ্গে গুপ্তভা
মিশ্রিত "ডি" ফোর্স সব এক সঙ্গে বার খানা বড় বড় সৈনিক
দের জাহাজে করিয়া বোম্বাই হইতে রওয়ানা হয়। তাহাদিগকে
আগলাইয়া ব্রিটিশ রণপোতও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

তিন দিন ঐ সকল জাহাজ জল পথে চলিবার পর মাঝ সমুদ্রে
ব্রিটিশের আর এক রণ-পোত দেখা দেয়। তখন ডিলামেন
সাহেবের কর্তৃত্বে "ডি" ফোর্সের সৈন্য সামন্তকে চারি
খানি জাহাজে পৃথক ভাবে ঐ দ্বিতীয় রণপোতের সঙ্গে উত্তরাভি
মুখে চালান করা হয়। পরদিন প্রকাশ করা হইল
যে উহাদের গন্তব্য স্থান পারস্য সাগরস্থিত বেহারিন দ্বীপ।
দু'দিন পরে তথায় পৌঁছিয়া দেখা গেল যে, যে সকল কামান ও
অস্ত্রশস্ত্র উহারা সঙ্গে আনে নাই, তাহা আর এক জাহাজে
আর এক রণপোতের সঙ্গে করাচী বন্দর হইতে তথায় পাঠান
হইয়াছে।

১০। প্রথমে ডিলামেন সাহেব তাঁহার অধীনস্থ
৫০০০ সহস্র সৈন্য আর ১২০০ শত খচ্চড় নদীর মোহানা

'ফাও''র কাছে নামাইবার সংকল্প করেন; কিন্তু যে ভাবে তুরস্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে আর উহাদের সৈন্য সংখ্যা যে ইংরাজদের অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা টের পাইয়া ফাওতে আর সৈন্য নামাইলেন না।

১১। ৩১শে অক্টোবর তার যোগে ডিলামেন সাহেব ভারতবর্ষ হইতে খবর পাইলেন যে—তুরস্ক রুশিয়ার ''ওডেসা'' বন্দর আক্রমণ করিয়া, সেখানে কামান মারিয়া অনেক ক্ষতি করায় ঐদিন বিলাতে তুরস্কের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে। সেই তারেই ডিলামেন সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে "এখনি তুরস্কের সঙ্গে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিয়া দাও।"

১২। বিলাত হইতে তার যোগে প্রত্যেক রণ-পোতগুলির উপর এই মর্ম্মে হুকুম আসিল যে :—''তুরস্ক আমাদের তেলের ট্যাঙ্ক এবং পাইপ ইত্যাদি নস্ট করিবে বলিয়া যে সকল কামান সাজাইয়াছে তাহা ধ্বংস করিবে, রণ-পোত ''এস্পীগল্''—আর ব্রিটিশদের স্বত্ব ও হক কায়েম রাখিবে।''

''জেনেরাল ডিলামেন সৈন্য-সামন্ত লইয়া বেহারিন দ্বীপ হইতে আসিতেছেন, তাহাদিগকে আগলাইয়া নদীর ভিতর লইয়া যাইবে এবং ''ফাও'' দখল করিতে সাহায্য করিবে,—রণপোত "ওডিন"।

"পারস্য কূলে বুসায়ারে থাকিয়া 'ওয়্যারলেসের' খবর যাহাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পাই তাহা দেখিবে, রণপোত "ডালহউসি" যতদিন অবধি "ফাও" দখল না হয়; পারস্য সাগরে যত কিছু ছোট বড় ষ্টিমার পাইবে—পাকড়াও করিয়া তাহাদের উপর ছোট ছোট কামান সাজাইয়া আপন লোক দিয়া নদীর মুখে পাঠাইয়া দিবে; শত্রুকে ভাল করিয়া শাস্তি দিবে; মোহাম্মেরার সেখকে আমাদের মন্তব্য জানাইয়া আশ্বস্ত করিবে এবং বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবে যে আমাদের উদ্দেশ্য নদীর পথ খুলিয়া রাখা যাহাতে বাণিজ্য কারবার নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকে।"

ভারতে বড় লাটের উপর বিলাত হইতে তারযোগে হুকুম আসিল যে— পারস্য সাগরে বেহারিন দ্বীপে যে ব্রিগেড (৫০০০ হাজারে এক ব্রিগেড) ডিলামেনের অধীনে গিয়াছে উহাদিগকে বল যে রণপোতগুলি এক সঙ্গে করিয়া তাহাদের সাহায্যে যেন এখনি "ফাও" দখল করিয়া লয়।

১৩। জেনেরাল ডিলামেন জাহাজে সসৈন্যে শাটেল আরাবের মোহানায় ৩রা নভেম্বরে বেলা ৪॥টায় পৌঁছিলেন রণ-পোত "ওডিন" উঁহাদের সহিত সেইখানে দেখা করিল সেইদিন ভোর ৪টা রাত্রে রণ-পোত "এস্পীগল" কারুন ন

হইতে—লুকায়িত ভাবে নিজের আলো বন্ধ করিয়া, "শাটেল আরাবে" বাহির হইয়া পড়িল। তুরস্কেরা তাহা দেখিতে পাইল না। "এস্পীগল" মোহাম্মেরার দক্ষিণে আসিয়া— মাঝ দরিয়াতে নঙ্গর ফেলিয়া দাঁড়াইল। উহা আবাদান আর মোহাম্মেরা বন্দরদ্বয়কে আগলাইবে আর তুরস্কের ছোট ছোট জাহাজগুলিকে ডুবাইবে ; দুই কাজই হইবে।

১৪। ডিলামেন সাহেব ৪।৫ নভেম্বর স্থির করিলেন যে প্রথমে রণ-পোত দ্বারা কামান দাগিয়া তুরস্কের ফাও দুর্গের কামান সব জখম করাইবেন আর তারপর দুর্গ হইতে ফাও গ্রামের চার মাইল দূরে জাহাজের সৈন্য-সামন্তকে নামাইয়া দিবেন। ডিলামেন যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন কার্য্যেও সেইরূপই হইল। ফাও দুর্গ চূরমার হইয়া গেল। তথাকার তুরস্ক সৈন্য পলাইতে আরম্ভ করিল। খুব সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্রিটিশ সেনানী ফাও গ্রামের দক্ষিণে নামিল এবং বসরা সহর আক্রমণ ও দখল করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বসরা বিনা যুদ্ধে অক্লেশে দখল হইল।

১৫। ঐ আক্রমণের সময় বস্তুতঃ ইংরাজদের সঙ্গে তুরস্ক-ফৌজদের মাত্র দুই পল্লীগ্রামে যুদ্ধ হয়—ঐ দুই পল্লী-গ্রামের নাম "সৈহান" ও "সাহিল"। ঐ দুই লড়ায়ে তুরস্কের

লোকবল ইংরাজদের অপেক্ষা অধিক থাকা সত্বেও তুরস্কের সৈনাধ্যক্ষ ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দেন; তারপর নিকটবর্ত্তী টাইগ্রীশ উপরস্থিত "কুরণা" সহরে ফৌজদের সমবেত না করিয়া উহাদের লইয়া যান প্রায় ৮০ মাইল দূরে ইউফ্রেটীজ নদী কূলস্থ "নাসিরিয়া" গ্রামে।

ঐখানে পৌঁছাইতে তুরস্কের পলাতক ফৌজরা আরও জখম হইয়া যায়। যদিও কতক কতক তুরস্কের ফৌজ তখন "কুরণার" নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ছিল—কিন্তু তাহারা কেহই ইংরাজদের আক্রমণ রোধ করিতে চেষ্টা করে নাই। তুরস্কের তরফে যিনি কুরণায় সৈনাধ্যক্ষের কাজ করিতেন তিনি নাকি দেখিতেই পান নাই যে ইংরাজ-সৈন্য টাইগ্রাশ পার হইয়া "কুরণা" দখল করিতে আসিতেছে।

১৬। ইংরাজ সৈন্য সহজেই "কুরণা" দখল করিল আর তুরস্কের সৈন্যগণ তাহাদের পরিচালকদের দোষে পলাইয়া বাঁচিল। উহাদিগকে দূর দূর গ্রামে রাখা হইল, কতক টাইগ্রীশের কূলে, কতক ইউফ্রেটীজের কূলে আর কতক আরবিস্থান প্রদেশে।

তখন ডিসেম্বর মাস পড়িয়াছে—শীতের প্রকোপ খুব বাড়িয়াছে। এই সময় তুরস্কের মিলিটারী হেড আফিস কনষ্টান্টিনোপল হইতে ইরাকের হেড আফিসে হুকুম আসিল যে

"তোমরা দূর দূর গ্রামে সৈন্যগণকে সরাইয়া রাখিও না—প্রতিহাতে শত্রু-ইংরাজকে স্থান দখল করিতে বাধা দিবে—স্থান দখলের পরেও শত্রুকে নিশ্চিন্ত হইতে দিবে না। আমরা এখান হইতে শীঘ্র বাছা বাছা সৈন্যের অনেক দলবল আর ভাল ভাল অস্ত্র শস্ত্র পাঠাইতেছি ইংরাজকে হঠাইয়া দিবার জন্য।" কিন্তু ঐরূপ হুকুম ইরাকের মিলিটারী কর্ত্তারা মানিয়া চলেন নাই।

১৭। তুরস্কের মিলিটারী হেড আফিসের একজন সুবিজ্ঞ কর্ম্মচারী, নাম বিস্মাসা মহম্মদ আমান, এই তুরস্ক-ব্রিটিশ যুদ্ধ ব্যাপারে যে রিপোর্ট প্রকাশ্য ভাবে ছাপাইয়াছেন তাহাতে তখনকার সর্ব্বোচ্চ ইরাকের সৈন্যাধ্যক্ষ সুলেমান আসকারীকে অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

ঐ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে যখন ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে তখন আসকারী কনস্টান্টিনোপলে ছিলেন আর সেখানকার মিলিটারীর কর্ত্তারা সম্পূর্ণ ভাবে আসকারীর কথার উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছিলেন। উনিই আশা ভরসা দিয়াছিলেন যে ইংরাজকে সম্পূর্ণ ভাবে ইরাক্ হইতে তাড়াইতে উনি পারিবেন। পরে ইরাকের সৈন্যদ্বারা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আক্রমণ করা যাইতে পারিবে। এমন কি যখন ইরাকের সৈন্যগণকে সাহায্য দিবার জন্য,

আলেপো হইতে তাজা সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব আসকারীর কাছে করা যায়—উনি সে সাহায্য লইতে সম্মত হয়েন নাই বরং বলেন যে সাহায্য করিবার সেনানী যদি পাঠাইতে চাও তাহা হইলে উহাদিগকে তুরস্ক-পারস্য সীমান্তে লুরিস্থানের উত্তর সহর কেরমানশাতে পাঠাইয়া দাও।

আমীন সাহেব তাঁহার রিপোর্টে আরও লিখিয়াছেন যে ঐ আসকারীর দোষে হেড্ আফিসে তুরস্ক-ব্রিটিশ সংঘর্ষণের প্রথম অবস্থায় এই ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মায় যে তাতার হইতে লড়ায়ে ঘোড়-সওয়ার আর অষ্ট্রীয়া ও আরব হইতে সৈন্য পঙ্গপালের মত ইরাকের পূর্ব্বাংশ ছাইয়া ফেলিয়া ইংরাজকে পারস্য সাগরে ডুবাইয়া দিবে; ইরাকের রক্ষণাবেক্ষণ ইরাক নিজে বেশ করিতে পারিবে।

দ্বাত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। যদিও জেনেরাল ডিলামেন সাহেব খুব কৃতিত্বের সহিত টাইগ্রীসের উপর কুরণা বন্দর দখল করিলেন, বসরা দখল করিলেন, তথাপি উঁহাকে আরও জোর দিবার দরকার হইয়া পড়ায় উঁহার উপর-ওয়ালা কর্ম্মচারী লেফটেনাণ্ট জেনেরাল ব্যারেট সাহেব আরও সৈন্য সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ভারতবর্ষ হইতে সেই ডিসেম্বর মাসে বসরায় গিয়া পৌঁছিলেন এবং তখন হইতে তথায় যুদ্ধ চালাইবার কর্ত্তা তিনিই হইলেন।

২। "কুরণা" বন্দর বসরা হইতে প্রায় ৫০ কি ৬০ মাইল উত্তরে। আগুয়ান হইয়া উহা ইংরাজদের কবলে না রাখিলে, বসরাকে তুরস্কের হাত হইতে নিরাপদে রাখা সম্ভবপর নহে। এই যুক্তির জোরেই "কুরণা" দখল করা হইল। কুরণা দখল করিয়া ইংরাজ স্থির থাকিতে পারেন নাই। উঁহারা বুঝিয়া ছিলেন যে তুরস্ক সৈনা-সামন্ত যোগাড় করিয়াই, উঁহা-দিগকে কুরণা হইতে হঠাইয়া দিবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিবে।

৩। সেই ডিসেম্বর মাস হইতেই ব্যারেট সাহেবের

সহিত ভারতগভর্ণমেণ্টের তার যোগে ও চিঠিতে এবং তার যোগে বিলাতের রাজ মন্ত্রীদের বিশেষ ভাবে পরামর্শ চলিতে লাগিল যে কি করিয়া এক্ষণে ব্রিটিশ ইজ্জৎ, ব্রিটিশের দখল ইরাকে কায়েম থাকে আর তুরস্ক কোন মতে ব্রিটিশকে হঠাইয়া দিতে না পারে।

৪। জেনেরাল ব্যারেট সাহেবের মতে স্থলপথে বাগ্‌দাদে সসৈন্যে পৌঁছাইবার চেষ্টা করা বৃথা। স্থলপথে ভয়ানক জলকষ্ট। খচ্চড়ের দল—যুদ্ধের মাল, আসবাব, কামান ইত্যাদি অত দূর-পথ জলকষ্টে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না; উহারা পথে পড়িয়া মরিবে আর শত্রুপক্ষে শত্রুতা করিতে সাহস পাইবে। তাঁর মতে বাগ্‌দাদ অধিকার করা যুক্তিযুক্ত হইলেও খুব ধীরে ধীরে করিতে হইবে। কুরণাতে খুব পাকা করিয়া বসিয়া একে একে দুই নদীর উপরের স্থানগুলি যথা "নাসিরিয়া," "আমারা," "কুতেল-আমারা" ব্রিটিশদের কবলে আনিতে হইবে। ঐসব স্থানেও ভাল করিয়া, পাকা করিয়া, কামান ও সৈন্য বসাইয়া তারপর লক্ষে লক্ষে বাগ্‌দাদ পৌঁছিতে হইবে। হালকা এবং অগভীর-নদীর জলে চলিতে পারে এইরূপ ছোট ছোট অনেকগুলি কামান সাজান রণপোত চাই। যাহা হাতে আছে তাহাতে কুলাইবে না। বিলাতি হইতে তৈয়ারি

করাইয়া ঐ সকল পাঠাইতে হইবে আরও অধিক সৈন্য পাঠাইতে হইবে।

৫। ব্যারেট সাহেবের পরামর্শ যে খুব বিজ্ঞতাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাতের ও ভারতের গভর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ভাল মত সমর্থন করা এক কথা আর ভাল মতের মত কাজ করিয়া উঠা আর এক কথা।

বড়লাট হার্ডিং ভারত হইতে আবাদান মোহাম্মেরা, বসরা, কুরণা ইত্যাদি স্থান সমূহ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন আর ব্যারেট সাহেবকে সমর্থন করিয়া বিলাতে জানাইলেন এবং সেই সময়ে বিলাতকে স্পষ্টই বলিলেন যে "তোমা-দিগকে ইউরোপে সাহায্য করিতে ভারত হইতে এত সৈন্য সাজসজ্জা আমরা পাঠাইয়াছি যে ভারত নিজেকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। এখান হইতে আর একটীও সৈনিক ইরাকে যাইতে পারেনা। যাহা তোমরা বিলাত হইতে করিতে ইচ্ছা কর—তাহা করিও। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, আফ্রিদী বা আফগান অঞ্চলে কোনও গোলমাল উপদ্রব উপস্থিত হইলে কি করিয়া ভারত রক্ষা করিব আমরা সেই ভাবনায় বিব্রত।"

৬। ইরাক খণ্ডে তুরস্ক-ব্রিটিশ যুদ্ধ ব্যাপারে তিনটি বিষয় মনে রাখা উচিত; তাহা এই ঃ—(১) ইরাক আরবের এত নিকটে যে ইরাকে আরবী প্রজার বসতিই অধিক—তাহারা তুরস্কের প্রজা হইয়াও তুরস্কের রাজ-কর্ম্মচারীদের উপর ভয়ানক চটা। উঁহাদের দাম্ভিকতা, লাট সাহেবী—আরবী প্রজার পক্ষে অসহ্য। (২) আরব-তুরস্কের সীমান্ত প্রদেশ সমূহে অনেক বড় বড় ধনাঢ্য আমীরদের অধিকার। ঐ সব আমীরে আমারে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা,হিংসা, শত্রুতা, লড়াই, ঝগড়া বারমাসই লাগিয়া আছে। উঁহারা একপ্রকার স্বাধীন ভাবের জমীদার। নিজেদের অনেক লোক সংখ্যা, সৈন্যবল। তাঁহাদের নিজ নিজ খাস-জমিনে অনেক খেজুর গাছের চাষ। উঁহারা তুরস্কের ও ব্রিটিশদের সাহায্যে ইরাক হইতে খেজুর বিক্রয়ের জন্য জাহাজে করিয়া চালান দিয়া অনেক অর্থ সালিয়ানা উপায় করিয়া থাকেন। সেইজন্য উঁহারা তুরস্ককে খাজনা বা সেলামী দিয়াও থাকেন। ঐ লইয়া আমীরদের সঙ্গে তুরস্কের রাজ-কর্ম্মচারীদের তর্ক বিতর্ক ঝগড়া কলহও হইয়া থাকে। এই তুরস্ক-ব্রিটিশ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কোন কোন আমীর ইংরাজদের পক্ষ লয়েন যথা—আমীর ইবণ-সাউদ, আমীর মহাম্মেরা। আমীর মুণ্টাফীক প্রকাশ্যভাবে তুরস্কের পক্ষ সমর্থন করেন।

(৬) ঐ সকল সীমান্ত অঞ্চলে বড় বড় আরবী গুণ্ডাদের দল ছিল; তাহারা এ গ্রামে সে গ্রামে লুট-তরাজ করিয়া বেড়াইত, কোনও রাজা বা আমীরের অধানস্থ হইতে চাহিত না।

৭। তুরস্ক, জর্ম্মান-প্ররোচনায়, সমস্ত মুসলমানী স্থানে জেহাদ প্রচার আরম্ভ করাইলেন। মুসলমান-ধর্ম্মে তুরস্কের সুলতানই ঐ ধর্ম্মের কর্ত্তা বা খালাফ। খালীফের বিপক্ষে কেহ যুদ্ধ ঘোষণা করিলে—খালাফ নিজেকে বাঁচাইবার জন্য "জেহাদ" প্রচার করিতে পারেন। তার মানে, এই যে, মুসলমান মাত্রেরই বিধর্ম্মী শত্রু পক্ষকে বিনষ্ট করিয়া খালীফকে নিঃশত্রু করা উচিত। ইরাকে ও আরবে ঐ সময়ে জেহাদ প্রচারকদের অত্যন্ত আধিক্যের খবর পাইয়া জেনেরাল ব্যারেট ভারতে খবর দিলেন।

৮। ইহার অল্পদিন পরেই ভারত হইতে স্যার পর্‌সি কক্স এবং বিলাত হইতে সেক্সপিয়ার সাহেব যুদ্ধ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কক্স সাহেব আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন আর আরব চরিত্র বুঝিবার তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সেক্সপিয়ার সাহেব আমীর ইবণ-সাউদের পুরাতন বন্ধু। যাহাতে ইবণ-সাউদ আর মোহাম্মেরার আমীর তুরস্ককে সাহায্য না করেন, আর যাহাতে তুরস্কের প্রতি অসন্তুষ্ট আরবী প্রজারা শেষ মুহূর্ত্তে

বিগড়াইয়া গিয়া—তুরস্কের দলভুক্ত না হইয়া পড়ে, এই সব গুপ্ত নিগূঢ় রাজ-নৈতিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্যই ঐ দুই উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজ-কর্ম্মচারীরা তথায় পৌঁছিলেন। কষ্ট করিয়া সেক্সপিয়ার সাহেব আমীর ইবণ-সাউদের বাটীতে পৌঁছিয়া তথায় অতিথি হইলেন; এবং তথায় মারাও পড়িলেন।

৯। ঐ দুই ইংরাজ কর্ম্মচারীদের কৌশলে ঐ আমীরদ্বয় ইংরাজ-বন্ধুতায় স্থির রহিলেন কিন্তু জানাইলেন যে প্রকাশ্যভাবে ইংরাজকে সাহায্য করিতে তখনও তাঁহারা অসমর্থ; এবং তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কারণও দেখাইলেন। তাঁহারা স্পষ্টই ইংরাজকে জানাইলেন যে "তোমরা স্থায়িভাবে বাগ্দাদ না অধিকার করিয়া বসিলে অর্থাৎ ইরাক-প্রদেশকে তুরস্কের-কবল হইতে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া না ফেলিলে আমাদের কিংবা আরব্ প্রজাদের নিশ্চিন্ততা নাই। তুরস্ক যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তোমরা বাগ্দাদ ও বসরা হইতে সরিয়া পড়িবে—আর তুরস্কের পীড়নে আমরা মারা যাইব।"

১০। মোট কথা ইংরাজ বেশই বুঝিতে পারিলেন যে "বলং বলং বাহুবলং"—যে উঁহাদের বাহুবলে তুরস্ককে বাগ্দাদ অবধি জোর করিয়া হঠাইয়া দিতে না পারিলে আর বাগ্দাদ

হইতে বসরা অবধি তুরস্কের পথ রোধ না করিতে পারিলে ঐ সব অনিশ্চিত বন্ধুদের নিকট হইতে সহায়তা পাওয়া যাইবে না এবং আরবী প্রজারাও শত্রুতা করিতে ছাড়িবে না। ইংরাজদের জয়ের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। জয় হইলে, ঐ আমীরদ্বয় খুব সাহায্য করিবে এবং আরবী প্রজারাও চুপ করিয়া থাকিবে। জয় বলের উপর নির্ভর করে; আর অল্প সংখ্যক সৈন্যদ্বারা যদি জয় চাও, তা'হ'লে বল-প্রয়োগের কৌশলে খুব পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। এ সমস্তই ইংরাজ জানিতেন।

১১। কুরণায় ও বসরায় ইংরাজদের তখন সৈন্য-সামন্ত এত কম যে তাহা লইয়া বাগ্‌দাদ দখল করিতে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই "তোমরা ঐ কুরণায় থাকিয়া যতদূর সামলাইতে পার তাহা আপাততঃ কর, আমরাও দেখি চেষ্টা করিয়া আর কি সাহায্য পাঠাইতে পারি"—এই মর্ম্মে ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্যারেট সাহেবকে "তার" করিলেন।

১২। লর্ড হার্ডিং ইরাক ভ্রমণান্তে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াই ব্যারেট সাহেবের নিকট হইতে এই খবর পাইলেন:—"টাইগ্রীশের জল এত বাড়িতেছে যে বাঁধ ভাঙ্গিয়া হয়ত কুরণা গ্রাম প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি, খালি নদীর বাঁধ মজবুত

করাইতেছি কিন্তু এর মধ্যেই অল্প অল্প জল প্রবেশ করায় সমস্ত কর্দ্দমময় হইয়া পড়িয়াছে। অশ্ব, অশ্বারোহীসৈন্য এবং পদাতিকগণ যেন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। তুরস্কেরা যে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে এই খবর পাইয়াছি। কখন করিবে বলা দুষ্কর। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে, খুব যুদ্ধের চটক দেখাইয়া, নিজের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া একবার দেখিয়া আসি আমাদিগকে আক্রমণের জন্য তুরস্কেরা কি ব্যবস্থ করিতেছে। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই তাহাবে তাড়া দেওয়া ভাল"।

১৩। ম্যাপে দেখিবেন যে কুরণা হইতে প্রায় ২০ মাইব উত্তর পশ্চিমে, টাইগ্রীশের উপর, "এজরার-কবর" বলিয় এক গ্রাম আছে। জানুয়ারীর (১৯১৫ খ্রীঃ) মাঝামা ব্যারেট সাহেবের গুপ্ত চরেরা খবর আনিল "তুরস্কের সর্ব্বোচ্চ সেনাপতি সোলেমান আসকারী অনে সৈন্য-সামন্ত বন্দুক কামান লইয়া সেখানে আসিয় পৌঁছিয়াছেন এবং শীঘ্রই জলপথে আর স্থলপথে কুর ঘেরাও করিবার আয়োজন করিতেছেন—আপনারা সাবধা হউন।"

১৪। ব্যারেট সাহেব তদ্দণ্ডেই শাটেল-আরাব ও বসরা হইতে আরও সৈন্য-সামন্ত, তিন চারিখান রণ-পোত, চটপট কুরণাতে আনাইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আর নিজেই ১৮ই জানুয়ারী গুপ্তভাবে সামান্য একদল অশ্বারোহী লইয়া—তুরস্কেরা কোন্ স্থান অবধি আসিয়া পড়িয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া আসিলেন :—"এজরার-কবরের" কয়েক মাইল দক্ষিণে "রুটা" নামে এক খাল বা ছোট নদী এবং সেইখানে অনেকগুলি উচ্চ উচ্চ বালির পাহাড়শ্রেণী—তথায় তুরস্কদের শিবির পড়িয়াছে; উহার দক্ষিণে তুরস্কদের আর কোনও চিহ্ন ছিল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া হুকুম জারী করিলেন "২০শে জানুয়ারী খুব প্রাতে আমরা তুরস্কদের সহিত লড়াই করিতে বাহির হইব, সকলেই প্রস্তুত হও।"

১৫। ঐ হুকুম মতই সব কাজ হইল। ব্যারেট সাহেবের ইচ্ছা হইল যে "রুটা"র ধারে যে বালির পাহাড় শ্রেণী—সেইখানে গিয়া তুরস্কদের দমন করেন ও তথা হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়াও উহাদিগকে তাড়না করিয়া আসেন।

ব্যারেট সাহেব ঘোড়সওয়ার সৈন্য, পদাতিক সৈন্য, বড় বড় কামান ইত্যাদি লইয়া ভোর ৫টায় "রণং দেহি, রণং দেহি" করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেই সঙ্গে তিনখান রণপোতও সৈন্য-সামন্ত লইয় নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিকে কামান দাগিয়া ভয় দেখাইতে দেখাইতে "এজরার কবরের" দিকে চলিল।

১৬। একঘণ্টার ভিতরেই তুরস্কদের কামান দাগা শুন গেল—প্রায় বেলা ২টা কি ২৷৷টা অবধি খুব লড়াই হইল। ইংরাজ সৈন্য যখন ঐ বালির পাহাড় শ্রেণী ভেদ করিয়া উঠিল তখন দেখা গেল যে তুরস্ক ফৌজ "রুটা" খালের অপর পারে পেঁৗছিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। উহাদের প্রায় ২০০ শত কি ৩০০ শত মারা গিয়াছে আর অনেক আহত হইয়াছে। তুরস্ক-সেনাপতি সুলেমান আসকারী নিজে বেশ রকমে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৭। ব্যারেট সাহেব সে দিনের মত ঐখানেই নিরস্ত হইলেন। ইংরাজদের ৭ জন মারা গিয়াছিল আর ৫১ জন আহত হইয়াছিল। "রুটা"পার হইয়া তুরস্কদের আর তাড়া করা হইল না—পাছে সৈন্যেরা অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যাহা হউক জয়ের ফল লাভ এই হইল :—প্রথমতঃ তুরস্কদের কিঞ্চিৎ হারাইয়া, হঠাইয়া দেওয়া হইল; দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ বীরত্বের কথা আরবদিগের মধ্যে বেশ চলিতে লাগিল; তৃতীয়তঃ আরব-আমীরেরা আরও অধিক করিয়া মৌখিক

জানাইলেন যে তুরস্কের বিপক্ষে নিশ্চিত ব্রিটিশদের সহায়তা করিবেন।

১৮। ঐরূপ জয় যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী তা ইংরাজেরা জানিতেন। যে "ডি" ফোর্স নাড়াচাড়া করিয়া প্রথমে ডিলামেন সাহেব ও পরে ব্যারেট সাহেব ব্রিটিশ ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া এতাবৎকাল কাটাইলেন, তাহাতে আর চলে না; যে রকম করিয়া হউক ঐ "ডি" ফোর্সকে বাড়াইয়া ফেলিতে হইবে এবং দুই নদীর উপরস্থ স্থানগুলি যথা নাসিরিয়া, আমারা, কুতেল-আমারা, টিসিফন, বাগ্‌দাদ দখল না করিয়া ফেলিলে তুরস্কের পাল্টা আক্রমণের ভয় হইতে নিস্তার নাই, ইহাও ইংরাজেরা বুঝিতেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। অতএব ঐ "ডি" ফোর্সকে বাড়াইবার জন্য ব্রিটিশ-শক্তি ভারতে ও বিলাতে বদ্ধ-পরিকর হইল। উপরোক্ত "রুটা খালের" লড়াইয়ের পর, "ডি" ফোর্সের সর্ব্বতো-ভাবে উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের কথা জানুয়ারী মাসের শেষ হইতে মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত উপরওয়ালাদের ভিতর চলিতে লাগিল। সেই সময়ের মধ্যে তাহার যোগাড় যন্ত্র, আয়োজন, বন্দোবস্তও করা হইল।

২। মিলিটারী হিসাবে, ভিতরে ভিতরে সব ঠিকঠাক করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৮ই মার্চ্চ (১৯১৫) হুকুম দিলেন যে "একটা পূরা সেনাদল-বাহিনা বা আরমিকোর ইরাক খণ্ডে যাইবে। উহাতে পূরা অশ্বারোহীর দল বা ব্রিগেড্, আর পূরা দুই পদাতিক সৈন্যের-দল বা ডিভিজান থাকিবে। ব্যারেট সাহেব ছুটী লইতেছেন; তাঁর স্থানে জেনেরাল স্যার জন নিক্সনকে ইরাক-যুদ্ধের প্রধান নেতা বা চীফ্-কমাণ্ডার করা গেল এবং এই স্থির হইল যে ১লা এপ্রেল হইতে ঐ সব সেনা-দল ইরাকে গিয়া তাঁহার হুকুমমত চলিবে।"

৩। সহৃদয় পাঠকের অবশ্যই মনে আছে যে কল্যাণকে আর ডাক্তার পুরীকে জাহাজে, বসরা অভিমুখে রাখিয়া আসিয়াছি। উহারা দু'জনেই সেই নূতন-সংগঠিত "ডি" ফোর্সের আরমির-ডাক্তার হইয়া, ঐ "ডি" ফোর্সের সঙ্গেই যাইতেছিল। উহাদেরই জাহাজে নূতন কমাণ্ডার, জেনেরাল নিক্সন, ছিলেন। উঁহারা সকলেই নিরাপদে বসরা বন্দরে ৯ই এপ্রেল প্রবেশলাভ করিলেন। তাহার ১৫ দিন পরে মেজর-জেনেরাল টাউনশেণ্ড, কমাণ্ডার জেনেরাল নিক্সনের সাহায্যার্থে এবং তাঁহারই অধীনে ৬নং রেরে পুরা-ডিভিজানের চালক বা কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া বসরায় উপস্থিত হইলেন।

৪। কল্যাণকে, ইরাক খণ্ডে, জেনেরাল টাউনশেণ্ডের অধীনে পদাতিক সেনা-দলের ডাক্তারি করিতে হইয়াছিল। ইরাক-খণ্ডে তুরস্ক-ব্রিটিশের যুদ্ধের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও ব্যাপারটা যে কি, তাহা এই উত্তরাংশের প্রথম তিন উচ্ছ্বাসে বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সে সমস্তই ঐতিহাসিক তথ্য এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধের ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।

৫। ঐ যুদ্ধের ইতিহাস লেখা আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ঐরূপ সঙ্কলন করিয়া না দেখাইলে কল্যাণ যে

সমস্ত বিপদ-সঙ্কুল যুদ্ধ-স্থানে প্রাণ হাতে করিয়া কাজ করিল এবং কি করিয়া জেনেরাল টাউনশেণ্ড ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য সামন্তের সহিত সে তুরস্কদের হস্তে অবশেষে বন্দী হইয়া পড়িল, তাহা সহৃদয় পাঠককে ভাল করিয়া বুঝাইয়া উঠিতে পারিতাম না। এখন আর আমার সে ভয় নাই।

যে সকল খবর কল্যাণের বিপদ-সঙ্কুল-কর্ম্মস্থান হইতে তাহার ছোট ছোট চিঠি পত্রে, সময়ে সময়ে, আমাদিগের নিকট আসিয়াছে তাহার ভিতরকার ভাব, অর্থ, মর্ম্ম এখন পাঠকের সহজেই উপলব্ধি হইবে।

৬। এই কথা লিখিতে লিখিতে এবং ইরাকে তুরস্ক-ব্রিটিশের যুদ্ধব্যাপার সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল যে আমাদের জাতীয়-জীবন হইতে বাস্তবিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার এক রকম উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের যুবকদের ক্রমশঃ জাতীয়-জীবনের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে এবং সৈনিকের কাজও করিতে হইবে এবং দূর দূর দেশে কিংবা নিকটস্থ স্থানে গিয়া অথবা নিজ দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে হইবে।

৭। তাই, আমাদের যুবকদের মনে যুদ্ধ-ব্যাপার শিক্ষা

করিবার ইচ্ছা উৎপাদন করানও আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নয়। চারিদিক ভাবিয়া, ব্রিটিশরা কেমন করিয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ, আয়োজন করিয়া তুলিল তাহা আমার বিবেচনায় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

আমার মনে হয় আমাদের যুবকেরা কাল্পনিক-প্রেমের আতিশয্যে বা বীভৎস-ব্যাপারে পূর্ণ কুৎসিত কুৎসিত নভেল নাটক পড়িয়া সময় নষ্ট না করিয়া যদি নেপোলিয়ানের সময়কার, বূয়ার যুদ্ধের, চীন-জাপানের, রুশো-জাপানের এবং গত ইউরোপীয় যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করেন ত খুব ভাল হয়।

মনে মনে যাহারা বীরত্বের কল্পনা করিতে পারে, বীরত্বের স্বপ্ন দেখিতে পারে, তাহারাই ত সময় ও সুবিধা পাইলে কর্ম্মক্ষেত্রে বীরোচিত কাজ করিয়া, আদর্শ বীরের ছবি মনে ভাবিতে ভাবিতে বীরের মত মরিতে পারে। সুদীর্ঘ ঘাস-কাটা জীবন অপেক্ষা কি স্বল্পায়ু-বীরের মরণ শ্রেয় নয়? ভগবান্ করুন যেন বঙ্গমাতা একদিন "বীর-মাতা," "বীর-ভূমি" আখ্যা জগতের ইতিহাসে পায়। সে নাম, সে খ্যাতি অর্জ্জন করা ত আমাদের যুবকদেরই হাতে।

৮। বসরা হইতে কল্যাণের ১৩ই এপ্রেলের (১৯১৫) প্রথম চিঠি বিনোদিনীর হস্তে, সিমলা পাহাড়ের মিলিটারী

ডিপার্টমেণ্টের সেন্সারের আফিস ঘুরিয়া, তাহার দিন পনের পরে পৌঁছে। তাহাতে সে এই লেখেঃ—"মা, আমরা নিরাপদে বসরায় পৌঁছিয়াছি। জাহাজে বেশ আমোদে ছিলাম। ডাঃ পুরী ও আমি এক জাহাজেই ছিলাম। কোহাটের সব শিক্ষিত সৈন্যই আসিয়াছে। প্রায় ৪০ হাজার হইবে।

"সে যাহা হউক; আরে রাম্! এই কি সেই খালীফ্ হারুণ-আল-রসীদের "বসরা"—ছো! ছো!! বসরাই গোলাপ ফুলের গোরের চিহ্ন ত নাই-ই, তার পরিবর্ত্তে আছে কেবল ১০।১২ হাত অন্তর ৫।৬ হাত চওড়া ২০।২১ হাত গভীর একটা করিয়া খাল! তাহাতে টাইগ্রীশের জল ঢুকে হাঁটুভর কি কোমর ভর হয়ে থাকে। এক একটা খাদের ভিতর বোধ হয়, ডুই লক্ষ করিয়া ব্যাঙের বাসা। সে ব্যাঙগুলি ছোট বড় মাঝারি; বেশীর ভাগই বড় বড় কোলা ব্যাঙ। তাদের কি ভয়ানক ডাক! যেন কাণে তালা লাগিয়াই আছে। মানুষের কথা মানুষে শুন্‌তে পাচ্ছে না।

"পাঁচ সাতখানা বাঁশ ধরে ধরে পার হইয়া আমরা একটা উঁচু জমি পেয়ে গিয়েছি। এটা একটা খেজুর গাছের বাগান—সহর থেকে প্রায় একমাইল দূরে। গাছে কিন্তু খেজুর নাই, কোনও

পাখী পক্ষী নাই। কেবল যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার চিহ্ন সব মাইল ভর জমিতে ছড়ান রহিয়াছে। অনেক বড় বড় খালি বাক্স আমরা কুড়াইয়া টেবিল করিয়া তাহাতে খাদ্যাদি রাখিয়া দাঁড়াইয়া খাইয়াছি। আবার তাহার উপরেই—এক একটা এক একজন লইয়া—শুইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। সে বাক্সগুলির সংখ্যা প্রায় হাজার দুই হইবে। বাকী লোকে মাটীতে কম্বল পাতিয়া শয়ন! তেমনি মশা, শীতও খুব। আবার কি এক রকম দুর্গন্ধ বাহির হয়। দিনের বেলায় খুব ঝড় আর খেজুর গাছের মড় মড় শব্দ। ধূলা আর রৌদ্র খুব তীব্র।

"সহর অনেক দূরে। তবু খাল পার হ'য়ে হ'য়ে বাজার থেকে মাছ, তরি তরকারি কিনে আনে। মাছ খুব ভাল আর তরি তরকারিও সব পাওয়া যায়। খুব বড় বড় পেঁয়াজ, আলু, কপি, বেগুন, পালং শাক, কমলা লেবু সব পাওয়া যায়।

"সহর দেখিবার সময়—আমাদের হইয়া উঠিবে না। প্রস্তুত হইয়াই থাকিতে হইতেছে। খাওয়া দাওয়া খুব উত্তম রকমেই চলিতেছে।

"কোথায় যাইবার—কখন টেলিগ্রামে হুকুম আসিবে কে জানে? তুমি উতলা হইও না। যেখানেই যাই,

সুবিধা পাইলেই তোমায় লিখিব। এখন ঝড়ের জন্য কাগজ ঠিক রাখা দুষ্কর। তুমি "ওয়ার আফিসে" চিঠি দিলেই আমি যেখানে থাকি পাইব। আজ বিদায়। ইতি

তোমার

কল্যাণ।"

চতুস্ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। কল্যাণকে, তাহার ঐ চিঠি লেখার কয়েকদিন পরেই, "কুরণা" বন্দরে ৬ নং ডিভিজানের সেনা-দলের সঙ্গে জাহাজে করিয়া পাঠান হয়। সেখানে অনেকগুলি তাঁবুতে উহাদিগের থাকিবার বন্দোবস্ত হয়। কুরণাকে কেন্দ্রস্থান করিয়া,ঐ সকল সৈন্য-সামন্ত লইয়া, টাউনশেণ্ড সাহেব যে একটা গুরুতর যুদ্ধ তুরস্কদের সহিত শীঘ্র করিবেন—এ জনরব সৈনিকদের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

২। ইরাক প্রদেশে, এপ্রেল ও মে মাসে, টাইগ্রীশ আর ইউফ্রেটীজ বহুদূরস্থিত পাহাড়ের ঝরণার জলে ও বরফগলা জলে ভরিয়া যায়। দুই নদীর বাঁধ ছাপাইয়া সমতল ভূমে জল আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেয়—রাস্তা ঘাট ও বসবাসের স্থান সমূহকে কর্দ্দমময় করিয়া ফেলে। হাজার শক্ত করিয়া বাঁধ দেওয়া যাউক না কেন নদীর জল লোকালয়ে ঢুকিয়া বিড়ম্বনার একশেষ করে। সৈনিকদের উপর প্রথম কর্ম্মের ভার পড়ে—ঐ বাঁধ মজবুত রাখা, যাহাতে লোকালয় নদীর জলে প্লাবিত না হয়—তাহার উপর নজর রাখা।

৩। যখন কল্যাণ এপ্রেল মাসের শেষাশেষি কুরণায় উপস্থিত হইল তখন সেখানকার দৃশ্য যে তার ভীষণ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানেই একটু জলশূন্য উচ্চ জমি সেইখানেই সৈনিকদের তাঁবু পড়িয়াছে—বড় বড় তাঁবুতে সৈনিকদের হাঁসপাতাল বসিয়াছে—ঘোড়-তুরুপের ঘোড়াশালা বসিয়াছে। অল্প-কর্দ্দমময় জমিতে খড় বিছাইয়া কামানের গাড়ী, গোলাগুলী, বন্দুকের ঢেরি রাখা হইয়াছে। একমাত্র পথ, জলপথ ; খাল ডোবা সব ভরিয়া নদীর জলের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। সৈনিকেরা যাহাতে সহজেই চতুর্দ্দিক দেখিতে পায় তজ্জন্য ৯০ ফীট উচ্চ এক মাচা উঠিয়াছিল। মাচার উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে—সব জলময়।

৪। ঐ মাচার উপর প্রত্যহ অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া জেনেরাল টাউনশেণ্ড দূরবীণ দিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতেন আর নিজের নোট বহিতে লিখিতেন ; নামিয়া আসিয়া নিম্নতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন; হয় ত কোন দিন থান-দুই ছোট জাহাজ লইয়া টাইগ্রীশ হইতে ইউফ্রেটীজের কূল কিনারা দেখিয়া আসিতেন ; কোন কোন দিন জাহাজে করিয়া চীফ-কমাণ্ডার জেনেরাল নিক্সনের সহিত পরামর্শ করিতে বসরা যাইতেন। কোন কোন দিন বা জেনেরাল নিক্সন নিজে কুরণায় আসিতেন।

৫। তুরস্ক দলবল লইয়া জলপথে কতদূর নামিয়া আসিয়া কি করিতেছে—কত কামান, কত বোমা গুপ্তভাবে সাজাইতেছে—গুপ্তচরেরা সেই সব খবর আনিলে তাহা আলোচিত হইত। কল্যাণ আর ডাক্তার পুরী সব গুজবেই কাণ রাখিত আর নিজেদের হাঁসপাতালের দৈনিক কাজ করিয়া যাইত এবং অচিরে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে কিরূপ ভাবে চলতি হাঁসপাতালের আয়োজন করা কর্ত্তব্য তাহারও কিছু কিছু বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটী করিত না। এইভাবে উহাদের প্রায় একমাস কাটিয়া যায়। এত সেনাদলের ভিতর যে মাত্রায় ডাক্তারদের-দল থাকা উচিত তাহা অপেক্ষা ঢের কম ছিল। কাজেই কল্যাণ ও ডাঃ পুরীর উপর কার্য্যের চাপ খুবই পড়িয়াছিল।

৬। ঐ একমাসের মধ্যে কমাণ্ডার জেনেরাল নিক্সন, মেজর-জেনেরাল গরিঞ্জকে ১২ নং ডিভিজানের সেনাপতি মনোনীত করেন। একটা মস্ত যুদ্ধে উহারা জয়লাভ করে। কল্যাণ কি ডাঃ পুরী তাহার ভিতর ছিল না। সে যুদ্ধটা হয় পারস্য দেশের সীমান্ত প্রদেশ আরবীস্থানে।

তুরস্কের সৈনিকগণের সাহায্যে ও প্ররোচনায় অনেক বর্ব্বর আরবের দল আরবীস্থানে ইংরাজদের পেট্রোলিয়ামের পাইপ ছেঁদা করিয়া দিয়া আবাদান বন্দরে ঐ তৈল আসা

বন্ধ করিয়া দেয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ঐ তৈলে সমস্ত ব্রিটিশ-রণপোতগুলির কাজ চলে। ঐরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে ইংরাজরাজের ঐ সব বর্ব্বর আরবী দস্যুদিগকে এবং তুরস্ককেও শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

৭। পূর্ব্বোক্ত মোহাম্মেরা বন্দরের নিকটবর্ত্তী "কারুণ" নদী ভেদ করিয়া মেজর জেনেরাল গরিঞ্জ তাঁহার ঐ ১২ নং ডিভিজনের সেনাদলকে জলপথে আর দুরূহ স্থলপথে আরবীস্থানে লইয়া গিয়া তুরস্কের সৈনিকদের ও ঐ বর্ব্বর আরবী দস্যুদের খুব তাড়না করেন। ইংরাজদের চারখানা রণপোতও সেই যুদ্ধে খুব সহায়তা করে। তুরস্কের অনেক সৈন্যের ঐ যুদ্ধে প্রাণনাশ হয়। আর বাদবাকী সৈন্য পলাতক হইয়া টাইগ্রীশের উপর "আমারা" নামক স্থানে আশ্রয় লয়। আরবীস্থানের দস্যুরাও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলাইয়া যায়। তারপর ইংরাজ ঐ তৈলের পাইপ মেরামত করাইয়া আবাদান বন্দরে পুনরায় পাইপে করিয়া ঐ তৈল আনাইতে সমর্থ হয়েন।

৮। আরবীস্থানে ঐ যুদ্ধ-জয়ের পর গরিঞ্জ সাহেবের অনেক রেজিমেণ্টকে স্থলপথে "আমারা" আক্রমণের জন্য

পলাতক তুরস্ক-সৈন্যদের পিছু পিছু পাঠান হয়। পীড়িত এবং অতি-ক্লান্ত রেজিমেণ্টরা জলপথে বসরায় বা কুর্ণাতে ফিরিয়া আইসে। সে সময় আরবীস্থানের যুদ্ধে জল কষ্টে আর ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপে সৈন্যদের এবং নিম্নতন সৈন্য-চালকদের ভিতর পেটের ও অন্যান্য পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

৯। জেনেরাল নিক্সনের পরামর্শে, জেনেরাল টাউনশেণ্ড হুকুম দেন যে ৩১শে মে তারিখে উঁহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য প্রথমতঃ জলপথে তারপর দু'ভাগে বিভক্ত হইয়া জলপথে আর স্থলপথে গিয়া "আমারা"য় হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া ঐ স্থান দখলে আনিতে হইবে এবং তথা হইতে তুরস্কদের দূরীভূত করিতে হইবে।

১০। ইংরাজদের জেনেরালদের ভিতর পরামর্শ করিয়া এই স্থির হয় যে প্রথমে টাইগ্রীশ-কূলস্থিত "আমারা" হইতে, পরে ইউফ্রেটীজ-কূলস্থিত "নাসিরিয়া" হইতে, তুরস্কদের একেবারে তাড়াইতেই হইবে। তাহা না পারিলে "আরবী-স্থানের" আর "আবাদানের" তৈলের পাইপকে সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করা যাইবে না। "আমারা" আর "নাসিরিয়া" আপাততঃ অধিকার করিয়া বসিলে, বসরা আক্রমণ করিবার

জন্য কি তৈলের পাইপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তুরস্ক লোকবল পাঠাইতে পারিবে না। ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এ যুক্তি খুবই সঙ্গত। ভারত গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে ঐ যুক্তির পোষকতা করেন।

১১। একমাস ধরিয়া কুরণাতে রণসজ্জা বিশেষভাবে হইতে লাগিল। কিন্তু নদীর জলের উৎপাতে—বসবাসের স্থান, বেড়াইবার পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। তার উপর দিনে ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপ, রাত্রে ভয়ানক মশার উপদ্রব। এই সকল কষ্টের কারণে সৈন্যেরা যেন ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।

১২। কুরণার মত স্থানে আবদ্ধ থাকায় উহাদের মনে একটা ভয় হইত পাছে তুরস্কেরা হঠাৎ বড় বড় কামান দ্বারা দুর হইতে বা বোমা দ্বারা এইরোপ্লেন হইতে আক্রমণ করে—তাহা হইলে উহাদিগকে বসিয়া বসিয়া মরিতে হইবে ; প্রকাশ্য যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া মরিবার সুযোগ হইয়া উঠিবে না। তাই উহারা মনস্থ করিয়াছিল যে একবার "আমারা" জয় করিতে পারিলে উহারা কখনই "কুরণা" বন্দরে ফিরিয়া আসিবে না। সেই মতলবে উহারা রণ-সজ্জার আয়োজনে খুব উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিল এবং ঠিক সময়ে যথাযথ ভাবে তৈয়ারিও হইয়াছিল।

১৩। জেনেরাল টাউনশেণ্ড গুপ্তভাবে খবর পাইলেন যে টাইগ্রীশের অপর পারে, "আবু-আরাণ" "মুঝাইবিলা" এবং "রুটা খাল" প্রভৃতি কতকগুলি স্থান তুরস্ক ফৌজ খুব জোরে আগ্‌লাইয়া আছে। "রুটা খালে" ইংরাজ-তুরস্কে একবার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ইংরাজ উহা জয়ের পর দখল না করাতে তুরস্ক সেখানে আরও সেনা আনিয়া ফেলিয়াছে। নিকটবর্ত্তী "বারবুথ" খালের ধারেও কামান সাজাইয়াছে। জানা যায় ঐ সব স্থানে তুরস্কের কিছু কম ৫ কি ৬ হাজার সৈনিক তৈয়ারি রহিয়াছে; সাহায্যের জন্য প্রায় ২ হাজার আরব-যোদ্ধারাও প্রস্তুত, আর তাদের সঙ্গে বড় বড় ৮টা কামান।

১৪। ঐ সকল স্থান হইতে তুরস্কদের তাড়াইয়া দখল করিতে যাইলে জল-যুদ্ধই অধিক মাত্রায় করিতে হইবে, এই বিবেচনায় অনেক ছোট ছোট পানসীর যোগাড় হইল, তাদের উপর ছাউনি পড়িল আর ভিতরে একটা কি দুইটা করিয়া মেশীনগন্ রাখা স্থির হইল। মতলব এই, ওসব খাল ডোবার স্থান—বড় বড় রণপোত যাইতে পারিবে না—কিন্তু প্রত্যেক পানসীতে মেশীনগণ দিয়া ১০ জন করিয়া সৈনিক তুরস্কদের খুব লোকসান করিতে পারিবে।

১৫। ঐরূপ পানসী ৩৭২ খান যোগাড় হইয়াছিল, তাছাড়া বড় বড় কামান বজরায় লইয়া যাইবার এবং সেনা-দলকে রণপোত গুলিতে ভর্ত্তি করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত হয়।

কোন্ সেনা-দল কি ভাবে কোথায় যাইবে এবং কি রকমে যুদ্ধারম্ভ হইবে; কতদূর রণপোত গুলি গিয়া কত সহস্র সেনাকে গুপ্তভাবে কোন্ উচ্চ নদীর পাড়ে নামাইয়া দিবে—এবং তাহারা লুক্কায়িতভাবে কত মাইল ঘুরিয়া কোনদিক হইতে "আমারা" আক্রমণ করিবে—তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখিত হুকুম জেনেরাল টাউনশেণ্ড ২৬শে মে দিলেন আর সকলকেই জানাইয়া রাখিলেন যে ৩১শে মে "আমারা বিজয়ের জন্য মহাযাত্রা করিতে হইবে।"

১৬। বসরা হইতে ঐ সকল পানসী, ৫।৬ খান রণপোত, সৈনিক, বন্দুক, বারুদ, কামান, খাওয়া দাওয়ার আসবাব ডাক্তারদের ঔষধ-পত্র—সমস্তই ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে মের মধ্যে কুরণা বন্দরে হাজির হইল। স্যর পর্‌সি কক্স আর কমাণ্ডার জেনেরাল নিক্সণ এক রণপোতে বসরা হইতে ঐ মহাযাত্রায় যোগ দিবেন বলিয়া কুরণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দুই উচ্চ কর্ম্মচারী জেনেরাল টাউনশেণ্ডের রণ-নৈপুণ্য আর রণ-নেতৃত্ব দেখিতে আসিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহারা ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে আইসেন নাই।

পঞ্চত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। জেনেরাল টাউনশেণ্ড হুকুম দিয়াছিলেন যে ৩০শে মে সন্ধ্যা রাত্রের মধ্যেই যেন সকল সৈনিক স্ব স্ব স্থানে—পানসীতে, বজরায় রণপোতে উপস্থিত থাকে; এবং ঠিক রাত ১টা বাজিলেই "আমারা বিজয়ের" মহাযাত্রা আরম্ভ হইবে।

সাতখানা রণপোত :—'এস্পাগল,' 'ওডিন্,' 'ক্লিও,' 'লরেন্স,' 'সয়তান,' 'সুমন,' 'মাইনর,' ১টা রাত্রে সসৈন্যে ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিমদিকে যাত্রা করিল—ভোর ৫টায় "বারবুখ" খালের ধারে যে ৪ চার খণ্ড উচ্চ পাহাড়ের টিপি ছিল তাহার উপর বড় বড় তোপ পড়িতে লাগিল—কারণ সেইখান হইতে তুরস্কের অল্প সংখ্যক সৈন্যকে তাড়াইতে পারিলে, ৫০০০ হাজার ব্রিটিশ ফৌজকে সেই খানেই নামাইয়া দিবার এবং ইহাদের দ্বারা পলাতক তুরস্কদের তাড়না করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

২। জমিতে নামিয়া ৫০০০ হাজার ফৌজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িবে; একদল পলাতক তুরস্কদের পিছনে ছুটিবে; অন্যদল কতক দূর তাড়া করিয়া নিজেরা ঘুরিয়া দলবদ্ধ হইয়া নদীর কিনারার স্থান সকল আক্রমণ করিতে

করিতে "আমারা"র দিকে যাইবে; তৃতীয়দল একেবারে নদীর উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সটান আমারার দিকে ছুটিবে। রণপোত সমূহ তোপে টাইগ্রীশের অন্যান্য স্থান সকল জখম করিতে করিতে "আমারা"র দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে এবং নিকটে আসিয়া একযোগে "আমারা"য় অগ্নি বর্ষণ করিবে, পরে ব্রিটিশ ফৌজ উহা দখল করিবে। এই ছিল টাউনশেণ্ড সাহেবের প্ল্যান।

৩। ভোর ৫॥০টায় একটা উচ্চ ঢিপির নিকট দেশী ও ইংরাজী ফৌজদের নামাইয়া দেওয়া হয়। সে দলের সহিত খচ্চর-টানিত বড় বড় কামানের গাড়ী ছিল, তাহারা ভোর ৬টা হইতে প্রায় ১॥০ মাইল দূরস্থিত আর এক ঢিপির উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। তুরস্কেরা পাল্টা জবাবে অনেক গোলা-গুলি মারে কিন্তু ব্রিটিশ কামানে সে সব স্তব্ধ করিয়া দেয়। কতকাংশ ব্রিটিশ ফৌজ গোলা বর্ষণ করিতে করিতে জলে ঝাঁপাইয়া ঐ ঢিপির নিকট সাঁতার দিয়া পার হইয়া উহা অধিকার করিয়া ফেলে।

৪। জেনেরাল টাউনশেণ্ড "এস্পীগলে" থাকিয়া স্বয়ং যুদ্ধের কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। একদল পাঞ্জাবী সৈন্য আর একটা ঢিপি, অধিকার করে ঠিক ভোর ৬টায়। সেখানে

ছিল মাত্র ৭২০ জন শত্রু-পক্ষের লোক। উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জানা যায় যে তুরস্কের অনেক ফৌজ "আমারা"র দিকে পলাইয়াছে।

৫। এরপর একটা বৃহৎ ঢিপি ব্রিটিশ ফৌজ আক্রমণ করে। ঐখানে বহুসংখ্যক তুরস্কের সৈন্য ও কামান ছিল। উহারা ব্রিটিশদের উপর গুলি বর্ষণ করিল, রণপোত গুলার উপরেও কামান দাগিল, কিন্তু বেশি ক্ষতি করিতে পারে নাই। বেলা ৯টার পর শত্রু-পক্ষের কামানের ধ্বনি আর শুনা গেল না। এই ঢিপির যুদ্ধে তুরস্কের কিছু সৈন্য আর অনেক গুলা কামান ধরা পড়ে। নদীগর্ভে উহারা ২৪টা বোমা পুঁতিয়াছিল সেগুলা সবই ইংরাজ ধরিয়া ফেলেন।

৬। ইংরাজ আর একটা মস্ত ঢিপি ঐরূপে জয় করেন। সেখানেও তুরস্কের অধিকতর সৈন্য বন্দী হইয়া পড়ে এবং অনেক কামানও ইংরাজদের হাতে আইসে। এই করিতে করিতে বেলা ১১টা বাজে, তখন সূর্য্যের প্রকোপ আর গ্রীষ্ম এত অধিক যে টাউনশেণ্ড সাহেব সৈন্যদিগকে বাঁচাইবার জন্য সে দিনকার মত যুদ্ধ থামাইলেন। এই প্রথম দিনের যুদ্ধের সময় প্রধান রণপোত এস্পীগলের উপর ব্রিটিশ এইরোপ্লেন উড়িতেছে দেখা গেল।

৭। ঐদিন বেলা ৪টার সময় টাউনশেণ্ড সাহেব, পরদিন ভোরে কি কি করিতে হইবে—তাহার তালিকা প্রকাশ করেন। ১লা জুন ভোর ৫টা হইতে "আমারা"র দিকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। নদীর উত্তর পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে উচ্চ জমির উপর "আবু-আরাণ" এবং তাহারও উত্তরে "মুজাইবিলা" নামক যে দুই গ্রাম আছে তাহাদের ভিতর হইতে তুরস্কের সৈন্য সামন্ত ভাগাইতে হইবে। ছোট ছোট মেশীনগন্‌যুক্ত পানসী গুলা তত কাজে আসেনাই, সে গুলাকে কাজে লাগাইতে হইবে। যাহাতে ওগুলা শীঘ্র শীঘ্র জলে চলিতে পারে তাই উহাদের ছাউনি খুলিয়া ফেলান হইল। ১৭নং ব্রিগেডের উপরেই ঐ দুই গ্রাম দখল করিবার ভার পড়ে।

৮। ১লা জুন ভোর ৫টায় মহাগর্জ্জনে ব্রিটিশ রণপোত গুলা কামান দাগিতে দাগিতে, "আবুআরান" গ্রামের দিকে ছুটিল। কিন্তু শত্রুপক্ষের আর সাড়া শব্দ নাই; সকলই নিস্তব্ধ। যে সকল ছোট ছোট পানসীতে করিয়া ১৭নং ব্রিগেডের সৈন্যরা ধীরে ধীরে যাইতেছিল—তাহাদের উপরেও শত্রুপক্ষ হইতে গোলাগুলি পড়িল না। এ রহস্যের তাৎপর্য্য কি, উচ্চ ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা আলোচনা করিতেছেন এমন সময় এইরোপ্লেন হইতে "এস্পীগলে" খবর আসিল যে

"আবু-আরাণে" বা "রুটা" খালের ধারে বা "মুজাইবিলা" গ্রামে যে সকল তুরস্ক-সৈন্য-সামন্ত ছিল তাহারা সব উত্তরমুখে পলাইতেছে।

৯। তৎক্ষণাৎ টাউনশেণ্ড সাহেব হুকুম দিলেন যে সমস্ত ব্রিটিশ ফৌজ "আবু-আরাণে" সমবেত হউক। ১৭নং ব্রিগেডের প্রথমাংশ পানসী করিয়া "আবু-আরাণের" কাছ বরাবর আসিয়া পড়াতে ইহারা নৌকা-যোগে-পলাতক শত্রু-দলের উপর গোলাগুলি মারিয়া উহাদিগকে বিনষ্ট করিল। ১নং ব্রিগেড "আবুআরাণ" দখল করিয়া ফেলিল; বেলা ১১টার পূর্ব্বে ব্রিটিশ রণপোত আর পানসাগুলা সমস্তই"আবু-আরাণে"আসিয়া বাঁধিল।

১০। টাউনশেণ্ড সাহেব সকল সৈন্যদের "আবু-আরাণে" নামিতে হুকুম দিলেন এবং স্বয়ং "রুটা" খালের ধারে তাদারক করিতে গেলেন যে, কি ভাবে শত্রুপক্ষ ঐখানে বোমা ইত্যাদি পুঁতিয়া জল-পথ বন্ধ করিয়াছে। যে সকল তুরস্কের লোকেরা বন্দিভাবে ব্রিটিশদের সহিত যাইতেছিল তাহারাই"রুটা" খালে জলমগ্ন বোমার কথা টাউনশেণ্ড সাহেবকে বলিয়া দেয়। "সয়তান" আর "সুমন" দুই ছোট ছোট রণপোতের উপর হুকুম হইল যে "জল হইতে বোমা উঠাইয়া, বড় বড় রণপোতদের "আমারা" অভিমুখে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দাও"।

১১। টাউনশেণ্ড সাহেব সৈন্যদিগকে হুকুম দিলেন :— "তোমরা ২॥০টা অবধি বিশ্রাম কর, তারপর তুরস্কের পলাতক সৈন্যদিগের তাড়না করিবার জন্য তাহাদের পিছু লও। অন্ততঃ 'এজরার-কবর' পর্য্যন্ত আজ বৈকালের মধ্যে ঠেলে চল। আমার উদ্দেশ্য যে পলাতক শত্রুরা "আমারা"তে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে, আমরা যেন "আমারা"য় হাজির হইতে পারি —যে কোন প্রকারে হউক"। সুবাধ্য আর সুশিক্ষিত ব্রিটিশ আর ভারতীয় সৈনিকেরা ঐ হুকুমে উৎসাহে মাতিয়া গেল।

১২। টাউনশেণ্ড সাহেবের খুব ইচ্ছা যে ১৭ নং ব্রিগেডের যুদ্ধাগ্নি-পরীক্ষা হয় এবং উহারাই প্রথমে 'আমারা'য় পৌঁছিয়া তুরস্কের সহিত সংগ্রামে লাগিয়া যায়। আমারাতে যে বেশ লড়াই হইবে তাহাতে তখন আর কোন সন্দেহই ছিলনা। ১৬নং ব্রিগেডের কতক কতক ফৌজ "আবু-আরাণে" ছাড়িয়া, ১৭নং রের ব্রিগেড্ পুনরায় জাহাজে উঠিল। উহাদের সঙ্গে বড় বড় কামান, "নরফোক" নামধারী-সৈন্যের দল, আর হাঁসপাতালের জাহাজ যাহাতে কল্যাণ আর ডাক্তার পুরী ছিল উজানের পথে চলিল।

১৩। নদীর পথ তখন পরিষ্কার। বোমা ডাইনামাইট ইত্যাদি ভয়ের কারণ দূর করা হইয়াছিল। বেলা ৬টায়

"এস্পীগল"জেনেরালকে লইয়া সাবধানে—"সয়তান"রণপোতকে সম্মুখে রাখিয়া এবং "ওডিন" আর "ক্লিও" রণ-পোতদ্বয়কে পিছনে রাখিয়া—"রুটা" খালের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘণ্টা তিনেক যাইতে যাইতেই"সয়তান"দেখে যে সম্মুখে তুরস্কের রণপোত "মারমারিস্ ;" তৎক্ষণাৎ সে ১২ পাউণ্ডের গোলা বর্ষণ করিয়া উহাকে জখম করিল। এক ঘণ্টার ভিতরেই "এস্পীগল," "ক্লিও," "ওডিন," ৪ইঞ্চ কামান হইতে ঐ "মার-মারিস্" আর তুরস্কের "মোসল্" রণপোত-দ্বয়ের উপর গোলা মারিয়া উহাদিগকে কাত্ করিয়া ফেলিল।

১৪। তুরস্কের ঐ দুই রণপোত নিজেদের অনেক ফৌজকে গাধাবোটে করিয়া টানিয়া আনিয়া ছিল। ঐ সকল গাধাবোট বেগতিক দেখিয়া, কাছি কাটিয়া তুরস্ক-ফৌজদের "এজরার-কবর" গ্রামে তুলিয়া দেয়। তুরস্কের অনেক কামান এবং গোলাগুলিও সেই সঙ্গে ঐ খানে নামাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল ধর-পাকড় করিবার জন্য ব্রিটিশ-রণপোত "ওডিন" ঐ খানে রহিয়া গেল। বাদবাকী রণপোত লইয়া টাউনশেণ্ড সাহেব নিজে সন্ধ্যারাত হইতে রাত ৯টা অবধি তুরস্কের অন্যান্য গাধাবোটের সৈন্যদের ধরপাকড় লাগাইয়া দিলেন। "সয়তান" ইতিমধ্যে আগুয়ান হইয়া তুরস্কের "বুলবুল" জাহাজে

গোলা মারিয়া উহাকে ডুবাইল। তুরস্কের অনেক সৈন্য সামন্তও ব্রিটিশ হস্তে বন্দী হইয়া পড়িল। উহাদের গোলাগুলি রণসজ্জা ও অনেক ধরিয়া ফেলা হইল।

১৫। ২রা জুন রাত ২টার সময়, চাঁদ উঠিবার পরেই, সমগ্র ব্রিটিশ রণপোত আবার চতুর্দ্দিকে গোলাগুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে "আমারা" অভিমুখে যাত্রা করিল। দু'ঘণ্টা চলিয়া "এস্পীগলের" তলা, নদীতে জল কম বলিয়া, মাটিতে বসিয়া যাইতে লাগিল। "ক্লিও" ও ঐখানে রহিয়া গেল। তৎপূর্ব্বেই উহারা "মারমারিসের" উপর পুনরায় গোলাগুলি ফেলিয়া উহাকে পোড়া-ইয়া দেয়। দেখা গেল যে "মোসলেও" আগুণ লাগিয়া গেছে। ঐ দুই তুরস্ক-রণপোতে যে সব কামান গোলাগুলি ও সৈন্য ছিল তাহা সমস্তই ব্রিটিশদের হস্তগত হইল। অন্যান্য নিকটস্থ তুরস্ক-সৈন্যে-ভরা গাধাবোট গুলার দশাও তদ্রূপ হইল।

১৬। এই সব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল যে তুরস্কের বিশৃঙ্খল ভাবে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছে। তখন "আমারা"তে তুরস্কদের কি ব্যাপার চলিতেছে জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি জেনেরাল টাউনশেণ্ড ক্যাপটেন নানকে সঙ্গে লইয়া সেই দিকে ছুটিলেন।

তাঁহারা দুই জনে এস্পীগলের বদলে "কমেট" রণপোতে চলিলেন। পিছু পিছু চলিল "সুমন," "সয়তান" আর "লুইস পেলি"। উহাদের পিছনে-বাঁধা কতকগুলা গাধাবোটে ও বজরায় চলিল কতকগুলা ভারি ভারি কামান আর অল্পই সৈন্য। অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত ছোট ছোট পানসী করিয়া পিছু পিছু চলিল।

১৭। টাইগ্রীশে খুব তোড়। উজান বাহিয়া যাইতে অনেক সময় লাগিল। ২রা জুনের সন্ধ্যা বেলা "কালা-শালী" গ্রাম পার হইয়া রাত্রের জন্য নঙ্গর গাড়া হইল। এখানে দেশের জল-প্লাবিত চেহারা আর নাই। দু'ধারেই অনন্ত ক্ষেত-জমি— তাহাতে ঢিপি ঢিপি ঘাস জন্মিয়াছে—চাষ করা হয় নাই। "কালা-শালীর" সেখ্ বা জমিদার টাউনশেণ্ড সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেখের উপর হুকুম হইল যে "১৫০০০ ব্রিটিশ ফৌজ আসিতেছে, উহাদের জন্য রসদ্ প্রস্তুত করিয়া রাখ।" "কালা-শালীতে" গ্রীষ্ম কম বোধ হওয়াতে সৈন্যরা খুব আরামে রাত কাটাইল।

১৮। ৩রা জুন খুব ভোরেই ব্রিটিশ রণপোত গুলা ফের কামান দাগিতে দাগিতে "আমারা"র দিকে ছুটিল। দেখা গেল যে নদীর দু'ধারের গ্রাম সমূহে সব শ্বেত-নিশান উড়িতেছে—তাহাতে

বুঝাগেল যে আরবী-বাসিন্দারা মিত্রতা করিতেই ইচ্ছুক। এমন সময় টাউনশেণ্ড সাহেব একবার নিজের রণপোত গুলাকে আর জলপথে ব্রিটিশের পক্ষে সকলকেই "হল্ট" করিবার বা "দাঁড়াইবার" নিশান তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে "বড় ব্রিগেডের সৈন্যেরা তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে কেবল রণ-পোত গুলাকে দিয়া আক্রমণ করিলে বিশেষ ফল-লাভ হইবেনা—কারণ তুরস্কেরা "আমারা রক্ষা করিবার জন্য খুবই লড়িবে"।

ইহাতে কিন্তু ক্যাপটেন নান রাজি হইতে পারিলেন না—জেনেরালের সহিত ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরিয়া বিচার বিতর্কের পর তাঁহার ঐমত ও হুকুম ফেরাইলেন। "আমাদের অদৃষ্টে যা হবার আছে—তা হবে; আমরা আগুয়ান হইয়া রণপোত দিয়াই লড়িব" এই স্থির হইল।

১৯। বেলা ৯৷৷০ টার সময় রণপোত গুলা ফের হুঙ্কার করিতে করিতে, অগ্রসর হইল। "সয়তান" আর একটা ছোট জাহাজ অনেক আগে আগে দূরবাণ দিয়া স্থান পরীক্ষা করিতে করিতে চলিল।

এমন সময় এইরোপ্লেন হইতে ওয়ারলেসে খবর আইসে যে "তুরস্কের তিন খানা রণপোত ব্রিটিশ রণপোত গুলার ঠিক

সম্মুখে পলাইতেছে; আরবীস্থান হইতে ফেরত, তুরস্ক-জেনেরাল ডাঘিস্তানি তিন দল তুরস্ক-সৈন্য লইয়া আমাদের খুব নিকটেই পৌঁছিয়াছেন। তাঁর অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত হয় 'আমারা' ছাড়িয়া গিয়াছে, না হয় 'আমারা'তেই আছে।"

২০। রণ-পোত "সয়তান," যখন "আমারা" হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে; তখন দূরবীণ দিয়া দেখা গেল যে নদীর দক্ষিণ দিকে এক বড় জাহাজে তুরস্কের অনেক সৈন্য ঢুকিতেছে—আর সেই জাহাজ নদীর আরও উপরে যাইবে বলিয়া একটা পুলকে খুলিয়া রাখা হইয়াছে।

২১। তাই "সয়তান" তাড়াতাড়ি আরও অগ্রসর হইয়া তুরস্কের সেই জাহাজে গোলাগুলি মারিতে আরম্ভ করে। প্রাণের ভয়ে তুরস্কের সৈন্যেরা জাহাজের আশ্রয় ছাড়িয়া, জমিতে নামিয়া নদীর ডান-ধারি রাস্তা ধরিয়া চম্পট দিল। শত্রুর ১৫০০ শত সৈন্য এই রূপে পলাইতেছে দেখিয়া "সয়তান" আরও সাহসে, সেই খোলা পুলের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া নদীর দক্ষিণ ধারে নঙ্গর গাড়িল। তৎক্ষণাৎ তুরস্কের একশত জন সৈন্য আর ৬ জন অফিসার ব্রিটিশদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল।

২২। তখন "আমারা" সহর পলাতক ও ছত্রভঙ্গ তুরস্ক সেনাতে গিজ্‌ গিজ্‌ করিতেছে। কিন্তু "সয়তানের" দিকে

কেহই গোলাগুলি ছুঁড়িতে চেষ্টাও করিল না। এইখানে আরও ১৫০ শত্রুসৈন্য আত্ম-সমর্পণ করিল। "সয়তান" তখন খুব সাহস করিয়া 'আমারা'র কূলে আসিয়া লাগিল। "সয়তানের" কমাণ্ডার মার্ক সিংগলটন্ সাহেবের সাহসে ও বীরত্বে সকলেই চমৎকৃত হইল। বেলা ১৷৷০টা হইতে ২টার মধ্যে "কমেট" রণপোতে জেনরাল টাউনশেণ্ড,ক্যাপটেন নান"আমারা"য় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাদবাকী ব্রিটিশ সৈন্যগণ বন্দুক কামান ইত্যাদি লইয়া ছোট ছোট পানসীতে, জাহাজে, গাধাবোটে, হাজির হইল।

২৩। "আমারা"য় নদীর ধারেই তুরস্কের "কষ্টম হাউস"। টাউনশেণ্ড সাহেব, ক্যাপটেন নান আর অন্যান্য বড় বড় ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের লইয়া তাহা দখল করিয়া ফেলিলেন। ব্রিটিশ জয়-পতাকা সেই কষ্টম-হাউসের উপর চড়াইয়া দেওয়া হইল। তুরস্কের তরফ হইতে গোলাগুলি বর্ষণ দূরে থাক, কোনও আপত্তি বা বাধা দেওয়া হইল না বরং দলে দলে তুরস্ক সেনানী, অফিসারেরা, "আমারা"র দেওয়ানি-গভর্ণর সুদ্ধ সকলেই আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিল।

২৪। তুরস্কদের আত্ম-সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের রাশি রাশি গোলাগুলি বন্দুক কামান ও আসিয়া "কষ্টম-হাউসের"মস্ত

উঠানে জমা হইতে লাগিল। এই সময়ে দেখা গেল যে—অনুমান ২০০০ আরবী-স্থান হইতে প্রত্যাগত তুরস্ক-ফৌজ—"আমারা"র উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ হইতে সহরে ঢুকিতেছে। তৎক্ষণাৎ রণপোত সয়তান তাহাদের উদ্দেশে কামান দাগিতে আরম্ভ করিল—ব্রিটিশ ফৌজ উহাদিগকে তাড়না করিল; উহারা সব পলাইল। এই ভাবে সন্ধ্যা বেলা, ৬টার মধ্যে, "আমারা" বিনা রক্তপাতে ব্রিটিশের দখলে আসিল।

২৫। টাউনশেণ্ড সাহেব তুরস্কের দেওয়ানি গভর্ণরের উপর হুকুম দিলেন :—"১৫০০০ ব্রিটিশ ফৌজ তিন দিন মার্চ করিতে করিতে আসিতেছে, তাহাদের জন্য রসদ যোগাড় কর—উহারা শীঘ্রই পৌঁছাইয়া যাইবে—তুমি সহর-বাসীদের বুঝাইয়া বলিয়া দাও তাহারা যেন ব্রিটিশদের ফৌজের উপর অত্যাচার বা শত্রুতা না করে—আর ব্রিটিশ-ফৌজ তুরস্কের প্রজাদের কিছু অনিষ্ট করিবেনা, লুট-তরাজ উহারা কেহই করিবে না। বাজারে দোকান পাট যেমন চলিতেছে সেইরূপ চলিবে। ব্রিটিশরা তুরস্কের শত্রু নয়—আর শত্রুতা করিতে বা রাজত্ব কাড়িয়া লইতে এখানে ব্রিটিশরা আসে নাই। তবে যতদিন ইউরোপের মহাযুদ্ধ খতম হইয়া একটা সন্ধি না হয় ততদিন এই দুই নদীর পথ পরিষ্কার রাখা চাই যাহাতে বাগ্‌দাদের সঙ্গে, আরবী-

স্থানের সঙ্গে, ব্রিটিশদের কারবার ও বাণিজ্য ঠিক চলিতে থাকে; ব্রিটিশরা এই চায়। আর আজ রাত্রে সকলেই সতর্ক ভাবে থাকিবে—যে প্রজারা শান্তি চায় তাহারা ৭টার পর যেন বাটীর বাহিরে না আসে। "আমারা"-সহর তাদারক করিবার এবং সহরে শান্তি রক্ষা করিবার ভার এখন ব্রিটিশদের।"

২৬। রাত্রি আসিল। রণপোত গুলা হইতে সার্চ—লাইট সমস্ত "আমারা" সহরকে প্লাবিত করিতে লাগিল। বড় বড় কেরোসীন তেলের ল্যাম্প রাস্তার মাথায় মাথায় বসান হইল এবং সেই সব স্থানে ২৫ জন করিয়া ব্রিটিশ ফৌজ মোতায়েন রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। অন্যান্য ব্রিটিশ ফৌজদের উপর হুকুম হইল যে "তোমরা আজ রাত্রে খুব সতর্ক ভাবে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া যদি নিদ্রা যাইতে পার ত নিদ্রা যাইও কিন্তু জাগ্রত থাকিতে খুব চেষ্টা করিবে।" ঐ হুকুমের সঙ্গে আরও বলা হইল যে "তুরস্কেরা যে বিনা যুদ্ধে এইরূপে "আমারা," ব্রিটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিবে ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই কিন্তু ইহার ভিতর তুরস্কের খুব গূঢ় অভিসন্ধি আছে নিশ্চিত জানিও। উহাদেরও হয়ত খুব বড় ফৌজের দল জলপথে আর স্থল পথে আমাদের একেবারে ঘেরাও করিতে আসিতেছে, এখনও পেঁ ছায় নাই। আমাদের ১৫০০০ ফৌজ এখনও পেঁ ছায় নাই; তাহারা

না আসা অবধি আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিনা।"

২৭। কল্যাণ আর ডাক্তার পুরী ইহার পূর্ব্বে ব্রিটিশদের এরূপ রণ-সজ্জা এবং আক্রমণের মহাযাত্রা কখনও দেখে নাই। যুদ্ধের সুবৃহৎ-আয়োজনে উহারা প্রতিপদে চমৎকৃত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত ৭॥০টার মধ্যে উহারা হাঁসপাতাল জাহাজ হইতে "আমারা"র কষ্টম-হাউসে নামিল এবং সহরে বিলাতী ডাক্তারা-ঔষধপত্র পাওয়া যায় কি না এই জানিবার জন্য একবার সাবধানে সৈনিকদের সঙ্গে বাজার ঘুরিয়া লইল। উহারাও সে রাত্রে নিজ জাহাজে জাগিয়া কাটাইল।

৪ঠা জুন ভোর ৪টার সময় গোলমাল শুনিয়া অনুসন্ধানে জানা গেল বাজারে ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে। তারপর ৬॥০টা হইতে দলে দলে ব্রিটিশ্-ফৌজ পৌঁছিতে আরম্ভ করিল। টাউনশেণ্ড সাহেব আর অন্যান্য সকলেই তখন নিশ্চিন্ত হইলেন।

২৮। "আমারা" তখন সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ-কবলে আসিল। ইহার সমস্ত দেওয়ানী-কার্য্যের ভার জেনেরাল নিক্সন সাহেব নিজ হস্তে লইলেন। স্থলপথে "আমারা" হইতে "এজরার-কবরে"র নিকটবর্ত্তী "আহোয়াজে", তথা হইতে "কুরণাতে" এবং সেখান

হইতে "বসরায়" নিয়মিত ভাবে ডাকগাড়ী যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিলেন।

২৯। "আমারা" নূতন সহর; ১০।১২ হাজার লোকের বসতি। ঐ চার স্থানেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈনিকদলের কেন্দ্র বা হেড্ কোয়াটার বসিল। ডাক্তার পুরী যে দলের সঙ্গে ছিলেন তাহারা কিছুদিনের জন্য "আমারা"তেই রহিল। সেখানেও আহতদের জন্য হাঁসপাতাল বসিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার পুরী ঐ হাঁসপাতালের কাজ করিতে লাগিলেন। কল্যাণ বাদবাকী আহতদের সঙ্গে পুনরায় জাহাজে বসরায় ফিরিয়া যায় এবং সেখানকার হাঁসপাতালে আহতদের দেখিবার কাজ করিতে থাকে। সেখানে উহাকে ৫ সপ্তাহ রাখিয়া পুনরায় নাসিরিয়ার যুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

ষট্‌ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। যখন ব্রিটিশরা "আমারা" দখল করিলেন তখন অধিকাংশ তুরস্ক-ফৌজ আরমিনীয়া প্রদেশে, তথাকার খ্রীষ্টান প্রজাদের বিদ্রোহ থামাইতে এবং রুশিয়ার সহিত লেক্‌ভ্যাণ প্রদেশে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত ছিল। এ দিকে ইরাক-খণ্ডে কি হইতেছে তাহার উপর তুরস্ক বেশী নজর রাখিতে পারে নাই।

ওদিকে ইংলণ্ড হইতে রণপোতে যত সব ব্রিটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান ফৌজ কনষ্টান্টিনোপলের দক্ষিণে, তুরস্কের গ্যালিপোলি প্রদেশ আক্রমণ করিতে আইসে তাহারা ঐখানেই আটকাইয়া পড়ে।

পারস্যে জার্ম্মাণদিগের ষড়যন্ত্র ব্রিটিশদের বিপক্ষে এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই পারস্য ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা খুবই ছিল।

ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে আফ্রিডাদের সঙ্গে উহাদের "মোঃমাণ্ড্" প্রদেশ লইয়া ইংরাজদের একটা গুরুতর গণ্ডগোলও চলিয়াছিল। সেই জুন মাসে ইউরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও এসিয়া খণ্ডে ঐভাবে দাঁড়াইয়াছিল।

২। "আমারা" জয় করিয়া ফললাভ এই হইল যে

টাইগ্রীশ দিয়া বাগ্‌দাদ হইতে তুরস্ক-ফৌজের বসরায় যাইবার পথ বন্ধ হইল। ইংরাজদের তরফে সৈন্যবল এত অধিক ছিল না যে উঁহারা "আমারা" হইতে জোরে গিয়া বাগ্‌দাদ দখল করিতে পারেন। অথচ তুরস্ক-ফৌজদের পক্ষে বসরায় নামিয়া আসিবার আর একটা পথও খোলা রহিয়া গেল—তাহা ইউফ্রেটীজ দিয়া নাসিরিয়ার পথ। কমাণ্ডার নিক্সন সাহেবের নজর এখন উহারি উপর পড়িল।

৩। তিনি "আমারা" জয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেনঃ—"আমারায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেছিনা। ইউফ্রেটীজের উপর "নাসিরিয়া" বন্দর অধিকার করিতে শীঘ্র হুকুম দিব মনস্থ করিয়াছি। তুরস্ক এদিকে অধিক সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমরা "নাসিরিয়া" দখল করিয়া ফেলিতে চাই। দক্ষিণে "নাসিরিয়া," উত্তরে "আমারা" আমাদের দখলে থাকিলে "বসরা"কে তুরস্কের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিবার ভরসা আমাদের হইবে। কেবল তাহাই নয়, "আমারা" ছাড়াইবার পর আরও উত্তর-পশ্চিমে "কুতেল-আমারায়" গিয়া আমাদিগকে বসিতে হইবে। কারণ "কুতেল-আমারা" হইতে "নাসিরিয়া" অবধি "সাতেল-হাই" নামক খাল গিয়াছে। উহা দিয়া বড় বড় জাহাজ

যাইতে পারে। ঐ খালের দুই মুখ আমাদের এলেকায় না রাখিলে চলিবেনা।” ভারত গভর্ণমেণ্ট নিক্সন সাহেবের মতেই মত দিলেন।

৪। নিক্সন সাহেব ১৬ই জুন হইতেই “নাসিরিয়া” জয় করিবার আয়োজন আরম্ভ করেন। আক্রমণের ভার জেনেরাল গরিঞ্জকে দেওয়া হয়। উঁহাদের মতে কুরণা বন্দর হইতে প্রথমে হামার-হ্রদে যাইতে হইবে; তথা হইতে ইউফ্রেটীজে প্রবেশ করা ও নাসিরিয়া দখল করা শক্ত হইবে না। সমস্ত সৈন্য সামন্ত, কামান ইত্যাদি জলপথে লইয়া যাওয়াই স্থির করা হইল। উঁহারা গুপ্তচর দ্বারা খবর ও পাইয়াছিলেন যে “নাসিরিয়া”তে তুরস্কের সৈন্য-সামন্ত যাহা কিছু ছিল, তাহাদের অধিকাংশকেই “কুতেল-আমারায়” পাঠান হইয়াছে। সেইজন্য উঁহাদের মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে “নাসিরিয়া” জয় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

৫। “আমারা” জয় করিবার সময়ের মত এবারেও সেই সব রণপোত, বড় বড় নৌকা, গাধাবোট, পানসী ইত্যাদি যুদ্ধের আসবাবে, কামানে, বন্দুকে গোলাগুলিতে সৈন্য সামন্তে সাজাইয়া লইবার এবং জলপথে যাত্রা করিবার ভার ক্যাপটেন নানের উপর দেওয়া হয়। ইনি এই জল-যুদ্ধের আসবাব লইয়া ২৭শে

জুন হামার-হ্রদে প্রবেশ করেন। ঐ হ্রদ পার হইয়া ইঁহাদের পথ হইল "আকৈশ্বা" খালের ভিতর দিয়া। এই খালে ঢুকিবামাত্র তুরস্কদের দুই খানা ছোট জাহাজ হইতে ইঁহাদের উপর গোলাগুলি পড়িতে লাগিল। ব্রিটিশদের রণপোত কামান দাগিয়া উহাদের থামাইয়া দিল। কিন্তু আর কতক দূর গিয়া ইঁহারা দেখেন যে এক ৩০ ফাট উচ্চ দেয়াল দিয়া ঐ খালের পথ বন্ধ করা হইয়াছে।

৬। পথ বন্ধ দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্রিটিশ রণপোত গুলা নঙ্গর করিল এবং ফৌজদের ডাঙ্গায় নামাইয়া দিল। উহারা নিকটবর্ত্তী গ্রাম গুলা দখল করিয়া ফেলিল। যে সব সেনার-দলকে "স্যাপার" বলে, তাহারা সমস্ত রাত ডাইনামাইট দিয়া ঐ দেয়াল ভাঙ্গিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে (২৮শে জুন) দেখা গেল যে দেয়ালের উত্তর অংশে প্রস্থে ৭০ ফাট, আর গভীরে ৭ ফাট রাস্তা বাহির করা হইয়াছে। সমস্ত দিন ধরিয়া ঐ দেয়াল ভাঙ্গা চলিল। ১৫০ ফাট প্রস্থে আর গভীরে ১৫ ফাট রাস্তা বাহির করার পর, এত জলস্রোত বাড়িয়া উঠিল যে, অনেক কষ্টে কাছাদিয়া টানাটানি করিয়া ব্রিটিশ রণপোত, জাহাজ, নৌকা, পানসী ইত্যাদি ঐ রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল।

৭। ২৯শে জুন ঐ রাস্তা দিয়া বাহির হইবার ব্যাপারে কাটিয়া গেল। ৩০শে জুন ক্যাপটেন নান সাহেব এবং একজন বড় সাহেব গুপ্ত-চরগণকে লইয়া আকৈথা খালের পশ্চিম সামনা-সামনি ইউফ্রেটীজের দক্ষিণ ধারে, যেখানে তুরস্কদের কামান ইত্যাদি পোঁতার খবর পাওয়া গিয়াছিল, সেই সকল স্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া নোট করিয়া লইলেন।

৮। "আকৈথা" খালটা বড়ই ঘোর-পাক খাইয়া আঁকা-বাঁকা ভাবে গিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৭ মাইল আর প্রস্থে ৫০ গজ হইবে। দুই পারের উপরের জমী, চার মাইল অবধি, খুব খোলা আর কর্দ্দমময়। মাঝে মাঝে আরবী-প্রজাদের বাস করিবার মেটে ঘর, গ্রাম, ইত্যাদি দেখা যায়। ইহার পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর—খালের মোহানা অবধি সমস্ত স্থানে—খেজুর গাছের চাষ। ঐ মোহানার নিকট আর দুইটা ছোট ছোট খাল—নাম "মিশাশিয়া" আর "শাতরা"—আসিয়া মিশিয়াছে। জানা গেল যে ঐ মোহানার কাছে তুরস্কেরা কামান ডাইনামাইট ইত্যাদি পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

৯। ঐ খালের ভিতর দিয়া ব্রিটিশ রণপোত, জাহাজ, নৌকা পানসী ইত্যাদি খুব সতর্কভাবে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল—পারের ধারে ধারে ব্রিটিশ ফৌজরা হাঁটিয়া চলিল।

কোথাও বাধা পাইল না। রাত হইলেই সব জলযান চলা বন্ধ রাখিত। রণপোত, জাহাজ ইত্যাদি হইতে ঘূর্ণ্যমান সার্চ-লাইট চতুর্দ্দিকে আলো ছড়াইত—খালের পারে ফৌজরা আগুন জ্বালিয়া আহার বিহার করিত, গান গাহিত, দলে দলে পাহারা দিত আর দলে দলে ঘুমাইত; এইভাবে ১লা ২রা ৩রা জুলাই কাটিয়া গেল।

১০। ৩রা জুলাইয়ের রাত পর্য্যন্ত ব্রিটিশদের সমস্ত জল-যান—ছোট ছোট পানসীভরা সৈন্য, কামান ইত্যাদি সমেত সেই খালের দেওয়াল ভাঙ্গা দুর্গম পথ পার হইয়া, খালেরই ভিতর কিন্তু মোহানা হইতে অনেক দূরে সমবেত হইয়া পড়িল। যুদ্ধের সকল সরঞ্জাম একসঙ্গে করাইবার জন্যই রণপোতগুলি খুবই আস্তে আস্তে এ কয়দিন চলিয়াছিল। ৩রা জুলাই রাত্রে হুকুম হইল যে ব্রিটিশ ফৌজ ৪ঠা জুলাই ভোর হইতে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া নাসিরিয়ার দিকে যাইবে। গুপ্ত খবরও আসিয়াছিল যে তুরস্কেরা আরবী-প্রজার সাহায্যে ব্রিটিশদের ঐখানে ঘেরাও করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

১১। গুর্খা-সৈন্যদের উপর হুকুম দেওয়া ছিল যে উহারা খেজুর বনের ভিতর দিয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত "মিশাশিয়া" খাল ও "শাতরা" খাল পার হইবে। গুর্খাদের এই চাল বন্ধ করিবার

জন্য আরবী-প্রজারা তুরস্কের পক্ষে খেজুর বনে লড়িল। ৪ঠা জুলাই সমস্ত রাত গুর্খারা খেজুর বনে লুক্কায়িত থাকিয়াও আরবদের হস্তে মার খাইল এবং উহাদিগকেও অনেক মারিল। ৫ই জুলাই ভোর ৫টায় এক বিলাতি গোরার রেজিমেণ্ট গিয়া গুর্খাদের সাহায্য করিয়া আরবদের তাড়াইতে চেষ্টা করে—কিন্তু এমন সময়ে তুরস্কদের ফৌজ সেই থানে আসিয়া পড়ায় ইংরাজ-তুরস্কে খুব যুদ্ধ হয়।

১২। ভোর ৫টায় জেনেরাল মেলিসের নেতৃত্বে ৭৬নং পঞ্জাবী রেজিমেণ্ট 'শাতরা' খালের সঙ্কীর্ণ পথে যাইতেছিল। এমন সময় একদল তুরস্ক-ফৌজ উহাদিগকে আক্রমণ করে। উহাদের সাহায্যে ২৪নং রের পাঞ্জাবীর দল ছোটে; কিন্তু মাঝে তুরস্কের ফৌজ উহাদের আটকায়। পানসীর ভিতরে যে সব সৈন্যরা কামান লইয়া বসিয়াছিল তাহারাও তুরস্কদের উপর কামান দাগে। ৭৬নংরের পাঞ্জাবীরা এমনি বিপদে পড়িয়াছিল যে উহাদের সাহায্যের জন্য ব্রিটিশদের দুখানা রণপোত আকৈখা খালের মোহানার দিকে আরও অগ্রসর হইয়া তুরস্কদের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করে।

১৩। তুরস্কেরাও একটা ব্রিটিশ রণপোতের উপর বোমা ফেলিয়া উহাকে জখম ও নিস্তেজ করে। খেজুর বনের ভিতর

ব্রিটিশদের গোলাগুলি বর্ষণ অনেকটা বিফল হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ ফৌজরা তুরস্কের এক বড়গোছের-দলের হস্তে ১০টা বেলা অবধি খুবই মার খায়। ক্রমশঃ যুদ্ধ করিতে করিতে অতি কৌশলে ৭৬নং পাঞ্জাবী আর ২৪নং পাঞ্জাবী একযোগ হইয়া পড়ে এবং একযোগে লড়াই করিতে করিতে ১২টা বেলার সময় উহারা ইউফ্রেটীজের পশ্চিম ধারে পেঁ ৗছে। এই সময় ব্রিটিশ রণপোত গুলার কামানে তুরস্কের ঐ দলও বেশ জখম হয়।

বেলা দেড়টা অবধি জুঝিয়া ঐ বড়গোছের-তুরস্কের-দল আর পারিল না; উহাদের দলের ভিতর হইতে শাদা নিশান দেখাইতে আরম্ভ করে, গোলাগুলি চালান বন্ধ দেয়, এবং আত্ম-সমর্পণ করিয়া ব্রিটিশদের হস্তে বন্দী হয়।

১৪। একদল গুর্খা এবং সাহায্যকারী একদল ইংরাজ সৈন্য তুরস্কদের হস্তে আটকাইয়া পড়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে আর একদল ব্রিটিশ ফৌজ পেঁ ৗছাইয়া যাওয়াতে ক্রমশঃ সেই তুরস্কের দল হঠিয়া যায়। ঐ ব্রিটিশ ফৌজ গুর্খাদের লইয়া এক যোগে "শাতরা" খাল পার হয়। এই তুরস্কের দল ইউফ্রেটীজের কূলে গিয়া দেখে যে উহাদের বড়দল ইংরাজদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

এই দেখিয়া ইহারাও আত্ম-সমর্পণ করে। আরবী-প্রজারা—যাহারা এতাবৎকাল তুরস্কদের সাহায্য করিতেছিল তাহারা পলাইল।

১৫। ঐরূপে আকৈখা খালের যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয় হয়। সেই রাত্রেই ৯টার মধ্যে ইঁহাদের সমগ্র জল-যান ঐ খাল হইতে বাহির হইয়া, উহারই মোহানার নিকটে, ইউ-ফ্রেটীজের বক্ষে নঙ্গর করিল।

পর দিন (৬ই জুলাই) ব্রিটিশ রণপোত সমূহ, অন্যান্য জাহাজ, গাধাবোট, নৌকা, পানসী ইত্যাদি সসৈন্যে ইউফ্রেটীজে উজান বাহিয়া "নাসিরিয়ার" দিকে চলিল।

সেই মোহানা হইতে "নাসিরিয়া" প্রায় ২৫ মাইল হইবে। ঐখানে ইউফ্রেটীজ খুব সুন্দর দেখিতে; দু'ধারে ধান ক্ষেতে ভরা। ঐখানটাই ইরাক দেশে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর। নদীর দুই পারে মাঝে মাঝে তুরস্কেরা ছোট ছোট দুর্গ গাঁথিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে সহজে শত্রুপক্ষের চলাচল বন্ধ করা যায়। ঐখানে নদীটা প্রস্থে প্রায় ৫০ গজ হইবে।

১৬। নাসিরিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিবার বন্দর, আর সহরও পুরাতন নয়। সেখানে ১০।১২ হাজার লোকের বসতি হইবে। মস্ত মস্ত ঘর বাড়ীও আছে। ব্রিটিশ রণ-বাহিনী

যখন নাসিরিয়া হইতে ১০ মাইল দূরে তখন তুরস্কের তোপের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। কিছু কিছু গোলা-গুলি রণ-পোতগুলিতেও লাগিল।

১৭। শত্রুপক্ষ খুব নিকটে দেখিয়া, ব্রিটিশ সৈন্যদের নদীর দুই ধারে, স্থানে স্থানে, নামাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা পায়ের উপর দিয়া হাঁটিয়া নাসিরিয়ার নিকট অগ্রসর হইবার হুকুম পাইল। জেনেরাল নিক্সন স্বয়ং এইরোপ্লেনে উঠিয়া শত্রুপক্ষ কি ভাবে জমিতে নালি বা ট্রেঞ্চ কাটিয়া নিজেরা উহার ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া ব্রিটিশ ফৌজদের উপর গোলা-গুলি বর্ষণ করিবার উদ্দেশে প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা দেখিয়া লইলেন; এবং ব্রিটিশ ফৌজরা কতদূর অগ্রসর হইয়া ঐরূপ ট্রেঞ্চ কাটিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে—তাহার পরামর্শ জেনেরাল গরিঞ্জকে দিলেন।

১৮। নাসিরিয়া রক্ষা করিবার জন্য তুরস্ক ৫০০০ হাজার সৈন্য, গোলাগুলি, কামান বন্দুক ইত্যাদি অনেক যোগাড় করিয়াছিল। নদীবক্ষে তুরস্কের একখানিও রণ-পোত ছিল না। উহার হারিয়া যাইবার কারণ ঐখানে।

১৯। ৭ই হইতে ২৪শে জুলাইয়ের মধ্যে ব্রিটিশ আর তুরস্কদের সঙ্গে খুব গোলা-গুলি চলিতে লাগিল। রাত্রিকালে, গোলমাল

না করিয়া, ব্রিটিশদের নূতন নূতন ট্রেঞ্চ কাটা হইত আর ব্রিটিশ ফৌজ ঐ সকল নূতন নূতন ট্রেঞ্চে সরিয়া যাইত। ঐ ভাবে ক্রমশঃ ব্রিটিশরা তুরস্কদের ট্রেঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরস্পরের উপর গোলাগুলি-বর্ষণের ব্যাপার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে চলিল।

২০। ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা শত্রুর বহর বুঝিয়া—তিনবার "বসরা" ও "কুরণা" হইতে নূতন নূতন ফৌজ জলপথে আনাইয়া ফেলিলেন। ১৬ই জুলাই খুব তাড়াতাড়ি করিয়া কল্যাণকেও বসরা হইতে নাসিরিয়ার জন্য রওনা হইতে হয়। কল্যাণ নিজে তার চিঠিতে নাসিরিয়া যুদ্ধের আর নাসিরিয়া বিজয়ের ব্যাপার যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল তাহা তার মার চিঠিতে বর্ণনা করিয়াছে। এই উচ্ছ্বাসের পরেই সেই চিঠি দেওয়া গেল।

২১। ২৩শে জুলাই হইতে নাসিরিয়া-সহরের উপর ব্রিটিশ রণ-পোতগুলা গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। সহরে একটা ত্রাস উপস্থিত হইল। ঐরূপ অগ্নি বর্ষণ সেখানকার প্রজারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

২২। ২৪শে জুলাই খুব ভোর হইতেই ব্রিটিশে তুরস্কে একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ব্রিটিশদের রণপোতগুলার বড় বড় কামানের জোরে তুরস্ক-সেনা বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে।

সন্ধ্যা অবধি খুব জুঝিয়া তুরস্ক-সেনা রণে ভঙ্গ দিল; আর পারিয়া উঠিল না। দুই পক্ষেরই অনেক সৈন্য আহত হইয়াছিল অনেক মারাও পড়িয়াছিল। সেই রাত্রেই তুরস্কের ফৌজেরা সহর ছাড়িয়া অন্যত্র সরিয়া পড়ে।

২৩। পর দিন (২৫শে জুলাই) ভোর-বেলা হইতেই সহরের নানা স্থানে শাদা-নিশান উড়িতেছে দেখা গেল। অল্পক্ষণ পরেই তথাকার বড় বড় সেখ আমীর, ওমরারা শাদা-নিশান উড়াইতে উড়াইতে ব্রিটিশদের জাহাজে আসিয়া বড় বড় জেনেরালদিগকেও তাঁহাদের দলবলকে সহরে ঢুকিয়া অধিকার করিতে নিমন্ত্রণ করিল এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। ব্রিটিশ ফৌজেরা দলে দলে উহাদের পিছু পিছু ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে এবং গান গাহিতে গাহিতে চলিল। ঐরূপে নাসিরিয়া বিজয় সমাধা হইল।

কল্যাণের চিঠি।

নাসিরিয়া, ২৬শে জুলাই ১৯১৫।

মা,

তোমরা নিশ্চয়ই কাগজে আগেই খবর পাবে যে মেসোপোটেমিয়ায় আবার মস্ত যুদ্ধ হয়েছে। ইংরাজের খুব জিত হয়েছে। এবার জিতের আর ভুল নেই। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমার চোখের সাম্নে হয়েছে।

আমি ৫।৬ দিন হল তাড়াতাড়ি তোমায় যে দু'লাইন লিখেছি তা বোধ হয় যথাসময়ে পেয়েছ। আশা করি মাঝে এক মেলও বাদ যায়নি।

১৬ই জুলাই সকালে বসরায় দিব্য ঘোড়ায় চোড়ে বেড়াতে বাহির হচ্চি—এমন সময় হুকুম এল যে তখনই সব মালপত্র বেঁধে তৈয়ারি হয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে করে রওয়ানা হতে হবে।

হাঁসপাতালে যে সব রোগী ছিল, তাদের ওখানেই ফেলে যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে পড়লাম। খচ্চরের গাড়ী

আসতেই দুঘণ্টা দেরী হল। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই তৈরী হ'য়ে নিলুম।

১৬ই বেরিয়ে ১৯শে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম। জাহাজে আমাদের জায়গা হয় নি। নৌকাতে মাল বোঝাই করে জাহাজের সঙ্গে দড়ী দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে এল"। ডাঙ্গায় নেমেই টের পাওয়া গেল যে শত্রুর লাইন। "পত্রপাঠ" কামানের আওয়াজ পাওয়া গেল।

সেই দিন রাত্রে ডাক্তারদের বড় সাহেব এসে হুকুম দিলেন যে আমাদের অ্যামবুলেন্স কোরের (আহতদের শুশ্রূষা করিবার দলের নাম) এক সেকশান বা বিভাগকে ফায়ারিং লাইনের (অর্থাৎ যেখান হইতে শত্রুপক্ষের উপর গোলাগুলি ছোঁড়া হইতেছে) পিছনে যেতে হবে। সেখানে অন্য অ্যামবুলেন্স কোরের একদল আছে তাহাদের রিলীভ করতে হবে (অর্থাৎ তাদের ছুটী দিয়া, তাদের বদলে কাজ করতে হবে)।

শুনলাম আমাদের জেনেরালদের ক্যাম্প বা তাঁবু থেকে আমাদের ঐ ফায়ারিং লাইন দেড় মাইল দূরে; আর শত্রুদের ট্রেঞ্চ বা নালি থেকে দু তিন শত গজ দূরে। আমাদের জন্য তাম্বু ত দূরের কথা—ক্যাম্পখাটও নিয়ে যাবার হুকুম নেই।

এক বস্ত্রে,.একখানা কম্বল ও বর্ষাতি নিয়ে এবং ৫টা ডুলি নিয়ে যেতে হবে।

আমি এমন সুযোগ ছাড়বো কেন? নিজে সিনিয়ার, নিজেই যাব বললাম। জুনিয়ার ডাক্তারটিকে ক্যাম্পের ভার দিয়া তারপর দিন বেলা ৫টার সময় বেরিয়ে পড়লাম। হ্যাঁ তার মধ্যে দিনের বেলা আমাদের ক্যাম্পে দুটা গোলা এসে পড়ল।

সন্ধ্যা নাগাত আমাদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছিলাম, ও অন্যদের ছুটী দিয়ে নিজেদের ড্রেসিং ষ্টেশান খুললাম। শুনলাম আমাদের ট্রেঞ্চ সেখান থেকে ৩০০ গজ দূরে ও শত্রুর ট্রেঞ্চ থেকে ২০০।৩০০ গজ তফাৎ।

একটা ৪ ফাট দেওয়ালের আড়ালে আমাদের আশ্রয়; লোকে সতর্ক করে দিলে—যে বেশী গুলি চললে দেয়ালের আড়াল থেকে না বেরোনই ভাল। দেয়ালের আড়ালে এক বিন্দু হাওয়া নেই; বিষম গরম। মশা, পোকা, ব্যাঙ, গিজ্ গিজ্ করছে।

রাত্রি ১০টা নাগাত গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হল। ঠিক শিলাবৃষ্টি! অবিকল! এক বর্ণও বাড়ান নয়! খেজুর বাগানে দেয়ালের আড়ালে আশ্রয়! ঠকাম্ ঠকাম্! সাঁই! সাঁই! গুলি চলেইছে—আধ ঘণ্টা ধরে।

প্রতিরাত্রে শক্ররা পঞ্চাশ ষাট হাজার গুলি নষ্ট করিত; ক্বচিৎ কখনও কারো লাগিত। ওরকম কেন যে লাখ খানেক করে—গুলির অপব্যয় করত—ওরাই জানে। কেউ গ্রাহ্যও করতো না।

গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হলেই যে যার দেয়ালের আড়ালে মাথা হেঁট করে গল্প স্বল্প করত। আমাদের দিকের সৈন্য উল্টে গুলি বর্ষণ করত না। সমস্ত রাত্রির মধ্যে ৩।৪ বার, ১০।১৫ মিনিট ধরে ঐ রকম গুলি চালিয়ে শেষ রাত্রিটা বোধ হয় ওরা ঘুমিয়ে পড়ত। ৪ রাত্রি আমি ছিলাম তার মধ্যে ৭।৮ টার বেশী আহত হয় নি।

যাহোক ২৩শে রাত্রিবেলা হুকুম এল যে পরদিন ভোরে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হবে। আমরা আক্রমণ করব। আমরা সব ক্ষতস্থান বাঁধবার ব্যাণ্ডেজ, ঔষধপত্র, আইওডীন, দুধ, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি নিয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য ৫টার সময় তৈরী হলাম। ৫॥০টা থেকে আমাদের কামান চলতে আরম্ভ হল।

"বুম-বুম" প্রায় ২০।২৫টা কামান এক সঙ্গে। তার ১৫।২০ মিনিট বাদে, আমাদের সৈন্য সব পিছন থেকে, আমাদের মাথার উপর দিয়ে শিলা বৃষ্টি করতে করতে এগুতে আরম্ভ করলে।

আমরা বরাবরই আড়ালে ছিলাম। দু'একবার মাথার উপর উঁচুতে শত্রুর গোলা পৌঁছেছিল কিন্তু কারো লাগেনি।

দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে, গোলা বৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে শত্রুকে হঠতে হল।

তারপর হত আর আহতের যা দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণা তা ত আছেই।

তিনটা নাগাত একদল বন্দী ও শত্রুপক্ষের আহত এসে উপস্থিত হল। আমিত সাড়ে ছ'টা ভোর থেকে ১টা পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলতে অবসর পাই নি। রক্তের নদী, লাল—চারি দিকে—নিজে রক্তে মাথামাথি আমি। কাকে—রেখে কাকে দেখি। বিসর্জ্জনের ধ্রুবের "এত রক্ত কেন" মনে হয়। কেন এত রক্ত পাত!! কি আর বর্ণনা করব? জীবনে কখনও এ দৃশ্য ভুলব না।

কাল সন্ধ্যাবেলা বিজিত সহরে এসেছি। আসবার সময় যুদ্ধক্ষেত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলাম। যা দেখেছি—তা বর্ণনা করা অসাধ্য। আজ এখানে ইংরাজের পতাকা উড়ান হয়েছে।

আমার বিছানা পত্র, কাপড় চোপড় সব পেছনে ক্যাম্পে পড়ে আছে। আমরা ৭।৮ মাইল এগিয়ে এসেছি; পরশুর রক্ত

মাথা কামিজই পরে আছি। আজ বাকি জিনিস পত্রের জন্য টেলিগ্রাম করেছি—এলে বাঁচি।

আশা করি তোমরা ভাল আছ,

তোমার কল্যাণ।

সপ্তত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। নাসিরিয়া দখলের পরেই জেনেরাল নিক্সন "কুতেল আমারা" সত্বর দখল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

ম্যাপে দেখিবেন যে "কুতেল-আমারা" টাইগ্রীশের উপর; "আমারা" এবং "বাগ্দাদে"র মাঝামাঝি বন্দর বা সহর। "আমারা" হইতে "কুতেল-আমারা" ১৫০ কি ২০০ শত মাইলের কম হইবে না।

২। নিক্সন সাহেবের মতে "কুতেল-আমারা" ব্রিটিশদের অধিকার ভুক্ত হইলে ঐখানে সৈনিকদের কেন্দ্র স্থান করা যাইবে। তাহা হইলে "আমারা" ও "নাসিরিয়া" দুইই তুরস্কদের পুনরায় আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। "কুতেল-আমারা" আর "নাসিরিয়ার" মধ্যে যে "শাটেল-হাই" নামক খাল আছে তাহার ভিতর দিয়া ব্রিটিশরা নৌকা, জাহাজ, রণপোত, সৈন্য সামন্ত লইয়া টাইগ্রীশ হইতে ইউফ্রেটীজে সহজে পৌঁছিতে পারিবে।

৩। তিনি আরও বলেন যে "নাসিরিয়া ত হাতে আসিয়াছে, এখন "কুতেল-আমারা" হাতে আসিলে "আমারা"তে

কি নাসিরিয়াতে ব্রিটিশদের অধিক সৈন্য সামন্ত রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। বাগ্‌দাদ হইতে তুরস্ক সেনা ব্রিটিশ-দের "কুতেল-আমারা—শাটেল-হাই—নাসিরিয়া লাইন বা গণ্ডি" ভাঙ্গিতে হয়ত চেষ্টা ও করিবেনা; চেষ্টা করিলেও ঐ লাইন ভেদ করিতে পারিবে না। ঐ লাইনের নীচে তুরস্কদের যাইতে দেওয়া হইবে না। কাজেই তুরস্কেরা বসরাতে কি তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব স্থিত ব্রিটিশদের তৈলের আড়ত আবাদানে কোন প্রকারেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না"।

ঐরূপ যুক্তিযুক্ত ও গবেষণাপূর্ণ মন্তব্যের দ্বারা নিক্সন সাহেব ভারত গভর্ণমেণ্টকে মুগ্ধ করেন এবং সত্বর "কুতেল-আমারা" অধিকার করিবার হুকুম প্রাপ্ত হয়েন।

৪। "আমারা" বিজয়ের পর টাউনশেণ্ড সাহেব পীড়িত অবস্থায় ছুটী লইয়া ভারতবর্ষে সিমলা পাহাড়ে আরোগ্যলাভ করিতে আইসেন। উহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং ইরাক-বিজয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বড়লাট ও জঙ্গিলাট তাঁহাকে পরামর্শ দেন।

৫। জেনেরাল টাউনশেণ্ড যখন সিমলা-পাহাড়ে তখনই "নাসিরিয়া" দখল হয়। তাঁর বদলে "আমারা"তে ৬নং ডিভিজানের নেতার কাজ কিছুদিন জেনেরাল ডিলামেন

ও জেনেরাল ফ্রাই করেন। সেই সময়ে—৬নং ডিভিজানের কতক কতক রেজিমেণ্টকে "নাসিরিয়ার" যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য "আমারা" হইতে "নাসিরিয়া"তে পাঠান হয়। নাসিরিয়া-বিজয় এত শীঘ্র হইয়া গেল যে ঐ সব রেজিমেণ্ট দিগকে বিশেষ কোনও কাজে লাগান হয় নাই। উহারা "আমারা"তে ফিরিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে কল্যাণ, বসরাতে না গিয়া, "আমারা"য় পেঁাছে।

৬। সিমলা পাহাড় হইতে জেনেরাল টাউনশেণ্ড ফেরৎ গিয়া ২১শে আগষ্ট (১৯১৫ খ্রীঃ) বসরায় পেঁাছান এবং দুইদিন ধরিয়া নিক্সন সাহেবের সহিত "কুতেল-আমারা" আক্রমণের বিষয় পরামর্শ করেন। উঁহাকে নিক্সন সাহেব লিখিত হুকুম দেন যে "তুমি 'কুতেল-আমারা' দখল ত করিবেই; শত্রুপক্ষ তোমাকে প্রতিহাতে বাধা দিবে। তাহাদিগকে তুমি সমূলে ধ্বংস ও উচ্ছেদ করিবে। এখন হইতে তোমার জীবনের ব্রত এই হইল।"

৭। নিক্সন সাহেব বিশেষ করিয়া টাউনশেণ্ড সাহেবকে বুঝাইয়া দেন যে বাগ্‌দাদ দখল করিতে গভর্ণমেণ্টের নিষেধ। তাহাতে টাউনশেণ্ড নাকি বলেন যে "শত্রু পক্ষ যুদ্ধে হারিয়া যদি বাগ্‌দাদে পলায় ত তাহাদের পিছু পিছু তাড়না করিতে

বাগ্‌দাদ অবধি যাইতেই হইবে; আর সেখানে গিয়া নিতান্ত পক্ষে ব্রিটিশ স্ত্রীলোকদের—যাঁহাদের বাগ্‌দাদে তুরস্কেরা আটকাইয়া রাখিয়াছে—সেখানহইতে বসরায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।" তাহাতে নাকি নিক্সন সাহেব কোনও আপত্তি করেন নাই; বরং বলিয়াছিলেন "যখন জয়ী হয়ে বাগ্‌দাদে প্রবেশ করিবে তখন তারে আমাকে খবর দিও, চাইকি আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারি।"

হায়রে! অদৃষ্ট! মানুষের উচ্চ-আশা, কল্পনা, জল্পনা আকাঙ্ক্ষা—সবই সেই উচ্চ কল্পনা রাজ্যেই থাকিয়া যায়—মর্ত্ত্যে, কার্য্যক্ষেত্রে, তাহার বিকাশের আর অবসর মেলে না। টাউনশেণ্ডের জীবনেও তাহাই হইয়াছিল।

৮। জাহাজে করিয়া বসরা হইতে "আমারা" পৌঁছিতে তিন দিন লাগে। টাউনশেণ্ড সাহেব ২৫শে আগষ্ট বসরা ছাড়িয়া ২৮শে আগষ্ট "আমারা"তে পৌঁছান। সেই দিনেই তিনি "কুতেল-আমারা" দখল করিবার প্ল্যান ঠিকঠাক করিয়া ফেলেন। মোটামুটি সেই প্ল্যানটা এই:—"শত্রুপক্ষের সেনারা ছত্রভঙ্গ ভাবে টাইগ্রীশের দুই ধারে হেথা সেথা রক্ষিত আছে কিন্তু নদীর উপর, উহাদের পার হইবার কোনও পুল নাই। এইরূপ অবস্থায় উহাদিগকে নদীর বাম ধার দিয়া আক্রমণ করাই শ্রেয়ঃ।

যদি উহারা প্রথম যুদ্ধেই পলায় ত ব্রিটিশ-ফৌজ জলে আর স্থলে দু'দিক দিয়া উহাদিগকে তাঁড়াইতে তাড়াইতে বাগ্‌দাদে প্রবেশ করিবে।"

৯। টাউনশেণ্ড সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর (১৯১৫ খ্রীঃ) হইতেই "আমারা" ছাড়াইয়া "কুতেল আমারার" দিকে "আলি-ঘারবী" নামক এক পল্লীগ্রামে ব্রিটিশ-ফৌজ পাঠাইতে আরম্ভ করেন। স্থলপথে, আলি-ঘারবী, "আমারা" হইতে ৮০ মাইল আর জলপথে ১২০ মাইল দূর।

উঁহার সাহায্যের জন্য ২রা সেপ্টেম্বর নিক্সন সাহেব ১২নং ডিভিজানের ৩০নং ব্রিগেডের সৈন্যদিগকে "আমারা" হইতে কুতেল-আমারার পথ রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিলেন। তাহাতে টাউনশেণ্ড সাহেবের সুবিধা এই হইল যে—উনি ৬নং ডিভিজানের সমস্ত লোককেই যুদ্ধে লাগাইতে পারিবেন।

উঁহারা দুই জনেই এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যাহাতে "কুতেল-আমারা" খুব শীঘ্র ব্রিটিশদের কবলে আইসে। এই সময়ে তুরস্ক এক মন্তব্য প্রকাশ করে যে বাগ্‌দাদ হইতে ব্রিটিশ-স্ত্রীলোকদের কোন মতে ছাড়িয়া দিবে না।

১০। ব্রিটিশদের গুপ্তচরে এই খবর আনে যে—তুরস্ক

"কুতেল-আমারা" রক্ষা করিবার জন্য ছয় হাজার সৈন্য এবং ১২টা কামান যোগাড় করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০০ সৈন্য ও ৫টা কামান, বাগ্‌দাদের নিকটবর্ত্তী 'টেসিফন' গ্রামে রাখা হইয়াছে—আর সেখানে খুব ভাল করিয়া ট্রেঞ্চ কাটিয়া ঐ সব সৈন্য ও কামানগুলাকে গুপ্তভাবে সাজাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

বাগ্‌দাদের খবর এই যে তথায় তুরস্ক ৮টা রেজিমেণ্ট এবং ১২টা কামান যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে; ইউফ্রেটীজের কুলে "কিফি" গ্রামে ৩ হাজার ফৌজ আছে। প্রয়োজন মত যুদ্ধে যোগান দিবার জন্য "মোসল্" সহরে ৬ হাজার এবং "থানিকুইন" গ্রামে ৩ হাজার সৈন্য রহিয়াছে।

আরও গুপ্ত খবর পৌঁছে যে তুরস্ক খুব ব্যস্ততার ও আগ্রহের সহিত পূর্ব্বোক্ত "আলি-ঘারবী" গ্রাম রক্ষার জন্য ফৌজ পাঠাইতেছে।

১১। যেমন দলে দলে ব্রিটিশ ফৌজ ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ১১ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে "আলি-ঘারবী" গ্রামে পৌঁছিয়া নিজ আড্ডা শক্ত করিয়া বাঁধিতে লাগিল, তেমনি মধ্যে মধ্যে তুরস্কের প্রেরিত রেজিমেণ্টদের সঙ্গে ছোট ছোট ভাবে সংঘর্ষণ ও চলিল। ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য যে তাঁহারা আলি-ঘারবীতে একটা

সৈনিকদের কেন্দ্র করিয়া ব্রিটিশ-ফৌজকে "কুতেল-আমারা"র দিকে ঠেলিবেন। "আলি-ঘারবী" হইতে নদীর ধারের আঁকা বাঁকা পথ দিয়া "কুতেল-আমারা" প্রায় ১৫০ মাইল হইবে।

১২। বসরা হইতে "আমারা" পর্য্যন্ত পথ আগলাইবার জন্য জেনেরাল গরিঞ্জ নিয়োজিত হইলেন। তিনি বড় বড় কামান আর বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া "আমারা"তে আসিয়া বসিলেন। ব্রিটিশদের যুদ্ধের সদর-ষ্টেশন ও সেই খানে উঠিয়া আসিল। তথায় জেনেরাল নিক্সন স্বয়ং ১৫ই সেপ্টেম্বরে বসরা হইতে উপস্থিত হইলেন।

জলপথে "কুতেল আমারা"র দিকে আগুয়ান হইবার জন্য ব্রিটিশদের সেই পুরাতন রণপোত গুলা "কমেট," "সয়তান," "সুমন" আসিয়া আমারায় জুটিল। উহাদের সর্ব্বোচ্চ কমাণ্ডার হইলেন কুকর্সন সাহেব।

১৩। "আলি-ঘারবী" ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে হাঁটিয়া ব্রিটিশ-ফৌজের আগুয়ান-দল ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে "সুনাইয়াট" গ্রামে উপস্থিত হইল। সে গ্রাম, "কুতেল-আমারা" হইতে ২৫ মাইল হইবে। তুরস্কেরা "কুতেল-আমারা" ছাড়িয়া, ১৭ মাইল আগ-বাড়িয়া যেখানে ফৌজদের সদর করিয়াছিল—সেখান হইতে ঐ "সুনাইয়াট" গ্রাম মাত্র ৮ মাইল

দূরে। তখন তুরস্কের তরফে ইরাক খণ্ডে ব্রিটিশদের বিপক্ষে যুদ্ধ চালাইবার সর্ব্বোচ্চ সেনাপতি ছিলেন জেনেরাল নুর্‌উদ্দিন।

১৪। এই সময় সেখানে দিনমানে অত্যন্ত গরম। এমন কি ছায়া তলে ১১০ ডিগ্রি হইতে ১২০ ডিগ্রী অবধি সূর্য্যের তাপ উঠে। কিন্তু রাত্রিকালে আর খুব ভোরে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। ১২ই হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ খুব ভোর থেকে বেলা ৪॥০টা অবধি মার্চ করিয়া ব্রিটিশ-ফৌজদের ভিতর অনেক গোরা-সৈনিক সর্দ্দি-গরমিতে মারা পড়ে।

১৫। ব্রিটিশ ফৌজদের পক্ষে "সুনাইয়াট" গ্রামে পৌঁছিবার মার্চ নিতান্তই কষ্টকর হইয়াছিল। পথ অতি বিশ্রী, গ্রীষ্মের ত কথাই নাই, তার উপর রসদ, খাদ্য ও জল ইত্যাদি আনিবার বিলম্বে লোকেরা নিতান্ত জখম হইয়া পড়িত।

১৬। ব্রিটিশদের "সুনাইয়াট" গ্রামে আসিবার পথে তুরস্কেরা বিলক্ষণ বাধা দেয়। ইহার বর্ণনা কল্যাণের ২৪শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে পাইবেন। উহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

২৪-৯-১৫

মা,

আমাদের রাত্রের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ২০ মাইল আসিতে হইয়াছে। আমি সকলের শেষে পৌঁছিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ঘোড়াটা খুব ভাল, তার দোষে দেরি হয় নি। আমি মরা মানুষের উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইতে পারি নাই। নামিয়া নামিয়া সরাইয়া যাইতে দেরি হইয়া গেল। পথে যে একটা করুণার কাণ্ড হয়ে গেল, তোমায় না লিখে থাক্‌তে পাচ্ছি না।

একটা মৃত্যুমুখী সাহেব, জলের জন্য হাঁ করিতেছিল। আমাদের খাবার জন্য মাপা জল, সোডা ওয়াটারের বোতলে প্রত্যেককে দেওয়া হয়, তা সঙ্গেই থাকে। তাই আমার হ্যাণ্ড ব্যাগে ছিল। তাই বার করে তার মুখে একটু দিতে বোধ হল যেন সে খুব আরাম বোধ কল্লে। তারপর মুখ বাড়িয়ে, হাঁ করে আমার পা টা যেন কামড়াইতে চায় বোধ হল। আমি শিগ্‌গির সরিয়া পড়াতে দেখলাম তার হাতটা যেন কপালে ছোঁয়াবার চেষ্টা কল্লে। আর তার চোক দিয়ে জল গড়াতে লাগল। তখন আমি আবার তার কাছে গেলাম। বোধ হয় সে আমার পায়ে চুমো খাবার জন্যই সেই রকম হাঁ করেছিল।

আমি তাকে মড়ার গাদা থেকে সরাইবামাত্র তার প্রাণ বাহির হইয়া গেল

এখানে আসিয়া আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হচ্চে; খুব উঁচু করে মাটির পাঁচিল গেথে, তাতে ঠেস দিয়া আমরা তিন রাত্রি ও তিন দিন ছিলাম। অনবরত শত্রুর গোলা যেন বৃষ্টির ধারার মত পড়িতে লাগিল। তিন দিন পরে থামিল। তবুও পাঁচিলের কাছ ছাড়িয়া আসিতে কাহারও সাহস হয় না। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় আমরা সকলেই বাঁচিয়া গেছি। কেবল একটী কুলির পায়ে একটা গুলি লেগে, খুব খানিক রক্ত পড়ে। এখন সে ভালই আছে।

এখান থেকে আবার কাল সকালেই বেরুতে হবে। এবার "কুতেল আমারা"য় যেতে হচ্ছে। সব সরঞ্জাম চলে গেছে। এবার থেকে খুব দেরিতে চিঠি পাবে বোধ হয়। ভেবো না, আমার সব চিঠিই বোধ হয় পেয়েছ। আমি তোমার চিঠি অনেক দিন পাই নাই। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার—কল্যাণ।

অষ্টাত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

১। জেনেরাল টাউনশেণ্ড "সুনাইয়াট" গ্রামে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াই রণপোতগুলাকে দিয়া "আমারা" হইতে বড় বড় কামান ইত্যাদি শীঘ্র আনাইয়া লয়েন। ঐ সব যুদ্ধের আসবাব ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছিয়া যায়।

ইতিমধ্যে মেজর রাইলী এইরোপ্লেনে চড়িয়া তুরস্কেরা কি করিতেছে—কোথায় কোথায় ট্রেঞ্চ কাটিয়া উহাদের কামান, ফৌজ ইত্যাদি বসাইতেছে তাহার একটী প্ল্যান তৈয়ারী করিয়া টাউনশেণ্ডের হস্তে দেন।

উহাতে জানা যায় যে নদীর উত্তর ধারে পেঁকো ও জলা স্থানগুলার মাঝামাঝি ২ মাইল আন্দাজ যে কঠিন জমি আছে তার উপর দিয়া সৈন্যেরা চলিতে পারে।

২। তুরস্কের জেনেরাল নুরউদ্দিন আরও অনেক সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ খবরও টাউনশেণ্ড পাইয়া যান, তাই তিনি ৩০ নং ব্রিগেডের লোকদের (যাহারা পথ-রক্ষা করিবার জন্য "আমারা"তে আসিয়াছিল) যুদ্ধে লাগাইবার হুকুম ও নিক্সনের নিকট হইতে লয়েন।

৩। ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে "সুনাইয়াট" গ্রামে ব্রিটিশদের ১১০০০ হাজার সৈন্য, ২৮টী কামান, ৪০টী মেশীনগন্‌সহ সমবেত হইল। "কুতেল-আমারা"য় যে যুদ্ধ হইবে তার অনুষ্ঠানের ত্রুটী রহিল না। জেনেরাল নিক্সন স্বয়ং দর্শক-স্বরূপ "মালামার" জাহাজে উপস্থিত হইলেন। তিনি টাউনশেণ্ডকে আশ্বাস দিয়া বলেনঃ—"এই যুদ্ধে তুমিই কর্ত্তা, আমি কোন অংশে হস্তক্ষেপ করিব না; চক্ষের সাধ মিটাইয়া দেখিতে আসিয়াছি। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, ব্রিটিশদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য—তাহার পরামর্শ সময় মত দিব। তাই তোমার হাতের কাছেই থাকিতে ইচ্ছা করি।"

৪। ম্যাপে দেখিবেন যে টাইগ্রীশ "কুতেল আমারা" হইতে "সুনাইয়াট" গ্রাম পর্য্যন্ত, প্রায় ২৫ মাইল, উত্তর-পূর্ব্ব বাহিনী হইয়াছে।

তুরস্কেরা ভাল করিয়া ব্রিটিশ আক্রমণ হইতে "কুতেল-আমারা" রক্ষা করিবে বলিয়া কয়েক মাস ধরিয়া উহার ১৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে আসিয়া নদীর দুই ধারে স্থানে স্থানে ভাল ভাল ট্রেঞ্চ কাটিয়া কামান ইত্যাদি পুঁতিয়া রাখিয়া উহাদের সেনা-দলকে সাজাইয়াছে; যুদ্ধের প্রয়োজ

মত উহাদের নদীর এপার ওপার করাইবার জন্য পাঁচ মাইল উত্তরে একটা নৌকার পুল ও প্রস্তুত করাইয়াছে।

৫। তুরস্কদের সৈন্য সাজান এইরূপ ভাবে ছিল:—টাইগ্রীশের ডান ধারে, ৩৫নং ডিভিজানের ৬টি বেটালিয়ান, বাম ধারে ৩৮নং ডিভিজানের ৬টি বেটালিয়ান আর ঐ পুলের নিকট ৪টি বেটালিয়ান; অশ্বারোহীর দুই রেজিমেণ্টের দল; ৪০০ শত উষ্ট্রারোহীর দল; আর অনেক আরবী ঘোড় সওয়ার। সর্ব্বশুদ্ধ উহাদের ৬০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য; তাহার মধ্যে বার আনা রকমের সৈন্য ছিল আরবী-জাতীয়—আর চারি আনা রকমের ছিল খাঁটি তুরস্ক-জাতীয়।

৬। আরবী সৈন্য দায়িত্ব-বোধ-শূন্য চঞ্চলমতি; কখন্ উহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে ঠিক নাই। তুরস্কের সৈন্য-গঠন প্রণালী দেখিলে এই প্রতীয়মান হয় যে আরবী সৈন্যগণকে ঠিক পথে রাখিবার জন্যই যেন ঐ চারি আনা রকমের তুরস্ক সৈন্য আরবী সৈন্যদের সঙ্গে মিলান হইয়াছে।

৭। ২৬শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ফৌজেরা "সুনাইয়াট্ হইতে "সুখৈলাট্" গ্রামে অগ্রসর হইল। উহা তুরস্কদের যুদ্ধের লাইন হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে।

"কুতেল-আমারা"র মহা-যুদ্ধের দিন ঘনাইয়া আসিল

ব্রিটিশদের তরফের জেনেরালেরা নিজেদের সেনা-দলকে গুছাইয় একটা বাঁধা প্ল্যানের অনুযায়ী তুরস্কদের আক্রমণ করিবেন, এই স্থির হয়। সেই প্ল্যান টাউনশেণ্ডই বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্ল্যানটা এই যেঃ—ব্রিটিশরা নদীর বামদিক দিয়া তুরস্ক ফৌজকে আক্রমণ করিবে। শত্রুকে কিন্তু ভুল বুঝাইবার জন্য ব্রিটিশরা নিজেদের শিবির ইত্যাদি নদীর ডানদিকেই গড়িতে লাগিল—যেন ব্রিটিশদের জোর নদীর ডান ধারে। আর ঐ ধার দিয়াই উহারা আক্রমণ করিবে।

৮। জেনেরাল নুরউদ্দিন ভাবিয়াছিলেন যে ব্রিটিশরা যে প্রণালীতে নাসিরিয়া আক্রমণ করিয়াছিল সেই রূপেই উহারা "কুতেল-আমারা" ও আক্রমণ করিবে। নুর্উদ্দিনের সেটাতে ভুল হইয়াছিল।

নুর্উদ্দিনের মনে ঐরূপ একটা ভুল রাখিবার জন্যই, প্রকাশ্য ভাবে জেনেরাল ডিলামেন সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন নদীর ডান ধার দিয়া, আর নদীর বাম ধার দিয়া চলিলেন জেনেরাল ফ্রাই বাদবাকী সেনা-দলকে লইয়া।

৯। কিন্তু ডিলামেনের উপর ভার ছিল শত্রুকে নদীর বাম দিক দিয়া আক্রমণ করিবার।

ব্রিটিশ ফৌজ যাহাতে সহজে নদীর এপার ওপার হইতে

তার জন্য একটা পুল তৈয়ারী করিয়া নানা টুকরাতে তাহাকে কাটিয়া, জাহাজে লওয়া হইয়াছিল। নদীর এক নিভৃত বাঁকের উপর, যাহা তুরস্কদের লাইন হইতে দেখা না যায়---এমন স্থানে উহা ঐ ২৬শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা রাত্রে বসাইয়া ফিট্ করিয়া ফেলা হয়।

১০। ২৬শে ২৭শে দুইরাত্রে ব্রিটিশরা নদীর বামদিকে অনেক পেঁকো ও বড় বড় ঘেসো জমীর ধারে ধারে গুপ্ত ভাবে ট্রেঞ্চ কাটিয়া ফৌজ ও কামান ইত্যাদি সাজাইয়া ফেলেন। টাউনশেণ্ড যুদ্ধ পরিচালন করিবেন বলিয়া বহুদূরে এক উচ্চ মাচা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে দূরবীণে দেখিয়া—টেলিফোনে এবং ওয়ারলেস-টেলিগ্রামে সব হুকুম দিবার ও কাজ চালাইবার সুবন্দোবস্ত হইল—তা ছাড়া ব্রিটিশদের সঙ্গে তিন চার খানা এইরোপ্লেন ও ছিল, যুদ্ধের খবর—শত্রু পক্ষের খবর দিবার জন্য।

১১। ২৭।২৮শের দুপুর-রাত্রির ভিতর ডিলামেন তাঁর সমস্ত সেনা-দলকে—নদীর বাম বা উত্তর দিকে, তুরস্কদের লাইনের প্রায় ৫ মাইল দূরে এক নিভৃত স্থানে সমবেত করাইয়া ফেলিলেন। আর রাত ২টা হইতে তুরস্কদের ট্রেঞ্চ, হইতে ঘেরাও করিবার অভিপ্রায়ে, প্ল্যান-মত রেজিমেণ্টের

পর রেজিমেণ্টকে তাদের স্ব স্ব জেনেরালদের অধীনে মার্চ করিবার হুকুম দিলেন।

১২। এখন তুরস্কেরা কি ভাবে ব্রিটিশদের টাইগ্রীশের উত্তর দিক দিয়া "কুতেল আমারা"য় পৌঁছিবার গতি রোধ করিতে পারে এবং তজ্জন্য নিজেদের ভিতর কিরূপ আয়োজন করিয়াছিল তাহা একটু বুঝিবার প্রয়োজন।

"কুতেল আমারা" ছাড়িয়া মাইল ১২ নদী-পথে নীচে আসিয়া তুরস্ক-সৈন্যদের ট্রেঞ্চ হইতে ৫ মাইল দূরে উহাদেরই এপার ওপার হইবার জন্য নৌকার-পুল নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ঐ পুল হইতে নদী তিন মাইল পূর্ব্ব-বাহিনী হইয়া এক মস্ত বাঁক্ লইয়াছে, তাহা দেখিতে যেন ঘোড়ার খুরের আকৃতি। উহার উত্তরেই এক শুষ্ক অথচ পেঁকো হ্রদ—তাহারও আকৃতি ঘোড়ার খুরের মত। ইহার উত্তরে আধ মাইলটাক শক্ত জমী, আর তাহারও উত্তরে এক প্রকাণ্ড শুষ্ক-পেঁকো হ্রদ—নাম "সুয়াদা"। তুরস্কেরা সেই দুই শুষ্ক-পেঁকো হ্রদের মধ্যস্থিত শক্ত জমিতে উত্তম গড়খাই করিয়া—ট্রেঞ্চ কাটিয়া বসিয়াছিল। এই হইল যেন তুরস্কের লড়িবার "হৃদ্‌পিণ্ড"।

১৩। "সুয়াদা" হ্রদ পার হইয়া আরও চার মাইল উত্তরে

আর এক শুষ্ক-পেঁকো হ্রদ পাওয়া যায়—নাম “আটাবা”। এই দুই হ্রদের মধ্যবর্ত্তী কঠিন জমীতে তিনটা গড়খাই তুরস্কেরা তৈয়ার করে। উহাদের বাহিরের ব্যবধান প্রায় আধ ক্রোশ করিয়া কিন্তু ভিতরে ভিতরে সুড়ঙ্গ কাটাইয়া লওয়াতে তিনটা গড়খাইয়ের মধ্যে যাতায়াতের সুন্দর ও সুবিধাজনক পথ। তারি পার্শ্বে ট্রেঞ্চ কাটা। বড় বড় কামান সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া ট্রেঞ্চে আনা খুব সহজ। ঐ সহজ উপায়ে অনেক কামান লইয়া ট্রেঞ্চ সাজানও হইয়াছিল।

“আটাবা” হ্রদের পূর্ব্বে এক মাইল কঠিন জমী। তার পূর্ব্বে আর একটা ঐ রকম শুষ্ক-পেঁকো প্রকাণ্ড হ্রদ—নাম “সুয়াইকিয়া”।

১৪। যে স্থানে ব্রিটিশদের পুল বসান হইয়াছিল সেখান হইতে এক মাইল উত্তরের দিকে যাইলে বামে পড়ে “সুয়াদা” হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ্। আরও ৪ মাইল উত্তরে যাইলে পাওয়া যায় “সুয়াইকিয়া” হ্রদের দক্ষিণ পাড়। সেখান হইতে আর তিন মাইল উত্তরে যাইলে পাওয়া যায় “আটাবা” হ্রদের উত্তর কোণ্।

১৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভিলামেন সাহেব ২টা রাত্রে রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্টকে প্ল্যান-মত মার্চ করিবার হুকুম

দিলেন—তাহার মানে ছিল যে ব্রিটিশ ফৌজেরা "সুয়াদা" হ্রদকে বামে রাখিয়া, "সুয়াইকিয়া" হ্রদকে ডাইনে রাখিয়া, "আটাবা" হ্রদের উত্তরদিক ঘুরিয়া তুরস্কদের সেই এক মাইল-ঘোড়া সুড়ঙ্গ ও তিনটা গড়খাইয়ের পশ্চিমে আসিয়া শত্রু-পক্ষকে পিছন হইতে ঘেরাও করিয়া আক্রমণ করিবে।

১৬। ডিলামেন সাহেব শত্রু পক্ষকে ঐরূপে ঘেরাও করিবার সম্পূর্ণ ভার দেন জেনেরাল হড্সনের উপর। তাঁর উপর হুকুম ছিল—ভোর ৭টা কি ৭॥টার মধ্যে যেন সৈন্যরা ধীরে ধীরে হাঁটিয়া, অধিক ক্লান্ত না হইয়া পিছন দিক হইতে তুরস্কদের ট্রেঞ্চ আক্রমণ করে। তাহার সঙ্কেত পাইলেই, এক সময়েই ডিলামেন সাহেব নিজে, তুরস্কদের সেই ঘোড়ার-খুরের মত যে "হৃদ্‌পিণ্ড" তাহা আক্রমণ করিবেন; ইহাও হড্সনকে বলা ছিল।

১৭। ২৮শে সেপ্টেম্বর সমস্ত দিন, সূর্য্যাস্ত অবধি দু'পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল—তুরস্কেরা খুব লড়িয়াছিল। দু'পক্ষেরই অনেক আহত হইয়াছিল আর অনেক মরিয়াছিল।

সূর্য্যাস্তের সময় তুরস্কেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। ডিলামেন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সেই "হৃদ্‌পিণ্ড" হইতে তুরস্ক-ফৌজদের তাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু টেলিফোণের তার কাটিয়া

গিয়াছিল বলিয়া হড্‌সনের খবর আর সে রাত্রে পাওয়া যায় নাই।

১৮। সূর্য্যাস্তের পর হড্‌সন সসৈন্যে সেই সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া দেখেন যে তুরস্ক-ফৌজ ভাল ভাল কামান ইত্যাদি লইয়া পলাইয়াছে। ইঁহারা শত্রুর সুড়ঙ্গেই সেই রাত্রের মত আশ্রয় লইলেন এবং যে যেখানে ছিলেন মাটীতে শুইয়া পড়িলেন। ডিলামেনকে কি টাউনশেণ্ডকে খবর দিবার আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

১৯। "কল্যাণ" সে যুদ্ধে ছিল। তার মায়ের চিঠিতে তার নিজের বর্ণনা পাঠকের হৃদয়-গ্রাহী হইবে বলিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

১লা অক্টোবর ১৯১৫ কুতেল-আমারার যুদ্ধ

মা—

আমরা নাসিরিয়া ছেড়ে "আমারা"য় এসে দু'দিন ছিলাম, তার পরেই—আগে চ'লে এসেছি। শত্রুর পরিখার প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে আমাদের সব আয়োজন হচ্ছিল। সৈন্য সংখ্যা দিতে পারি না। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে এ পর্য্যন্ত মেসোপোটেমিয়ায় যত যুদ্ধ হয়েছে, তাতে একেবারে এত সৈন্য আমাদের দিক থেকে নিযুক্ত হয়নি ও এ রকম বৃহৎ

বন্দোবস্ত হয়নি। এরোপ্লেন, হাইড্রোপ্লেন, বর্ম্মপরা মোটর-কার, অ্যাম্বুল্যান্স কিছুরই ক্রুটি হয়নি।

আমাদের ব্রিগেড সাম্‌নে থেকে আক্রমণ করেছিল কিন্তু যুদ্ধ প্রায় সবই কামানে কামানে হয়েছিল।

"নাসিরিয়া"য় যেমন গুলির সাঁই সাঁই, এখানে তেমনি কামানের বুম্ বুম্। তারপর হাউয়ের মত মাথার উপর গোলা ফোটা। রাত্রিবেলা দেখ্‌তে বেশ, ঠিক তারাবাজি। বেশ আলোর ফ্ল্যাশ দেখা যায়। দিনের বেলা আলোটা দেখা যায় না। গোলা ফাটার ধোঁয়া দেখা যায় ও সেই সঙ্গে যে গোলা ফোটে তার ভিতরকার গুলি গুলো শিলাবৃষ্টির মত পড়ে। ঠিক যেন একটা অদৃশ্য হাতে আকাশ থেকে একমুঠো ছোট পাথর ছুঁড়ছে, সেই রকম ভাবে গুলি গুলো ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের তিন দিন বিস্কুট ও টিনের মাংস খেয়ে ট্রেঞ্চে মাথা গুঁজে পড়ে থাক্‌তে হয়েছিল।

যে কাপড় পরে ২৬শে বাহির হয়েছিলাম, তাই পরে ৪ দিন (২৯শে পর্য্যন্ত) ধূলায় শুয়ে কোন রকমে রাত্রি কাটাতে হয়েছিল। স্নান দূরের কথা, দাঁত মাজা বা দাড়ি কামাইবার জিনিস পত্রও ছিল না। বিছানা পত্র ত ছিলই না। কম্বলও সে চার দিন এসে পৌঁছায় নাই। একদিন খাবারও সামনে

আন্‌তে পারে নাই। ডুলি বেহারা বেচারারা ২৫ ঘণ্টা খেতে পায় নাই।

আমাদের ভাগ্য ভাল যে অত গোলা গুলির ভিতর চলা ফেরা করেও কাকেও লাগে নাই। ৩।৪ বার আমাদের দলের ভিতর গোলা পড়েছিল কিন্তু কেবল একটা ডুলি বেহারার পাগড়ী ফাতরাফাঁই হয়েছিল; কাহাকেও লাগে নাই।

তার তখনকার অবস্থা মনে করে এখন হাসি পাচ্চে কিন্তু তখন ভেবেছিলাম তার মাথা উড়ে গেল।

যাহোক এবার খুব বড় রকম জয় হয়েছে। শত্রুদের ট্রেঞ্চ চমৎকার দেখলাম। প্রায় ৩ মাস ধরে তারা ঐ তৈয়ারী করেছিল নিজেদের বাঁচাইবার জন্য।

নদীর দু'ধারের পথ প্রায় ৪ মাইল করে লম্বা। নদীতে জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়ে রেখে রাস্তা বন্ধ করেছিল।

ট্রেঞ্চ সুন্দর কাদা দিয়ে লেপে ঠিক ঘরের মত করা; ৫ ফুটের বেশী গভীর। তার সামনে দু'লাইন গর্ত্ত—তার ভিতর পড়লে আর উঠবার যো নাই। তার সামনে খানিক দূর কাঁটাওয়ালা তারের বেড়া, তার সামনে খানিক দূর পর্য্যন্ত বম্ পোঁতা। আমাদের দল গোলার উপর গোলা চালাইয়াছিল, আর একদল এই অবসরে প্রায় ২০ মাইল মার্চ করে শত্রুর পিছনে

গিয়ে আক্রমণ করেছিল। পিছনে এসে পড়েছে দেখেই শত্রু পলাতে আরম্ভ করে।

এখন আবার তাঁবু পেতে ভদ্র লোকের মত আছি। হাঁস-পাতাল অবশ্য জখমীতে ভর্ত্তি। ইতি

তোমার কল্যাণ।

২০। "কুতেল আমারা" হইতে কল্যাণ ৪ঠা অক্টোবর আর একখানা চিঠি বিনোদিনীকে পাঠায়; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

৪ঠা অক্টোবর

মা,

যুদ্ধ তো আপাততঃ থেমেছে। আমরা আবার ক্যাম্প পেতে বসেছি। দিন কতক আগে শুনেছিলাম যে এর চেয়ে আগে যাবার হুকুম নেই। এই "কুতেল-আমারা" নেবার জন্যে ও বিশেষ অনুমতি নিতে হয়ে ছিল। এ তো খুব জয় হয়েছে। খুব কঠিন যায়গা থেকে—শত্রুকে তাড়ান হয়েছে। ইউক্রে-টীজের ওপর নাসিরিয়া ও টাইগ্রীশের ওপর "কুত" দখল করা হয়েছে। আর আগে যাবার দরকার কি। এটা যত বড় রকম যুদ্ধ হয়েছে—যত সৈন্য আমাদের দিক থেকে নিযুক্ত হয়েছে—তার পক্ষে হত আহত কমই বলতে হবে। অধিকাংশ

আহতই সামান্য হাতে পায়ে লাগা—কেবল ৮৫ জন মাত্র মরেছে।

আমাদের কদিন খুব কষ্ট গেছে। সমস্ত দিন রোদে—তাও মাথা সোজা করবার যো নেই। কেবল ওপর দিয়ে গোলা চলেছে। রাত্রে বিস্কুট আর জল খেয়ে অমনি ঘাড় গুঁজে ধূলোয় পড়ে থাকা—লোকের শরীর ভেঙ্গে পড়েনা এই আশ্চর্য্য!

দিনের বেলা এখনও বেশ গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে। আশা করি কিছু দিন, অন্ততঃ কিছু দিন, জিরোতে পাব। যুদ্ধ দেখবার সাধ মিটে গেছে। আর হত আহত দেখতে ইচ্ছা নাই।

রাশি রাশি আহত আমাদের নিজেদের ও তুর্কীদের জাহাজে করে "আমারা"য় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের অনেকেই অবশ্য বেঙ্গল অ্যামবুলেন্সে যাবে। কাহার হাত ভাঙ্গা পা ভাঙ্গা—সব জল জল কচ্চে—তবু যুদ্ধের মহিমা ও গৌরব লোকে ঘোষণা করবে, যুদ্ধের উপকারিতা দেখাতে চেস্টা করবে। তবু স্বদেশ প্রেম স্বজাতি প্রেম—এই সব কথার ওজর করে—লোকে লোকের গলা কাটার উদ্যোগ করবে। স্বদেশ প্রেমের মত সঙ্কীর্ণ অধর্ম্মরিপু জগতে আর নেই। ধর্ম্মের নাম করে যত রক্তপাত নিষ্ঠুরতা হয়েছে, স্বদেশ প্রেমের নাম করে তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশী হয়েছে। আর এদানি সব যুদ্ধেই পয়সা-ওয়ালা লর্ড

ইত্যাদির পয়সা-রোজকারের জন্য বোকা প্রজাদের. দেশের নামে, স্বদেশ প্রেমের নামে ভুলিয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত করেছে। "প্যাট্রিয়টিস্ম" (বা "স্বদেশ-প্রেম") কথাটা ইউরোপীয় অভিধানে না থাকলে অনেক রক্তপাত কম হত।

আমাদের দেশেও "প্যাট্রিয়টিস্ম" এর নাম করে অনেক নেতারা ছোট ছোট স্কুলের ছেলেদের খুন করতে শিখিয়েছেন।

যে হত্যা মহাপাতক, প্যাট্রিয়টিস্মের দোহাই দিলেই তা মহাপুণ্য। একজন মানুষ আর একজনের বিষয় ছলে বলে কেড়ে নিলে, তা ডাকাতী বা চুরী—ও মহাপাপ। আর একটা জাতি, আর একটা জাতির জমী জবাই করে কেড়ে নিলে—তাহা মহা বাহাদুরীর সাম্রাজ্য স্থাপন। যাক্‌ ও নিয়ে আর আলোচনা করে কি হবে। এখন যুদ্ধ থামলে হয়।

তোমার কল্যাণ।

ঊনচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। কুতেল-আমারা ১লা অক্টোবর দখল করিয়াই, জয়ী ব্রিটিশ ফৌজ জলপথে আর স্থলপথে তুরস্কদের ধর-পাকড়ের জন্য বহুদূর অবধি আর ৪ দিন ধরিয়া (৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত) উহাদের পিছু তাড়না করিল। জলপথে তাড়না করিবার ভার টাউনশেণ্ড নিজেই লইয়াছিলেন। টাইগ্রীশ ঐখানে এত বক্রগতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে যে ১৩২মাইল "কুতেল আমারা" ছাড়িয়া আসিবার পর "আজিজিয়া" গ্রামের কূলে উঁহার জাহাজ নঙ্গর করে। স্থলপথে "কুতেল আমারা" হইতে "আজিজিয়া" মাত্র ৬০ মাইল দূর। সেখানে এইরোপ্লেনে খবর আইসে যে পলাতক তুরস্ক সেনা আরও উত্তরে বাগ্‌দাদের পথে "টেসিফন্" গ্রামে পলাইয়াছে এবং তথায় ট্রেঞ্চের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে।

২। স্থলপথে ব্রিটিশ ফৌজ টাউনশেণ্ডের পূর্ব্বেই "আজিজিয়া"তে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। টাউনশেণ্ড ঐখানেই ব্রিটিশদের আড্ডা গাড়িলেন এবং শীঘ্র শীঘ্র টেসিফন্ আক্রমণ করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

৩। আমারা, নাসিরিয়া, কুতেল-আমারা, তিন তিনটা যুদ্ধে

ব্রিটিশরা ক্রমান্বয়ে,আর অল্পদিনের ভিতর,জয়ী হওয়াতে উঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইল। উঁহাদের কুতেল-আমারার যুদ্ধের পর হইতেই মতলব হইল বাগ্‌দাদ দখল করা। স্থির হইল যে—ব্রিটিশদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নিরাপদের স্থান হইবে বাগ্‌দাদ। আর উহাই তাড়াতাড়ি দখল করিয়া ফেলিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

৪। ব্রিটিশরা তখন জানিতেন যে ইউরোপ খণ্ডে তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলের দক্ষিণে গ্যালিপলী প্রদেশ ব্রিটিশ ফৌজ রণ-পোত সহ আক্রমণ করাতে অনেক তুরস্ক ফৌজ ব্রিটিশদের তথায় বাধা দিতে নিযুক্ত ছিল আর সেই সময়ে ব্ল্যাক-সী বা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে রুশিয়ার সহিত যুদ্ধেও তুরস্কের অনেক দল লাগান ছিল।

ব্রিটিশরা তাই ভাবিয়াছিলেন যে তুরস্ক হাজার চেষ্টা করিয়াও ইরাক খণ্ডে উহার বর্ত্তমান ফৌজদের সাহায্য করিবার উদ্দেশে অধিক সেনা সময় মত পাঠাইতে পারিবে না।

কুতেল-আমারার যুদ্ধে জয়ী হইবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই টাউনশেণ্ড সাহেব কৃতসংকল্প হইলেন যে পলাতক তুরস্ক সৈন্যকে একবার ধরিতে পারিলেই উনি ব্রিটিশ ফৌজকে বাগ্‌দাদে বসাইবেন। সমস্ত ব্রিটিশ জেনেরালদের মধ্যে টাউনশেণ্ডের

হৃদয়ে এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সাধনা, সদাই জাগিয়া থাকিত যে উহার নেতৃত্বে ব্রিটিশ-ফৌজ রণ-জয় ভেরী বাজাইতে বাজাইতে বাগদাদে প্রবেশ করিবে এবং তথায় ব্রিটিশদের লাল ধ্বজা উড্ডীন করিবে।

৫। বাগদাদে যাইবার ঐ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার একমাত্র উপায় ছিল তাড়াতাড়ি করিয়া কুতেল-আমারা হইতে পলাতক তুরস্ক ফৌজদের অসহায় অবস্থায় টেসিফন্ গ্রামে ঘিরিয়া গ্রেপ্তার করিয়া ফেলা। ঐ পলাতক ফৌজ যদি বাগদাদ হইতে নূতন তুরস্ক সেনা-দলের সহায়তা পায় তাহা হইলে টাউনশেণ্ড সাহেবের বাগদাদ পৌঁছিবার উচ্চ আশা যে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে—ইহাও তিনি বুঝিতেন।

৬। বিলাত গভর্ণমেণ্ট, কি ভারত গভর্ণমেণ্ট, কি জেনেরাল নিক্সন, কেহই টাউনশেণ্ডের ঐ উচ্চ আকাঙ্ক্ষার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন নাই বরং তার পোষকতাই করিয়াছিলেন; এবং যতদূর সম্ভব উঁহাকে নূতন সেনা-দল ও রণ-পোত ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু জলপথ ও স্থলপথ দুইই দুর্গম বলিয়া যত শীঘ্র শীঘ্র সেনা-দল উঁহার নিকট পৌঁছান উচিত ছিল ততটা হইয়া উঠে নাই।

৭। টাউনশেণ্ড ত আজিজিয়া গ্রামে সসৈন্যে বসিয়া গেলেন কিন্তু গ্রামটি তাঁর পছন্দ মত হয় নাই। গ্রামে কতকগুলি মেটে ঘর মাত্র আর যেন এক মরুভূমির মাঝখানে। যদি চড়াও করিতে করিতে টেসিফন্ ও বাগদাদে যাওয়া না হয় ত আজিজিয়ার মত স্থানে ব্রিটিশ ফৌজের কেন্দ্রস্থান হইতেই পারে না।

ঐ গ্রামের চার মাইল দূরে, নদীর এক বাঁকে, সৈনিক ফ্রেজার অন্যান্য সৈনিকদের সাহায্যে এক উচ্চ মাচান তৈয়ারী করে। উহার নাম হইল "ফ্রেজার পোষ্ট"। নদীর পথ তাদারকের পক্ষে উহাতে বিশেষ সুবিধা হইল।

৮। এইরোপ্লেনে টাউনশেণ্ডের নিকট ৬ই অক্টোবর খবর আসিল যে, তুরস্ক-ফৌজ টেসিফন্ ছাড়িয়া জলপথে ও স্থলপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রিটিশদের আক্রমণ করিবে বলিয়া—অজিজিয়া হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে "ঝোর" গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শত্রুর সে ফৌজে আছে একদল অশ্বারোহী, ৩।৪ দল পদাতিক এবং উহাদের সঙ্গে আসিতেছে দুইটা বড় গোচের কামান।

৯। ঐ খবরে শশব্যস্ত হইয়া টাউনশেণ্ড অন্যান্য জেনেরাল

দিগকে (ডিলামেন, রবার্টস্, হটন্,) শীঘ্র ডাকাইয়া পাঠান। তখন তাঁহারা আজিজিয়ার দিকেই সেনা-দলকে লইয়া স্থলপথে আসিতে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ দলকে লইয়া ১০ই অক্টোবরের মধ্যে আজিজিয়ায় উপস্থিত হইলেন।

১০। তখনও সেদেশে, দিনমানে বিলক্ষণ গরম আর রাত্রে বেশ শীত। সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছিতে সেনা-দলকে ২৫ মাইল করিয়া রোজ হাঁটিতে হয়। প্রায় সমস্ত সেনার দলই উহাতে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তার উপর সেনাদের ভিতর জ্বরের ও বেরী-বেরী রোগের প্রকোপ ও বেশ ছিল।

১১। এই সব কারণে ডিলামেন সাহেব টাউনশেণ্ডকে রিপোর্ট দেন যে "আমাদের সেনাদের আর সে জোর নাই—উহারা এত পরিশ্রমে ও পীড়ায় বে-মজবুত হইয়া পড়িয়াছে; উহাদের চিকিৎসার জন্য সঙ্গে ডাক্তারদের দল বড়ই কম। যে কয়জন ডাক্তার আছে তাহারাও খাটিয়া খাটিয়া গেল। এই সব সেনা দ্বারা আমরা অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারিব তা—আশা করা উচিত নয়।"

১২। কল্যাণ ১০ই অক্টোবরে যে চিঠি বিনোদিনীকে আজিজিয়া হইতে পাঠায় তাহা এইখানেই উদ্ধৃত হইল।

১০ই অক্টোবর ১৯১৫

মা,

তিন দিন ধরে মার্চ করতে করতে আমরা আজ এখানে এসে পৌঁছেছি। যুদ্ধ শেষ হইবার পর আমাদের হাঁসপাতাল—তাড়া করবার দলের সঙ্গে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আমাদের উপর অন্য হুকুম এল। আমাদের আগে যে দুটা ব্রিগেড ছিল তাদের অনেক আহত হয়ে ছিল—তাদের অ্যামবুলেন্স ও অনেক পিছনে ছিল। তাই আহতদের বন্দোবস্ত ও সাহায্য করতে আমাদের মার্চ করতে হল।

এদিকে আমাদের ব্রিগেড জাহাজে করে শত্রুকে তাড়া করে এইখানে এসে বসে ছিল। আমরা তিন দিন অনবরত মার্চ করে এসে ব্রিগেডকে ধরেছি। আগে শুনেছিলাম যে এদিকে বেশী এগোবার হুকুম নেই। "আমারা"র পর ঐ "কুত" বলে যায়গা—যেখানে বড় লড়াই হয়ে গেল—সেইটে নিতেও বিশেষ অনুমতি চাহিতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা নেবার পরেও—তাড়া করবার নাম করে, এতদূরে এসেছি। এখন শুনচি আর আগে যাওয়া হবেনা।

"বেঙ্গল অ্যামবুলেন্সের" ৩২ জন ছেলে, ৫টা ষ্ট্রেচার নিয়ে এই মার্চে বরাবর আমাদের সঙ্গে এসেছে। বেচারাদের এসব

অভ্যাস নেই, সব নাকের জলে চকের জলে হয়েছে। প্রথম তো সাহেব অফিসারদের ধমকানি, আবার মামুলি ডুলি ওয়ালা-দের সঙ্গে ভাব করতে আসা, খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম—তার ওপর রোজ প্রায় ২০ মাইল করে মার্চ। ছোঁড়া গুলা একেবারে মচ্চিভঙ্গ হয়ে গেছে।

এদের ভিতর অধিকাংশ বলে "এসব যদি জানতাম তবে কোন শালা ভলান্টিয়ারি করতো। কোথায় যুদ্ধ দেখবো, কামানের বন্দুকের মুখে আহতকে জল দিব, ব্যাণ্ডেজ করবো সাহস দেখাব (এ সবে সকলেরই খুব উৎসাহ), বাঙ্গালীর বীরত্বের অভাব নাই সকলকে জানাব,—সেত দূরে গেল, বন্দুকের আও-য়াজও শুনলাম না, কিন্তু কুলির মত দিন কাটাতে হচ্চে—শুধু হাঁটিয়ে জান নিকুলে দিলে"।

যবে থেকে "বেঙ্গল অ্যামবুলেন্স" ফিল্ড সারভিস করবো বলেছে, তখনই আমি জানি যে বাছা ধনদের কোনও ধারনা নেই কি কর্ত্তে এগুচ্ছেন। দিনে ২০ মাইল মার্চ তার উপর ওজন করা তেষ্টার জল—এসব কখন তারা স্বপ্নেও ভাবে নি। যাহোক তবু সবাই সহ্য করতে রাজা যদি অফিসার গুলো কুলির মত ব্যবহার না করে।

এখানেত আবার তাঁবু গেড়েছি, জানিনা কদিন থাকা হয়।

জিনিস পত্র কতক পেছনে রেখে এসেছি—এখানে শুধু বিছানা—যা পরে আছি তাছাড়া আর এক স্যুট কাপড়, খুর ইত্যাদি, খান দুই প্লেট একটা ডেকচি ও ছুরি, কাঁটা, চামচ। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফিল্ড সারভিস মতে। তবু এখানে এসে, তাঁবুর ভিতর ঢুকে আরাম পাচ্চি। মার্চের কদিন হল্টের সময় তাঁবু খাটাবার ও হুকুম ছিলনা।

কবে যে সব শেষ হবে—তাতো দেখচি না। শুনছি বুলগেরিয়া জর্ম্মানির দিকে যোগ দিয়েছে। কনষ্টান্টিনোপল নেবার আশা—তাহলে কম।

অনবরত যুদ্ধ ও মার্চ করে এগিয়ে আসাতে ডাক অনেক দিন পাইনি। বাহিরের খবর কিছুই জানিনা। লোকের মুখে যা একটু বিলাতের যুদ্ধের খবর পাওয়া যায়। জেনেরালদের কাছে রয়টারের টেলিগ্রাম মাঝে মাঝে আসে।

তোমার খবর দিও। ইতি

তোমার কল্যাণ।

চত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। আজিজিয়াতে ১০ই অক্টোবর রাত্রির মধ্যে সমবেত ব্রিটিশ ফৌজের সংখ্যা এই ছিল ঃ—পদাতিক ৬০০০, অশ্বারোহী ৪০০, পুল ইত্যাদি লাগাইবার লোকজন লইয়া আরও ২০০, আর ২৫টা বড় বড় কামান।

২। সেই রাত্রে ব্রিটিশ ক্যাম্পে খবর পৌঁছিল যে তুরস্কদের দেড় হাজার মজবুত সেনা "ঝোর" গ্রাম ছাড়িয়া ৭ মাইল আরও অগ্রসর হইয়া "কুটুনিয়া" গ্রামে পৌঁছিয়াছে। ব্রিটিশ অশ্বারোহীর দল তারপর দিন প্রাতেই আজিজিয়ার উত্তর দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং শত্রুর সর্ব্ব-আগুয়ান-দলকে বাধা দিল। সেই দিন হইতে তুরস্কে ব্রিটিশে পুনরায় সংঘর্ষণ আরম্ভ হইল।

৩। উহাতে বেশ টের পাওয়া গেল যে, তুরস্ক যে এতদিন হারিতে ছিল—তাহা হইতে সে যেন নিজেকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে এবং নূতন বলে বলীয়ান হইয়া ব্রিটিশের সঙ্গে লড়িবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। যে সব আরব প্রজারা "কুতেল আমারার" যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের সহিত সদ্ভাব করিয়াছিল তাহারাও এখন শত্রুতা আরম্ভ করিল।

৪। ১১ই অক্টোবর টাউনশেণ্ড সাহেব সমবেত সৈনিক-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে "তোমরা আমারা হইতে ২৩০শ মাইল ব্রিটিশ পতাকা উড়াইতে উড়াইতে এইখানে আজিজিয়াতে আসিয়াছ। যেহেতু গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে আমরা এখন বাগ্‌দাদ যাই, অতএব তুরস্ক যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না অগ্রসর হয় ত আমরা আপাততঃ এই খানেই ট্রেঞ্চ ইত্যাদি কাটিয়া নিজেরা মজবুত হইয়া বসিব"।

৫। কল্যাণ ১৩ই অক্টোবরে আজিজিয়া হইতে বিনোদিনীকে যে চিঠি পাঠায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১৩ই অক্টোবর ১৯১৫

মা,

তোমার ১১ই সেপ্টেম্বরের চিঠি এক মাস বাদে পেলাম। এর মধ্যে অনেক ঘোরা ফেরা ও যুদ্ধ হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরে যত ট্রাভেল করা ও এক যায়গা থেকে অন্য যায়গা করা হয়েছে।

একি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী—যে বলে কয়ে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় বদলি করাবে। সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী—ওসব ওজর কি যুদ্ধের সময় খাটে? শান্তির সময়—যখন দেশে বসে, এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় গেলে কারও কিছু এসে যায় না। সে সময় এসব ওজর চলে।

রাশি রাশি লোক—কত লর্ড ব্যারণের ছেলে সদ্য বিয়ে করে এসে তোপের মুখে প্রাণ দিচ্ছে। আর আমি সেই ওজর করে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাব? তোমার কোন ধারণাই নেই। গুলি বৃষ্টি গোলা ফাটার মধ্যে থেকেও যে লাগেনি—এই ভাগ্য।

শুনলাম—এবারকার যুদ্ধে,চারিদিকে গোলার মধ্যে জখমিদের ড্রেস করেছি—তা আমার ব্রিগেডের জেনেরাল দেখেছেন ও দেখে খুসী হয়েছেন। যদি এই "কুত"এর যুদ্ধের বিবরণে (ডেসপ্যাচে) আমার নাম দেন তা হলে সেটা খুব মান্য।

"সাইবা"র যুদ্ধের ডেসপ্যাচে লেফ্‌টেন্যাণ্ট "বল" একজন মহারাট্টা এই এম এস্ এর নাম ছিল। (For conspecuous bravery in attending wounded under fire.) অর্থাৎ গুলি,বৃষ্টির মধ্যে বিশেষ সাহস দেখিয়ে তিনি জখমিদের দেখেন। এই "Mentioned in despatches" একটা বিশেষ certificate—যা চাক্‌রির record এ লেখা থাকে; পরে উন্নতির সাহায্য করে।

দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি মোটে দুটো যুদ্ধে যোগ দিয়েছি। তাছাড়া অনেকটা 'কপাল' থাকা চাই। কোন জেনেরাল্-জাতীয় লোকের চক্ষে না পড়লে তো আর mentioned হওয়া যায় না।

জেনেরাল্‌দের এ, ডি, সি রা প্রায়ই mentioned হয়। "হিতি" একবার mentioned হয়েছে। ফ্রান্সে মেজর অটল আই, এম, এস ও ক্যাপটেন ইন্দ্রজিৎ তাঁরা দুজনই মারা গেছেন। এখানে ঐ লেফটেনাণ্ট "বল" আই, এম, এস, এইত কয়জন দেশী ও জানা অফিসার mentioned হয়েছেন। তা ছাড়া ফ্রান্সে অনেক দেশী রাজারা mentioned হয়েছেন।

আপাতত এখানে সব চুপ চাপ আছে। শত্রু দূরে আছে। শুনছি আমরা আর বেশী আগে যাব না। অনেক বারই তো শুন্‌লাম। আমি ভালই আছি।

তোমার

কল্যাণ

একচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। ১৪ই অক্টোবর জেনারাল নিক্সন তার যোগে টাউনশেণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে :—"তোমার সম্মুখে যে যুদ্ধের মেঘ দেখিতেছ তাহাতে কি ঠাওরাও আর তোমারই বা ও সম্বন্ধে কি মতলব"?

টাউনশেণ্ড পরদিন এই উত্তর দেন :—

(১) তুরস্কের জেনেরাল নুরউদ্দিন আমাদের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য ৮ হাজার সৈন্য টেসিফন্ আর ঝোর গ্রামের মধ্যে রাখিয়াছে।

(২) নুরউদ্দিনের সেনার ভিতর যাহারা ঝোর গ্রাম ছাড়িয়া কুটুনিয়াতে আগুয়ান হইয়াছে তাদের সংখ্যা দুহাজার হইবে।

(৩) এই দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে নুরউদ্দিনের মতলব আমাদের সঙ্গে টেসিফনে যুদ্ধ না করিয়া যেন ঝোর গ্রামে যুদ্ধ বাধায়—

(৪) আজিজিয়া হইতে যুদ্ধের জন্য বাহির হইবার পূর্ব্বে আমি সৈনিকদের ২১ দিনের খোরাক্ হাতে চাই।

(১) আজিজিয়া হইতে সৈন্য সামন্ত লইয়া একবার যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়া পড়িলে আমার উদ্দেশ্যই হইবে তুরস্কের ফৌজ ধ্বংস করিবার। যেমন আমি কুতেল-আমারায় করিয়াছিলাম—আমার একদল, তুরস্ক-ফৌজকে আটকাইয়া রাখিবে—আর অন্য দল উহাদের পিছন হইতে ঘেরাও করিয়া বধ করিবে।—সেইরূপ চাল এবারেও চালিব।

২। আজিজিয়াতে আরও লোকবল এবং রসদাদি বসরা হইতে আনাইয়া ফেলিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। যত তাড়াতাড়ি করিয়া টাউনশেণ্ড আজিজিয়া আসিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবে ব্রিটিশদের তরফে মাল মসলার যোগাড় হইয়া উঠিল না বলিয়া, দিনের পর দিন আজিজিয়াতে কাটিয়া যাইতে লাগিল। ব্রিটিশদের এই বিলম্বে তুরস্কের যথেষ্ট উপকার হইল।

তখন আজিজিয়াতে থাকিবার কি কষ্ট তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য। ধূলা, মাছি আর মশার উৎপাতে সৈন্যদের পক্ষে নিতান্তই অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

৩। তুরস্কের খুব আগুয়ান ফৌজে কুটুনিয়া হইতে ব্রিটিশদের আর তাড়া করিতে আসেনা। ইঁহারা ও আজিজিয়া

ছাড়িয়া উহাদের তাড়না করিতে ইতস্ততঃ করেন। এই ভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হইল।

৪। কল্যাণ বিনোদিনীকে ঐস্থান হইতে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠায়:—

২০শে অক্টোবর ১৯১৫

মা,

এ মেলে তোমার ১৮ই, ২১শে, ২৪শে, ২৮শে, ২৯শে সেপ্টেম্বরের ও ১লা অক্টোবরের চিঠি পেলাম। এখানে এসে তোমার ২২শের চিঠি প্রথম পাই। কত দিনের চিঠি জমে এক সঙ্গে এল। চিঠি এরকম গোলমাল হওয়ার জন্য খবর ধারা বাহিক পাওয়া যায় না।

আমার শারীরিক কষ্টের বিবরণ শুনে তোমার ফ্যান সহ্য হয় না—তা আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষত আমাদের বাড়ীর মেয়েদের ওরোগ ত আছেই। ভালবাসার লোকের ইচ্ছার জিনিস ত্যাগ করা, সন্দেশ ও কমলালেবু গলায় বাধে—তা ফ্যানে গা জ্বালা করবে না?

যুদ্ধের কথা আর কি আলোচনা করবো? হঠাৎ আশ্চর্য্য রকম কিছু না হলে—২০ বছর কেন এরকম যুদ্ধ চলবেনা তা ত বুঝিনা। জর্ম্মানি যতদিন রসদাদি ও গোলাগুলি জোগাড়

দিতে পারবে ততদিন এদিককার দল এগোতে পারবে, বলে তো মনে হয় না। জর্ম্মানি যে ফ্রান্সে আর এগোতে পারবে তাও সম্ভবপর নয়।

ইংলণ্ডই শিক্ষা দাতা। যে স্বদেশ প্রেম এতদিন ইংরাজ শিখিয়ে এসেছে, সব সভ্য জাতি যে স্বদেশ প্রেমিকতার গুণগান করে আসছে—তার জন্যেই এত রক্তপাত। সব প্যাট্রিয়টিসম্—পরের দেশ কেড়ে নিচ্চি। তাহলে প্যাট্রিয়টিসম্—এমপায়ার, সাম্রাজ্য, তৈয়ার করচে। হাজার হাজার লোককে মেরে এক টুকরা জমী কেড়ে নিয়ে স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রেম, দেখানও ত ইংরাজই শিখিয়েছে।

আমাদের দেশের ছোকরারা আবার তাই দেখে এই জঘন্য রূপ স্বদেশ প্রেমের চর্চ্চা করতে আরম্ভ করেছে। ফলে গোটা কতক লোক খুন, নির্দ্দোষী বড়লাটকে বোমা মারা এই সব ভয়াবহ্ কীর্ত্তি আরম্ভ করেছে। স্বদেশ প্রেমের মুখে ঝাঁটা। যতদিন পৃথিবীতে ঐ সংকীর্ণতা না ঘুচবে ততদিন প্যাট্রিয়টিস্‌মের নামে রক্তপাত থামবেনা। তা একজন লোক ছাত থেকে বোমা ছুঁড়ুক আর ৫০ জন লোক কামানের গোলা ছুঁড়ুক—এই রক্তপাতের, এই পাগলামীর মূল কারণ একই।

এই এক বছরের যুদ্ধে ১ কোটী লোক (ইংরাজ, জর্ম্মাণ, রুসিয়ান, ফরাসী ইণ্ডিয়ান, আফ্রিকান সব মিলিয়ে) হত ও আহত হয়েছে। আর এক কোটী পরিবার মরমে মরে রয়েছে, কারণ "Selfish nationalism : a most inhuman sentiment" অর্থাৎ সংকীর্ণ স্বার্থপর স্বজাতি প্রেমের ভাবটা—সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে অন্তরায়, অহিতকর, শত্রুসদৃশ ; ইহাই এই যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে। এখানকার আজ বিশেষ কোন খবর নেই। আমি ভাল আছি।

তোমার কল্যাণ

৫। একবার খবর আসিল, ২৬শে অক্টোবর রাত্রে, যে কুটুনিয়াতে তুরস্কের তরফে ১০০০ আরব সৈন্যের দল, ৪০০ অশ্বারোহী, ২টা কামান আর ৪টা মেশীনগন্ লইয়া তথায় পাহারা দিতেছে মাত্র।

তাই শুনিয়া টাউনশেণ্ডের একদল ২৭শে অক্টোবরের গভীর রাত্রে গিয়া উহাদের সরাই ও ক্যাম্প আক্রমণ করে। ফললাভ ব্রিটিশদের কিছুই হইল না। তুরস্কের দল উহাদের কামান ও বন্দুক ইত্যাদি লইয়া পলাইয়া গেল।

৬। কল্যাণ আজিজিয়া হইতেই বিনোদিনীকে নিম্নের চিঠি পাঠায় :—

২৮শে অক্টোবর ১৯১৫

মা,

যদি রুমাল না পাঠিয়ে থাক তাহলে পাঠিও না। "যুদ্ধের দান" স্বরূপ আমাদের দেশের মেয়েরা যে বাক্স পাঠিয়েছেন, সেই বাক্স থেকে বেশ খাকি রুমাল পেয়েছি।

জানিনা আস্‌ছে তিন মাসের ভিতর দেশে ফিরতে পারব কিনা—দেখ দেখি কি অনাছিষ্টির যুদ্ধ—চলিইছে। কোথায় আই, এম, এস হয়ে, শান্ত ভাবে দেশে থেকে কিছু রীসার্চের কাজ কর্‌বো ; তোমাকে একটু শান্তি দিব—না এইখানে পড়ে রহিলাম। আমি শারীরিক ভালই আছি।

ফের এখানে শত্রুকে ধর পাকড়ের গোলমাল চলেছে। হয়ত শীঘ্রই আমাদের আরও এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে তাড়াইবার হুকুম হবে। অনেক গুজব কাণে আসে তা লেখা যায় না। আমরা ত অনেক এগিয়ে এসেছি—আর কেন? আমরাইত জয়ী হয়ে শত্রুর সব কেড়ে নিচ্চি ; শত্রুত এখনও কিছু করেনি। আশা করি তোমরা সব ভাল আছ।

তোমার কল্যাণ

৭। আজিজিয়াতে বসিয়া ২৮শে অক্টোবর হইতে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ব্রিটিশদের তরফে জল্পনা, কল্পনা, নানা রকমের

পরামর্শ টাউনশেণ্ডের আর জেনেরাল নিক্সনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

টাউনশেণ্ড ট্রেঞ্চের ভিতরে থাকিয়া যুদ্ধ আদপে পছন্দ করেন না। কি প্রকারে উনি তুরস্কের জেনেরাল নুরউদ্দিনকে ফাঁকা জমীতে বাহির করাইবেন-ই করাইবেন এবং তার সঙ্গে লড়িবেন তাহা নিক্সনকে জানাইলেন। ঘরে বসিয়া এই সব রণ-কৌশল-চর্চ্চা, আর রণ-পথে কে আগুতে যাইবে, কে মাঝে থাকিবে, কে পিছনে আসিবে ইহারও আলোচনা হইতে লাগিল।

৮। কল্যাণের ঐ সময়কার পরপর তিন খানা চিঠি নিম্নে দেওয়া হইল :—

৩০শে অক্টোবর ১৯১৫

মা,

তোমার ৪ঠা ও ৬ই অক্টোবরের চিঠি এখানে পেয়েছি। ডাক্তার মন্মথ চৌধুরী এখন বসরাতে আছেন কিনা জানিনা। নাসিরিয়া থেকে আসবার সময় পথে কুর্ণাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে ছিল। তখন তিনি ঐ খানেই ছিলেন।

এদেশে বসরাই প্রথম ও ভাল বন্দর। সেই খানেই প্রথমে এসে নামতে হয়। তারপর ৪০ মাইল ওপরে কুর্ণা। সেই খানেই টাইগ্রীশ ও ইউফ্রেটীজ মিলিত হয়েছে। ইউফ্রেটীজ ধরে চলে

গেলে নাসিরিয়ায় পৌঁছান যায়। টাইগ্রাশের ওপর "আমারা" "কুতেল-আমরা," "আজিজিয়া" (আমরা এখন যেখানে) ইত্যাদি।

নাসিরিয়া থেকে "আমারা"য় আস্‌তে হলে, কুর্ণা পর্য্যন্ত নেবে এসে তারপর টাইগ্রাশে পড়িয়া ওপরে যেতে হয়।

এখানে আমার বিশেষ কিছু খবর নেই। পরশুদিন রাতা-রাতি গিয়ে একদল শত্রু ধরবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি সঙ্গে ছিলাম—তা ফলে শুধু রাত জাগা ও সমস্ত রাত ধরে হাঁটা হল। গিয়ে দেখলাম পাখী পালিয়েছে।

কখনত আগে এরূপ ম্যানুভারেতে (যুদ্ধ চাতুরীতে) রাত্রে মার্চ করিনি। অমন ক্লান্তি-দায়ক মার্চ আর নেই। কোথায় লোকে খেয়ে দেয়ে ঘুমোবে—তা নয়. রাত্রি ১৷৷০টার সময় থেকে আরম্ভ করে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত মার্চ। রাস্তায় অনেকবার হল্ট করা হয়েছে। সে আরও খারাপ। একবার থামলেই সবাই শুয়ে পড়ে ঘুমাতে আরম্ভ করে। আবার ১০।১৫ মিনিট বাদে হুকুম হয় "মার্চ"—তখন ঘুমের ঘোর ভাঙ্গতেই ৫ মিনিট। আমার তবু ঘোড়া ছিল—তা ২টা নাগাত ঘোড়া থেকে নেবে হাঁটতে হল—ঘোড়ার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সমস্ত রাত হেঁটে ভোরে আক্রমণ করবার কথা —ত তার আগেই শত্রু পয়ে আকার দিয়ে ছিল।

আমার বন্ধু কাপ্তেন পুরি আই, এম, এস, আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে এসেছে। তোমার মনে আছেত—গেল জানুয়ারীতে সে কলকাতায় গিয়ে ছিল। তোমাদের খবর সব দিও। আমি ভালই.

তোমার কল্যাণ

পুঃ—ভাল কথা, লেফটেন্যাণ্ট বল বলে যে মারহাট্টা আই এম এসের বীরত্বের কথা ডেসপ্যাচে প্রকাশ হয়েছে লিখেছিলাম, তিনি মিলিটারি ক্রস্ পেয়েছেন।

—o—

২রা নভেম্বর ১৯১৫

মা,

নভেম্বর মাস ত এল। এখনও কাইসারের কথামত অক্টোবরে যুদ্ধ থামিবার কোনও লক্ষণ ত দেখিনা। ব্যাপার ক্রমশ বেশী জটিল হয়ে আসছে। তিন দিন আগে হঠাৎ মেল যাবে শুনে তোমায় যে চিঠি লিখেছিলাম—এ পোস্টকার্ড তার সঙ্গেই পাবে বোধ হয়!

দু'জোড়া খাকি হাফ মোজা, এক জোড়া খাকি পশমের দস্তানা ও একটা টাই দরকার। যদি পারসেল করে পাঠাতে পার ত ভাল হয়। রামানন্দ বাবুর "মডার্ণ-রিভিউ" আমার জন্য চাঁদা দিয়া এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করিও। পড়িবার

কিছু কাছে না থাকিলে বড় কষ্ট হয়। ভালই আছি। বেশ শীত পড়েছে।

কল্যাণ

———

৯ নভেম্বর ১৯১৫

মা,

এ মেলে তোমার ৯ই ও দেওঘর থেকে লেখা ১২ই ও ১৪ই অক্টোবরের চিঠি পেলাম। কুতেল-আমারার যে যুদ্ধের কথা তুমি সঞ্জীবনীতে পড়েছিলে সেই যুদ্ধেই আমি ছিলাম ও সেই যুদ্ধই ২৬শে ২৭শে সেপ্টেম্বর হয়েছিল। ২১শে নয়।

কুতেল-আমারার ৮।১০ মাইল নীচে যুদ্ধ হয়। শত্রু পালাতে, পর দিন আমাদের সৈন্য সহর দখল করে। সহর এমন কিছু নয়। আমাদের একদল তাড়া করে শত্রুর পেছনে আসে, এসে এইখানে থামে। তারপর আমরা সব ক্রমে ক্রমে এসে উপস্থিত হয়েছি।

আবার উদ্যোগ হচ্চে, কবে আগে যাওয়া হবে তা এখনও জানিনা। বাগ্‌দাদে না পৌঁছিলে এখানে যুদ্ধের শেষ হবেনা।

উপেন মেসো-মহাশয়ের সঙ্গে "আমারা"য় দেখা হয়েছিল—তোমায় লিখে ছিলুম কি? তিনি কয়েক দিন হল এখানে এসে পৌঁছেছেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ছিলেন

তিনিও আরমির এক ডিপার্টমেণ্টে কাজ কচ্চেন। বেশ লোক, তাঁকে দেখে আর কথা বার্ত্তা বলে খুব আনন্দ হল। অনেক দিন পরে চেনা আত্মীয়ের সহিত দেখা হল। বলেছেন যে সুবিধা পেলেই ফের এসে দেখা করবেন। আর আমাদের ও ফুরসৎ এত কম তায় আহতের সংখ্যা ভয়ানক বেড়ে উঠছে তার উপর কখন কি হুকুম হয়—সকলেই ব্যস্ত তটস্থ।

আমার বন্ধু কাপ্তেন পুরি পাঞ্জাবী আই এম এস ও আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে এসেছে। সে এসে দেশী খাবার কয়েক দিন খাওয়া হচ্ছে। একজন ডুলি বেহারা ভর্ত্তি হবার আগে ময়রা ছিল—পশ্চিমে ময়রা। হালুয়া জিলিপি বরফি গজা ইত্যাদি হিন্দুস্থানি মিষ্টি, কচুরি সব করতে জানে। আমি আগেই জানতাম। আমার কোন দিন দোকানে খাবারে বিশেষ সখ নেই তাই তাকে দিয়ে কিছু করাই নি। পুরি এসে অবধি প্রায়ই তাকে দিয়ে খাবার করায়। অমৃতিটাই ভাল করতে পারে।

সঞ্জীবনীতে আমরা বাগ্‌দাদ থেকে যতদূরে আছি বলে পড়েছ তার অর্দ্ধেক রাস্তা এগিয়ে এসেছি। "কুতেল-আমারা," "আমারা" থেকে আগে, টাইগ্রীশের ওপর।

আমার কাপড় চোপড় সব ছিঁড়ে গেছে। কাপড়ের

আলাদা লিষ্ট পাঠাচ্ছি। ও সবের মাপ আমার কাপড়ের বাক্সে আছে। ঐসব পারসেল করে পাঠিও।

২০শে অক্টোবরের "ডেলি নিউসে" মেসোপোটেমিয়ায় যুদ্ধের গোড়া থেকে নাসিরিয়া জয় পর্য্যন্ত বিবরণ দিয়েছে। সেটা তোমায় কেউ দেখিয়েছে কিনা জানিনা। পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি পড়ে নেলি মাসিমাকে পাঠিয়ে দিও। যেখানে দাগ দিয়েছি সেই খানে আমি গিয়েছি। যুদ্ধের ভিতর কেবল নাসিরিয়া ছিলনা—তারপর "কুতেল-আমরা" ছিল। তার খবর এখনও বিস্তারিত বাহির হয় নাই।

আমার আর বিশেষ খবর নাই। আগে যেতে আরম্ভ করলে চিঠি পেতে গোলমাল হতে পারে।

তোমার কল্যাণ

—o—
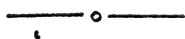
৯। ১১ই নভেম্বর টাউনশেণ্ড, জেনেরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে এক মস্ত অশ্বারোহীর দল, একদল পদাতিক, বড় বড় কামানের ব্যাটারীর দল, ব্রিটিশদের তরফে অগ্রগামী স্বরূপ ছাড়িলেন। রণপোত "সুমন" ও উহাদের সঙ্গে জলপথে চলিল। উহাদের উপর হুকুম হইল যে কুটুনিয়া গ্রাম দখল করিয়া টাইগ্রীশের

উপর বাগ্‌দাদিয়া গ্রাম (বাগদাদ সহর নহে) তদারক করিয়া ঝোর গ্রামে গিয়া জমায়েত হইবে।

১০। তখন টাউনশেণ্ডের হাতে ১৪ হাজার সৈন্য ও ৩৫টা বড় বড় কামান ইত্যাদি পৌছিয়া গিয়াছে। গুপ্তচরে খবর আনিল যে নুরউদ্দিনের হাতে টেসিফন্ ও ঝোর গ্রাম অঞ্চলে তুরস্কের তখন ১২ হাজার সৈন্য আর ৩৮ খানা কামানের অধিক নাই।

ব্রিটিশদের তরফে অধিকন্তু ৫টা এইরোপ্লেন আর বড় বড় কামান সাজান ৪ খানা রণপোত—এ সবই যোগাড় হইয়া গেল। টেসিফনের যুদ্ধের আয়োজনের ক্রটী ছিল না।

ঐ সময়ে টাইগ্রীশের জল নিতান্তই শুকাইয়া যাওয়াতে রণপোত বা বড় বড় নৌকা চালান একেবারে কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। শুষ্ক নদীর দুই কিনারাই খুবই উচ্চ হইয়া পড়ে। এমনকি রণপোত গুলার কামানে যে বিশেষ কোন ফললাভ হইবে না—তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল।

১১। নদীপথে সৈন্যদের যাইবার জন্য আটখানা জাহাজেরও বন্দোবস্ত হইল। উহার ভিতর একটীতে টাউনশেণ্ড সাহেবের থাকিবার ও যুদ্ধ পরিচালন করিবার সুবন্দোবস্ত হইল। দু'খানা জাহাজে প্রয়োজন মত ৮শত ৭শত করিয়া একুনে ১৫০০ শত জখমি সেনা রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। টাউনশেণ্ডের

অনুমানে সম্মুখে টেসিফনের যুদ্ধে—জোর ২৪০০ শত জখমি সৈন্য হইবে। তাহাদের ভিতর মুমুর্ষুদের টেসিফনে ব্রিটিশ গার্ডের জিম্মায় রাখিয়া অল্প-জখমিদের বাগ্‌দাদে লইয়া যাইবেন—এই মনে মনে স্থির করেন।

টেসিফনের যুদ্ধে টাউনশেণ্ড যে জয়ী হইয়া বাগ্‌দাদে প্রবেশ লাভ করিবেন—এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজমনে কি ইংরাজ-দের কোন উপর-ওয়ালা সাহেবদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ পর্য্যন্ত ও হয় নাই। এত অধিক আয়োজন কেবল বাগ্‌দাদে প্রবেশ করিবার জন্য। টেসিফনইত বাগ্‌দাদ প্রবেশ করিবার গেট।

১২। জেনেরাল নিক্সন স্বয়ং অন্য এক জাহাজে তাঁর মন্ত্রীদের লইয়া আজিজিয়াতে পৌঁছিলেন। সাতখানা বড় বড় বজরাতে সৈন্যদের ১৮ দিনের রসদ লইয়া—তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নদীপথে যাইবার বন্দোবস্ত হইল। আর একটা স্বতন্ত্র বজরাতে দুদিনের রসদ (আজিজিয়ার জলে নঙ্গর করিয়া) রাখা হইল।

সৈন্যদের আরও রসদ, জল, অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ, তাঁবু ইত্যাদি স্থলপথে লইয়া যাইবার জন্য এক হাজার খচ্চর, ৬২০টা উট, ৬৬০খানি গরুর গাড়ী, আর, ২৪০টা গাধা যোগাড় করা হইয়াছিল।

১৩। টাউনশেণ্ড ১৫ই নভেম্বর আরও অনেক সৈন্য সামন্ত আজিজিয়া হইতে কুটুনিয়া গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। জেনেরাল নিক্সন্ ও দর্শকের মত কুটুনিয়া যাত্রা করিলেন।

টাউনশেণ্ডের প্ল্যান ও উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁর অধীন সমস্ত সৈন্যদের কুটুনিয়াতে ১৫ই নভেম্বর জমায়েত করেন; ১৬ই নভেম্বর ঝোর গ্রাম দখল করেন; ১৭ই নভেম্বর লাজ্ গ্রাম দখল করেন; ১৮ই নভেম্বর চতুর্দ্দিক পরিদর্শন করিয়া ১৯শে নভেম্বর টেসিফনে তুরস্কদের আক্রমণ করেন।

কিন্তু জলপথে চার খানা জাহাজের বড়ই দেরি হইয়া যায়। উহারা ১৮ই নভেম্বরের পূর্ব্বে কুটুনিয়াতে পৌঁছিতে পারে নাই। টাউনশেণ্ডের প্ল্যান অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রথমেই ব্যাঘাত পড়িল এবং তিন দিন দেরি হইয়া গেল। যে সৈন্যদের জমায়েত ১৫ই নভেম্বর হইবে ঠিক ছিল তাহা ১৮ই নভেম্বরের পূর্ব্বে আর ঘটিয়া উঠিল না।

১৪। টাউনশেণ্ড ১৮ই নভেম্বরে হুকুম দিলেন যে ১৯শে প্রাতেই ঝোর গ্রাম দখল করিবার জন্য যাত্রা করিতে হইবে। সেখানে তুরস্কদের মাত্র চারি হাজার সৈন্য। টাউনশেণ্ড আরও হুকুম দেন যে ১৭নং ব্রিগেড নদীর ডান তীর দিয়া গিয়া ঝোর গ্রামের নিকটবর্ত্তী তুরস্কদের জুমৈষা গ্রাম ও দুর্গ আক্রমণ

করিবে; আর বাদবাকী ফৌজ নদীর বাম তীর দিয়া ঝোর গ্রামে পৌঁছিবে।

১৫। ঐ সব হুকুম জারী করার পরে, বৈকাল বেলায় এইরোপ্লেনে খবর আসিল যে টেসিফন্ হইতে তুরস্কের ফৌজ নদীর দুই তীর দিয়াই ঝোর গ্রামেরদিকে আসিতেছে।'

তৎক্ষণাৎ টাউনশেণ্ড এই ভাবিলেন যে হয়ত বা তুরস্ক-ফৌজ উঁহাকেই আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহা হইলে ১৭ নং ব্রিগেড যাহারা নদীর ডানদিক দিয়া উঁহার হুকুমমত যাইবে তাহারা ত একা হইয়া পড়িবে; এপার ওপার হইবার পুল তোলা হইয়া গিয়াছে। অতএব পুনরায় সেই পুল ফিট্ করিয়া লাগাইবার হুকুম দিলেন; আর ১৭নং ব্রিগেড্কে নদীর ডান-দিক দিয়া যাত্রা করিতে না দিয়া বলিলেন যে তোমরাই কুটুনিয়া গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য ট্রেঞ্চ কাটিয়া বসিয়া যাও।

১৬। ১৯শে নভেম্বর বাদবাকী ব্রিটিশ-ফৌজ নদীর বাম কিনারা দিয়া গিয়া ঝোর গ্রাম দখল করিয়া ফেলিল। সেখানে অল্পসংখ্যক তুরস্ক ফৌজ ছিল; তাহারা ঈষৎ আপত্তি করিয়া হঠিয়া গেল।

টাউনশেণ্ড ঝোর গ্রামে পৌঁছিয়া ১৭নং ব্রিগেড্কে হুকুম দিলেন যে এখন তোমরা কুটুনিয়া ছাড়িয়া এইখানে আইস।

উহারা নদীর ডানদিকের রাস্তা ধরিয়া তথায় রাত ৯টার সময় পৌঁছিয়া গেল। তখন ঝোর গ্রামের নদীর উপর ছয় ঘণ্টার মধ্যে পুল লাগাইয়া উহাদিগকে নদীর ডান তীর হইতে বাম তীরে লইয়া যাওয়া হইল। ১৭ নংব্রিগেডকেও অন্যান্য সৈন্যদের সঙ্গে লাজ্ গ্রাম দখল করিবার জন্য পাঠান হইল।

১৭। লাজ্ গ্রাম ২০শে নভেম্বর সহজেই ইংরাজদের দখলে আসিল। ঐ গ্রাম হইতে টেসিফন্ গ্রাম ১০।১২ মাইলের অধিক দূরে হইবেনা। ঐ গ্রামে বসিয়াই ২১শে নভেম্বর টাউনশেণ্ড টেসিফন আক্রমণের শেষ আয়োজন তদ্বীর, ব্যবস্থা—সব করিয়া ফেলিলেন। ২২শে নভেম্বর খুব ভোরে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। কোন্ কোন্ রেজিমেণ্ট বা ব্রিগেড কার অধীনে থাকিয়া, কোন্ স্থানে গিয়া, কোন্ সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিবে তার প্ল্যান ও হুকুম জারী হইয়া গেল।

১৮। কল্যাণের সেই সময়কার এক পোস্টকার্ড নিম্নে দেওয়া হইল :—

২১-১১-১৫

মা,

শেষ তোমায় যেখান থেকে চিঠি লিখেছিলুম তার পর

বাগ্দাদের দিকে আরও ১২।১৩ মাইল এগিয়ে এসেছি। আগামী কাল বড় যুদ্ধ হ'বে। আমি বেশ ভালই আছি। কবে এ পোষ্টকার্ড পাবে তা জানিনা। নীচের দিকে জাহাজ ডাক নিয়ে যাবার কিছু ঠিক নেই। যুদ্ধের পর জখমি নিয়ে ঘোরবার সময় যদি সেই সঙ্গে নিয়ে যায় সেই আশায় ডাকে দিচ্ছি। জাহাজে পোষ্ট আফিস।

আশাকরি যুদ্ধ একদিনেই শেষ হবে আর আমরা সহজেই গন্তব্য স্থানে পোঁছিব।

তোমার

কল্যাণ

দ্বিচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। ইংরাজদের তরফে, টেসিফনে যুদ্ধ করিবার সাজ সরঞ্জাম এবং সৈন্য সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি। এখন তুরস্ক ইংরাজদের বাধা দিবার জন্য কি ভাবে সেনার দল, অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় করিল আমাদের জানা উচিত।

২। "কুতেল আমারা"র যুদ্ধান্তে তাহার বিবরণ আমরা কল্যাণের ১লা অক্টোবরের চিঠিতে পড়িয়াছি। তখন হইতে ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত, এক মাস বিশ দিন, ইংরাজরা লইলেন তাঁহাদের যুদ্ধের আয়োজন ঠিক ঠাক করিয়া টেসিফন্ অবধি ঠেলিয়া উঠিতে। এই অবসরে তুরস্কও নিজেদের সৈন্যের দল অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে এবং যুদ্ধের স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেখানে ট্রেঞ্চ ইত্যাদি কাটাইয়া কি ভাবে ইংরাজদিগকে বাধা দিবে এবং উঁহাদের বাগ্‌দাদে যাওয়া বন্ধ করিবে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিবার সময় পাইল।

৩। "কুতেল আমারা" ছাড়িয়া বাগ্‌দাদে যাইবার পথে 'টেসিফন্'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিখ্যাত স্থান। ইহার আর পারে প্রাচীন সেলিউসিয়া। দুই স্থানই খ্রীঃ সপ্তম

শতাব্দীর পূর্ব্বে খশ্রু সম্রাটদিগের রাজধানী ছিল। খ্রীঃ ৬৩৭তে তুরস্কের সম্রাট ওমার তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বর্ব্বর আরবদের সাহায্যে ঐ প্রাচীন সহরদ্বয়কে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসকরিয়া ফেলেন। সেলিউসিয়াতে কোন ঘর বাড়ীর চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না। টেসিফনে এক বৃহৎ আকারের খিলান আর এক প্রকাণ্ড দেওয়ালের অংশ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ঐ খিলানের আর দেওয়ালের আশ্রয়ে আর উহাদের নীচে প্রায় এক মাইল কি দেড় মাইল জমী ঘেরিয়া দু' লাইন ট্রেঞ্চ কাটিয়া তাহার ভিতর ভিতর পথ করিয়া—বড় বড় কামান ইত্যাদি সাজাইয়া ফেলিয়া, তুরস্কের ফৌজেরা নিজেদের বাঁচাইবার জন্য ভূমধ্যে এক প্রকাণ্ড দুর্গই নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছিল। উহাদের সৈন্য সংখ্যা ইংরাজদের অপেক্ষা কিছুতেই কম হইবে না। অনুমান উহাদের সৈন্য-সংখ্যা অধিক ছিল—কত অধিক ইংরাজরা ঠিক অনুমান করিতে পারেন নাই। তুরস্কের তরফ হইতে তাহা যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

৫। তুরস্কের সৈনিকেরা খুবই রণপটু, সাহসী, আর উহাদের লক্ষ্য এক প্রকার অব্যর্থ। উহারা টেসিফনের দুর্গবৎ ট্রেঞ্চে আসিয়া, জিরাইয়া, ব্রিটিশ ফৌজদের আক্রমণের

জন্য আরামে অপেক্ষা করিতেছিল। উহারা নিজেদের দেশ, ইজ্জত এবং বাগ্‌দাদ সহর রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাদের দলপতি নুরউদ্দিন খুবই পাকা লোক, টাউনশেণ্ডের অপেক্ষা বিদ্যায় বুদ্ধিতে, রণচাতুরিতে কোন অংশেই কম ছিলেন না। অনুমান—তাঁহাকে সাহায্য করিতে সে সময়ে প্রসিদ্ধ জরমান জেনেরাল "ভনডে গলট্‌জ" তাঁহার নিকটেই ছিলেন।

৬। ব্রিটিশদের পক্ষে ইরাক খণ্ডের সমস্ত যুদ্ধ ব্যাপারই সর্ব্বতোভাবে কষ্টকর। "কুতেল আমারা" জয় করার পর অতখানি পথ ঠেলিয়া টেসিফনে আসিতে ব্রিটিশদের গোরা-ফৌজ, ভারত-ফৌজ, জেনেরালেরা খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোরাদের ভিতর অনেকেই পীড়িত ও জখমী অবস্থায় ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা অসীম সাহসে টেসিফন জয় করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া লাগিয়াছিল।

৭। ২২শে নভেম্বর ভোর ৬॥টা হইতে টাউনশেণ্ডের ফৌজ তুরস্কদের টেসিফনে আক্রমণ করিবে বলিয়া, তাহার ১৬ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অধীন বড় বড় চারিজন জেনেরালেরা নিজ নিজ রেজিমেণ্টের দল-বল লইয়া লাজ-গ্রাম হইতে টেসি-ফনের দিকে চলিলেন এবং গভীর রাত্রে স্ব স্ব চিহ্নিত স্থানে

গিয়া পৌঁছিলেন। ভোর হওয়া পর্য্যন্ত সৈন্যরা খোলা মাঠে যদিও বিশ্রাম করিতে পারিয়াছিল তথাপি অনেক ঘণ্টা ধরিয়া মার্চ করিয়া উহারা এত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে সে বিশ্রামে তাহাদের কোন উপকার হয় নাই। তখন খুব শীত। অত শীতে খোলা মাঠে উহাদের কিছুমাত্র ঘুম হয় নাই; প্রাতে যখন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল তখন সকলকারই গা-গতরে ব্যথা—হাত পা যেন অবশ।

৮। ঐ চারিজন বড় বড় জেনেরালদের মধ্যে দুইজনকে রাখা হইয়াছিল তুরস্কদের প্রথম ট্রেঞ্চ লাইনকে সসৈন্যে মুখোমুখী হইয়া আক্রমণ করিবার জন্য। উহাদের অনেক দূরে আর এক জেনেরালকে রাখা হইয়াছিল যে তিনি একই সময়ে সসৈন্যে তুরস্কদের ঐ ট্রেঞ্চের পাশ দিয়া আক্রমণ করিবেন। আর একজনকে হুকুম হইয়াছিল যে তিনি ১২।১৪ মাইল সসৈন্যে মার্চ করিতে করিতে ঘুরিয়া আসিয়া তুরস্কদের দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ লাইনের পিছন হইতে আক্রমণ করিবেন, যাহাতে তুরস্ক-ফৌজ ঐ দ্বিতীয় ট্রেঞ্চের পিছন দিয়া পলাইয়া যাইতে না পারে।

৯। ব্রিটিশ জেনেরালেরা কি কি করিতেছেন তাহা তুরস্কের জেনেরাল নুরউদ্দিন খুব প্রত্যূষেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন;

এবং যাহাতে ঐ আক্রমণ ব্যর্থ হয় তদনুরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

ভোর ৬॥টা হইতে একটা ভয়ানক ঝড়ের মত ব্রিটিশদের আক্রমণ আরম্ভ হইল আর বেলা ১০॥টা অবধি ভীষণ বেগে চলিল। তেমনি ভীষণ বেগে তুরস্ক ফৌজ গোলার উপর গোলা মারিয়া ব্রিটিশ-আক্রমণ রোধ করিতে লাগিল। এই প্রকারে একদিকে যেমন তুরস্কেরা ব্রিটিশদের (পিছন হইতে আসিয়া ঘেরাও করিবার) মতলব সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিল, তেমনি ওদিকে ভারতীয় সৈনিকদের বীরত্বের গুণে তুরস্কদের প্রথম ট্রেঞ্চ লাইনের উত্তর-পূর্ব্বাংশ ব্রিটিশরা দখল করিয়া ফেলিল। অপর দিকে তুরস্কের বড় বড় কামানে ব্রিটিশদের রণ-পোত গুলার নদী পথে অগ্রসর হওয়া একেবারে থামাইয়া দিল।

১০। টাউনশেণ্ড ভুল বুঝিয়াছিলেন যে তুরস্করা ঐ প্রথম ট্রেঞ্চ লাইন হইতে পলাইয়া দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ লাইনে ঢুকিয়াছে। উনি ১৭নং ব্রিগেডকে হুকুম দেন ঐ ট্রেঞ্চ দখল করিতে। উহারা ঐ ট্রেঞ্চের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তুরস্কেরা ট্রেঞ্চের ভিতর হইতে অগ্নি বৃষ্টি করিয়া ঐ ব্রিগেডের অনেক লোককে মারিয়া ফেলে। ব্রিগেডের বাকী দল অনেক কষ্টে এক ডোবাতে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচায়।

১১। বেলা ১০॥টা হইতে ১॥টা অবধি ঘোর যুদ্ধ চলিল। দুই পক্ষের অনেক লোক মরিল। ১॥টার সময় তুরস্কের ফৌজরা ইংরাজদের মারের চোটে সেই প্রথম ট্রেঞ্চ লাইন ছাড়িয়া দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ লাইনে আশ্রয় লয়। তুরস্কদের ৮টা কামান ইঁহারা ধরিলেন।

১২। এই যুদ্ধে নুরউদ্দিন রণ-কৌশলে টাউনশেণ্ড অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ দিয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষাশেষি খেলাতে নুরউদ্দিন "তুরুপ" করিবেন বলিয়া তাঁর অনেক ফৌজকে জেনেরাল জেভাদ বের হাতে "রিজার্ভ" বা জমা রাখিয়াছিলেন। দরকার পড়িলেই ক্লান্ত, শ্রান্ত, হত বা আহত রেজিমেণ্টের স্থানে রিজার্ভের দল আসিয়া যোগান দিবে। রিজার্ভ সৈন্য রাখার ঐ উদ্দেশ্য।

১৩। দুর্ভাগ্য বশতঃ ভুল ক্রমে টাউনশেণ্ড তাঁর হাতে একটী সৈনিককেও রিজার্ভ স্বরূপ রাখেন নাই। সকল সৈনিককে প্রথম হইতে শেষ অবধি,এক দিনকার রসদ মাত্র সঙ্গে লইয়া—লড়াই করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও রেজিমেণ্ট লড়াই করিতে করিতে অপারক হইয়া গেলে—কাহারা তাহাদের স্থানে দাঁড়াইয়া যুঝিবে তাহা টাউনশেণ্ড ভাবেন নাই।

১৪। বেলা ২টা হইতে জেভাদ বে তাঁর রিজার্ভের দল দিয়া ব্রিটিশদের আক্রমণে খুবই ব্যাঘাত দিতে লাগিলেন। ব্রিটিশরা নিজেদের ছত্রভঙ্গ, শ্রান্ত, সৈন্যের দল একত্র করিয়া যেদিকে আক্রমণ করিতে গিয়াছেন সেই দিকেই বিলক্ষণ ধাক্কা ও মার খাইয়া হঠিয়া আসিয়াছেন। ব্রিটিশদের দু'জন জেনেরাল এই উদ্যমে আহত হইয়া পড়িলেন। বেলা ২টার পর হইতে ব্রিটিশদের আক্রমণের জোর জমিতে পারিল না— নিস্ফল হইয়া যাইতে লাগিল।

১৫। ৫টা বাজিয়া গেল; সন্ধ্যা আসিল। জেনেরাল টাউনশেণ্ড দেখিলেন যে তখনকার মত যুদ্ধ স্থগিত না রাখিলে আর চলে না। সমস্ত জীবন্ত সেনাদলকে একত্র করিয়া—দেখার দরকার হইল, যে কতদূর পর্য্যন্ত সেদিনকার ব্রিটিশ আক্রমণ ফলবৎ হইয়াছে। তুরস্কের কি কি ট্রেঞ্চ লাইন ব্রিটিশ দখলে ঠিক আসিল—তাহা নিরাকরণ করাও প্রয়োজন। টাউনশেণ্ড ভাবিয়াছিলেন যে তুরস্কেরাও ত খুব মার খাইয়াছে; উহাদের ভিতরে মৃতের ও আহতের সংখ্যা কম হইবে না। হয়ত বা ঐ কারণে উহারা রাতারাতি ওখান হইতে পলাইয়া যাইবে। তাঁহার এরূপ ভাবাও ভুল হইয়াছিল।

ত্রিচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। তুরস্কদের প্রথম লাইনের যে ট্রেঞ্চ খণ্ডের দখল ব্রিটিশ ফৌজরা পাইয়াছিল, তাহারই নিকট সমস্ত জীবন্ত ব্রিটিশ সেনা দলকে একত্র বা জমায়েৎ হইবার হুকুম টাউনশেণ্ড দিলেন। সে জমায়েৎ বিফল করিতে তুরস্ক-ফৌজ কোন রকমে চেষ্টা করে নাই। সন্ধ্যা হইবামাত্র উহারাও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল; এবং প্রথম লাইন ট্রেঞ্চ ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ লাইনে গিয়া বসিল।

২। ২২শে নভেম্বরের ঘোর অন্ধকার রজনী—অতি ভীষণ। সমর ক্ষেত্রের দৃশ্য সে রাত্রে নিতান্ত ভয়াবহ। যখন গভীর রাত্রে ব্রিটিশ সেনাদল জমায়েতের জন্য সেই ট্রেঞ্চ খণ্ডের নিকট হাজির হইল—তখন দেখা গেল যে সে ট্রেঞ্চটা দুই পক্ষেরই কবর-স্থান হইয়া আছে। সেখানে ব্রিটিশদের ও তুরস্কদের এত লোক মৃত অবস্থায় রক্তময় কাদাতে ঝটাপটি খাইয়া, ট্রেঞ্চ ভর্ত্তি করিয়া, তারে জড়াইয়া পড়িয়া আছে যে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।

সৈনিকদের জমায়েত হইবার সাঙ্কেতিক স্থানে পৌঁছিতে

রণ-ক্ষেত্রেরমধ্য দিয়া চলাচলের পথ কোথা ? সমস্তই দুইপক্ষের মৃত এবং আহত সৈনিকে এবং জন্তুতে (ঘোড়াতে, গরুতে গাধাতে, খচ্চরে) পূর্ণ—স্থানে স্থানে রক্তের পুকুর, রক্তের ডোবা—আর চতুর্দিকেই রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছে।

৩। জীবিত সৈন্যদের জমায়েত করাইবার উদ্দেশ্য যে পরদিন কি ভাবে যুদ্ধ চলিবে তাহারই হুকুম দিবার জন্য। জমায়েতে কত লোক হাজির হইল ? একজন জেনেরাল তাঁহার অধীন ৭০০ লোক হাজির করিলেন, আর একজন, ৮।৯ শত লোক—আর একজন, এক হাজার লোক।

৪। এত অল্প সংখ্যক লোক দিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আক্রমণ করা—একেবারে অসম্ভব বিবেচিত হইল। যাহা সম্ভব তাহাই করিতে হইবে এবং ঘোর বিপদে তাহা করাই শ্রেয়। আত্মরক্ষার্থ টেসিফনের সেই প্রাচীন প্রকাণ্ড দেয়াল হইতে নদীর ধার অবধি রক্ষা করা ব্রিটিশদের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হইল—পরদিনের যুদ্ধ আরাম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে জাহাজে নৌকায় বজরায় আহতদের সরাইয়া ফেলা হয় তাহার বন্দোবস্তের হুকুম হইল।

তখনই টাউনশেণ্ড ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিলেন যে টেসি-ফনের যুদ্ধে উনি পরাজিত হইয়াছেন; আর জয়ের আশা নাই;

বাগদাদে 'জয়-প্রবেশ' আর হইবে না; কোনও গতিকে বিজিত ব্রিটিশ ফৌজদের লইয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।

৫। ব্রিটিশদের সেই জয়-করা প্রথম লাইনের ট্রেঞ্চের নিকটেই—দিনমানে, প্রখর লড়ায়ের মধ্যে, যতদূর সম্ভব—আহতদের আনিয়া জমা করা হইয়াছিল। মামুলি খচ্চরের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী গুলা আর ডুলি গুলা, গুলি গোলার চোটে একেবারে লোপাট হইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ আহত সৈনিকেরই পায়ে চলিবার শক্তি ছিল না। উহাদের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাছাই করিয়া তুলিয়া, মানুষে-ঠেলা গরুর গাড়ীতে আনিবার বন্দোবস্ত হইল। গরুর গাড়ীতে ত স্প্রিং থাকেনা; উহাতে চড়িয়া আহতদের আসিতে কি কষ্ট, যন্ত্রনা, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তার উপর—উহাদের তৃষ্ণার্ত্ত মুখে জল দিবার জল নাই—আহার করিবার খাদ্য নাই—আর রাত্রে ভয়ানক শীত।

৬। যে চারিটী অ্যামবুলেন্সের দল, অর্থাৎ ডাক্তারদের দল, রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের সরঞ্জাম ও আয়োজনের বল ছিল মাত্র ৪০০ শত আহতদের শুশ্রূষা করিবার উপযোগী। আর তাঁহাদেরই উপর চাপ পড়িল দিনে রাতে ৩৫০০ (তিন

হাজার পাঁচ শত) আহতদের শুশ্রূষা করিবার। ঐ সংখ্যা খুব কম করিয়াই ধরা গেল। এই ডাক্তারদের দলের ভিতর কল্যাণ ছিল—এবং সে এই যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয়ে কাজ করিয়া সুখ্যাতি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিল।

৭। গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধের ইতিহাসে ডাক্তারদের এই চারিটী দলের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ইতিহাসে এই মর্ম্মে লেখা আছে:—"ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ শারীরিক ক্লেশ ও প্রাণের আশঙ্কাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, শত্রুর আগ্নেয় গোলা গুলিকে কিম্বা খুনে আরব দস্যুদের ছোরা ছুরিকে ভয় না করিয়া, সমস্ত দিন যুদ্ধের মধ্যে আর রাত্রে যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও, অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। এত অধিক পরিশ্রমের চাপে, ক্লান্ত দেহে তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেও কেহ কিছু বলিতে পারিত না. কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ক্লান্ত শরীরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আহতদিগকে—কি মিত্র কি শত্রু—সমভাবে ঐকান্তিক শুশ্রূষা করিয়াছেন। উঁহাদের কার্য্য-কলাপে সমগ্র ব্রিটিশ মেডিকেল সারভিস গর্ব্বিত হইয়াছে।"

আমাদের কল্যাণ যে সহকর্ম্মীদের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে, "ব্রিটিশ মেডিকেল সারভিসের গর্ব্ব" অর্জ্জন করিতে

পারিয়াছিল উহাই আমাদরে শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ের একমাত্র প্রলেপ।

৮। কল্যাণ নিজে সেই দিনকার যুদ্ধে অল্প আহত হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সে এক সৈনিকের শুশ্রূষা করিতেছিল, এমন সময় এক গুলি আসিয়া তাহার বাঁ হাতের কনুইয়ে লাগে, খুবই রক্তপাত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সমানে সেদিন কাজ করিয়া গিয়াছিল। তাহার জখম হওয়ার কথা, এবং টেসিফনের যুদ্ধে ব্রিটিশদের হারিয়া যাইবার কথা, তাহার নিজের ২৫শে ও ২৮শে নভেম্বরের চিঠিতে দেখিতে পাইবেন।

৯। এখন ২২শে নভেম্বরের গভীর অন্ধকার রাত্রের জমায়েত হইতে ২৩শে নভেম্বর অবধি ব্রিটিশ ফৌজদের অবস্থাটা কি ভাবে দাঁড়াইল তাহা জানা প্রয়োজন।

ব্রিটিশ ফৌজদের ভিতর প্রায় শতকরা ৬০ জন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ শতকরা ৬০ জনের ভিতর মৃত আছে, আহত আছে। চৌদ্দ হাজার ফৌজের মধ্যে শতকরা ৬০ জন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে প্রকাশ পায় যে ৮৪০০ লোকের পক্ষে পরদিন যুদ্ধে যোগ দেওয়া অসম্ভব।

১০। সেই গভীর অন্ধকার রাত্রের জমায়েতে টাউনশেণ্ড বুঝিতে পারিলেন যে ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট দিগকে এক রাত্রের

মধ্যে পুনর্গঠন করিয়া তোলা যাইতে পারেনা। পরদিন প্রাতে (২৩শে নভেম্বর) স্বচক্ষে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া ঐ ধারণা তাঁহার মনে আরও বদ্ধমূল হইল।

১১। এক দিনকার যুদ্ধে ব্রিটিশদের তরফের লোকেরা এবং জন্তুরা এত ক্লান্ত ও কাতর হইয়া পড়ে যে তাহা আর বলা যায় না। ব্রিটিশদের সমস্ত দল বলই একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহাদেরও ভীষণ জল কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়া ছিল। জল ছিল তিন মাইল দক্ষিণে "বুস্তান" গ্রামে, আর খোরাক এবং বারুদ ছিল ১০।১২ মাইল দক্ষিণে "লাজ্" গ্রামে। এই সব মুস্কিলের উপর উঠিল আর এক মুস্কিল। প্রাতঃকাল হইতে খুব ঝড় আরম্ভ হইল। ধূলাতে বালিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কিছু দেখিয়া ঠিক করা যায় না।

১২। ২৩শে নভেম্বর বেলা দেড়টার মধ্যে সেই টেঞ্চখণ্ড আর সেই প্রকাণ্ড দেয়াল হইতে নদীর কিনারা অবধি ব্রিটিশের দল বল আত্মরক্ষার জন্য কিছু কিছু আয়োজন করিয়া ফেলিল। শত্রু যে আক্রমণ করিতে ছাড়িবেনা তাহা টাউনশেণ্ড বেশ বুঝিয়াছিলেন।

১৩। তুরস্কেরা বেলা ২টার পর হইতেই গোলা গুলি বর্ষণ

জুড়িল। এবং সূর্য্যাস্তের পর সেই ট্রেঞ্চ খণ্ডের দিকে ব্রিটিশদের খুবই আক্রমণ করিল। তখন অবধি সমস্ত আহতদের ব্রিটিশরা সরাইয়া দিতে পারেন নাই, যদিচ সমস্ত দিনই ঐ কাজ চলিয়াছিল। সেই আক্রমণ ১২।১৩ ঘণ্টা, অর্থাৎ রাত তিনটা পর্য্যন্ত চালাইয়া তুরস্কেরা ক্ষান্ত হয়।

উহারা ব্রিটিশদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই—সেই ট্রেঞ্চখণ্ড কাড়িয়া লইতে পারে নাই।

রাত ১১টায় প্রকাশ পায় যে ব্রিটিশদের গোলাগুলি প্রায় সব ফুরাইয়া গিয়াছে, তখন ঘোড়-সওয়ারেরা গাড়ী চালাইয়া রাত তিনটার ভিতর লাজ্‌গ্রাম হইতে টাটকা গোলাগুলি লইয়া আইসে।

১৪। নুর্‌উদ্দিন যখন দেখিলেন যে উঁহার ফৌজরা ২৩শে নভেম্বর অত চেষ্টা করিয়াও ব্রিটিশদের হঠাইতে পারিল না, তখন তিনিও মুহ্যমান ও হতাশ হইয়া পড়েন। উঁহার দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ লাইন আদৌ মজবুত ছিল না। উঁহার ভয়ের ঐ এক প্রধান কারণ—পাছে ব্রিটিশরা নূতন ফৌজ আনাইয়া পিছন হইতে ঐ দ্বিতীয় ট্রেঞ্চ আক্রমণ করে।

১৫। ২৩শে আর ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশদের তরফে মাত্র ৮২ জন আহত হইয়াছিল জানা যায়।

২৪শে নভেম্বর একদল তুরস্ক-অশ্বারোহীকে ব্রিটিশরা খুব মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।

২৪শে ভোর বেলা হইতেই আহতদের আর গ্রেপ্তারি-তুরস্কদের লাজ্‌গ্রামে পূর্ণমাত্রায় চালান করিতে টাউনশেণ্ড সমর্থ হয়েন। ছোট ছোট গরুর গাড়ীতে, দুইজন শুইয়া তিনজন বসিয়া, ঢকর ঢকর করিতে করিতে, অতি কষ্টে ও যন্ত্রণায় আহতের দল সব লাজ্‌গ্রামে রাত ১৷৷টার সময় পৌঁছিয়া যায়।

১৬। ২৪শে নভেম্বরেও তুরস্কেরা বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ঐ প্রকাণ্ড দেয়ালকে—যাহার তলায় অধিকাংশ ব্রিটিশ ফৌজ তখন ছিল—আক্রমণ করে; কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই।

সেইদিন সন্ধ্যা রাত্রে ব্রিটিশরা ঐ টেঞ্চগুলি ছাড়িয়া দিয়া নিরাপদে ঐ প্রকাণ্ড দেওয়ালের নীচে আসিয়া আডডা গাড়িল।

১৭। ২৫শে নভেম্বর ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের দলবল লাজ্‌-গ্রামে হঠিয়া আসিতে লাগিল। তুরস্কেরা আর ব্রিটিশদের আক্রমণ না করিয়া টেসিফন হইতে আরও উত্তরে এক গ্রামে গিয়া স্থির হইয়া বসিল।

১৮। ঐ তারিখে লাজ্‌গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কল্যাণ তার মাকে এক পোষ্ট কার্ড পাঠায়; তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

মা,

২৫।১১।১৫

২২শে যুদ্ধ করতে গিয়ে যা হাল হয়েছে তা লিখে জানাবার নয়। লিখলেও আটকাবে। পরে যদি লিখতে পারি ত লিখব। ২২শে ৩টা নাগাত আমার বাঁ কনুইএ এক গুলি লাগে। কি ভাগ্যি অন্য কোথাও লাগেনি। জখম সামান্যই হয়েছে। যেখানে গুলিটা ঢুকেছে সেখানে ছোট্ট একটু গর্ত্ত। কিন্তু গুলিটা বার হয়নি। যেখান থেকে বার হবার কথা সেখানে এসে আটকেচে—সেই খানটাই ব্যথা। আমি হাঁস-পাতালে যাইনি। যদি ব্যথা না যায় তাহলে হয়তো "এক্স্‌রে" করতে হবে। খুব বেঁচে গিয়েছি। আশা করি তোমরা ভাল আছ।

তোমার

কল্যাণ

——০——

১৯। ২৬শে নভেম্বর টাউনশেণ্ড সাহেব সম্পূর্ণভাবে নিজের সম্মান ও ইজ্জত বাঁচাইয়া লাজ্ গ্রামে হঠিয়া আসিলেন। নিক্সন সাহেবও পলাইয়া তখন আজিজিয়া গ্রামে পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

১৫।• এই খানে কল্যাণের ২৮শে নভেম্বরের চিঠি উদ্ধৃত করিয়া এই উচ্ছ্বাস শেষ করিব। সে এই লিখিয়াছিল :—

২৮-১১-১৫

মা,

এ মেলে তোমার ২৭শে অক্টোবরের চিঠি পর্য্যন্ত পেয়েছি। আমরা ২১শে নভেম্বর যুদ্ধ করিতে বাহির হই। সমস্ত রাত মার্চ করে পরদিন সকালে প্রধান যুদ্ধ হয়। সমস্ত দিন ধরে ভয়ানক রকম যুদ্ধ হয়ে ছিল। দু'দলেই খুব হত আহত হয়েছে।

৩টা নাগাদ আমি একটা আহতকে ড্রেস করে, তার কাছে শত্রুর দিকে পেছন ফিরে ষ্ট্রেচার বেহারাকে ডাক ছিলাম— এমন সময় বাঁ কনুইএ গুলি লাগে। বেশি কিছু লাগেনা। আমার মনে হল যেন কনুইএ কে হাতুড়ি দিয়ে জোরে মারলে। তারপর সমস্ত হাতটা কন্ কন্ করতে লাগল। আমি গোড়ায় টেরই পাইনি যে ঢুকেচে। ভয়ানক কন্ কন্ করতে লাগল,

তারপর কোট ভিজে রক্ত বাহিরে আসাতে, বুঝলাম মাংসের ভিতর ঢুকেচে। তখনই কোট খুলে পটি বাঁধলাম। গুলিটা বার হয় নাই, সামনে এসে আটকেছে, তাতে কিছু আসে যায় না। ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে। যে থানে ও গুলিটা রয়েছে সেখানটা ৩।৪ দিন খুব ব্যথা ছিল। বাঁ হাতটাতে কিছু কাজ করতে পারিনি। আজ ব্যথা কমেছে। বাঁ হাতেও সব কাজ করতে পারচি। গুলিটা বার করবারও দরকার নেই। গুলি খেতে যা না লেগেছিল অস্ত্রকরে বার করতে তার চেয়ে বেশী লাগবে।

৪০০ শত আহত নিয়ে জাহাজে করে কুতেল-আমরায় যাচ্চি। রোগীর চার্জে আছি। রোগী পেঁাছে আবার ফিরে যাব।

নাম মাত্র গুলি লেগেছে। একটু বেশী রকম লাগলে ইণ্ডিয়া যাবার জন্যে ছুটী চাইতে পারতাম।

তোমাদের টেলিগ্রাম করতে ইচ্ছে, যাতে কাগজে আহতের মধ্যে আমার নাম দেখে ভয় না পাও। আমার মনে হচ্চে যে আমি কেন সাধ করে টেলিগ্রাম করে খবর দিতে যাই। হয়ত খবরের কাগজে নাম তোমাদের চখেই পড়বে না।

অন্য খবর বিশেষ কিছু নেই। কয়েক দিন জিরিয়ে

আবার অ্যামবুলেন্সে ফিরে যাব। আশা করি তোমরা সব ভাল আছ।

তোমার—

কল্যাণ।

চতুশ্চত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। টেসিফনের যুদ্ধে তুরস্কদের প্রায় ৯৫০০ লোক ক্ষয় হয়। জেনেরাল নুরউদ্দিনের মনে একটা ভয় ছিল পাছে ব্রিটিশরা হঠিয়া যাইবার ছলনা করিয়া, কিছুদূর হঠিয়া গিয়া পুনরায় তাজা আর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ফের ঘেরাও করিয়া পিছন হইতে আক্রমণ করে। সেই ভয়ে প্রথমত উনি তুরস্ক সৈন্যদের ট্রেঞ্চ ছাড়িয়া বহুদূরে অগ্রসর হইতে দেন নাই।

২৭শে নভেম্বর প্রাতে যখন উনি দেখিলেন যে টাউনশেণ্ড সসৈন্যে রাতারাতি বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছেন—তখনই উনি বুঝিলেন যে টাউনশেণ্ডের হাতে কোনও রিজার্ভ সৈন্য ছিল না বলিয়াই ব্রিটিশরা ঐরূপ ভাবে পলাইয়াছে।

২। ইতিমধ্যে নুরউদ্দিনের হাতে ভাল ভাল তাজা ও বহুসংখ্যক রেজিমেণ্ট বাগদাদ হইতে আসিয়া পড়িল। উনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া দলে দলে নদীর দুই কিনারা দিয়া ঘোড়-সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য টাউনশেণ্ডের পলাতক দলকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য পাঠাইতে লাগিলেন। আর সেই সঙ্গে নদীর দুই পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের আরবী প্রজাদের

অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া ইংরাজদের বিপক্ষে উত্তেজিত করাইবার জন্য গোয়েন্দার দল লাগাইয়া দিলেন। নিম্নতন সৈনিক কর্ম্মচারী-দিগকে এক এক গ্রামের নেতা নিযুক্ত করিলেন। আরবী প্রজাদের প্রকৃতিই লুটতরাজ ও দস্যুবৃত্তি করা; যে দল হারিয়া পলাইতেছে তাদের উপর শত্রুতা করা।

৩। যে টাউনশেণ্ড পর পর "আমারা" "নাসিরিয়া" "কুতেল-আমারা" জয় করিয়া, ব্রিটিশদের ভিত্তি গাড়িয়া— তাঁহাদের জয় পতাকা বাগদাদে উড্ডীন করিবেন বলিয়া, টেসিফন অবধি চড়াও করিয়া গিয়াছিলেন—সেই টাউনশেণ্ড নুর্‌উদ্দিনের হাতে খুব মার খাইয়া সসৈন্যে পলাইতেছেন— এই জনরবটা চতুর্দ্দিকে হুতাশনের মত ছড়াইয়া পড়াতে টাউন-শেণ্ডের আর তাঁর ফৌজদের অবস্থাকে নিতান্তই শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

৪। নুর্‌উদ্দিন ২৭শে নভেম্বর তাঁহার এয়ারোপ্লেনে খবর পাইলেন যে টাউনশেণ্ডের দল লাজগ্রামে বসিয়াছে। সেইদিন প্রাতে টাউনশেণ্ড তারযোগে জেনেরাল নিক্সনকে এই মর্ম্মে জানাই-লেন "আমার কাছে এখানে (লাজগ্রামে) গোরা সৈন্যদের ১০দিনের রসদ আর ভারতবর্ষীয় সৈন্যদের ৭দিনের রসদ আছে। প্রচুর, বারুদ ও গোলা গুলি আছে। আমার প্রস্তাব যে ঐ রসদ

ফুরাইয়া আসিলে আমি সসৈন্যে আজিজিয়াতে গিয়া বসিব। সেখানে সৈন্য সামন্ত সব ঠিকঠাক করিয়া ফের উপরে উঠিবার চেষ্টা করিব। এখানে আমি শত্রুর এত নিকটে, যে ওসব করার সুবিধা এখানে বসিয়া হইবে না—শত্রুর আরও দূরে থাকার প্রয়োজন। তুমি আজিজিয়াতে নূতন তাজা সৈন্য আর জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি কত সময়ের মধ্যে পাঠাইতে পার? অনুমান ২॥ মাসের কমে নয়—গত বৎসর ত ঐসব স্থান ডিসেম্বরের বৃষ্টিতে আর নদার বাড়তি জলে ডুবিয়া গিয়াছিল।"

৫। ঐ তার পাঠাইবার পরেই টাউনশেণ্ড এয়ারোপ্লেনে খবর পাইলেন যে বার হাজার তুরস্ক পদাতিক আর চার শত অশ্বারোহী ফৌজ টেসিফন ছাড়িয়া লাজগ্রামের দিকে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ টাউনশেণ্ড লাজগ্রাম হইতে সসৈন্যে পলাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। এক লম্বা ২২ মাইল মার্চ করিয়া একেবারে আজিজিয়া গিয়া বিশ্রাম করিবেন ঠিক করিলেন। বেলা ১২টার পরেই এই লম্বা চম্পট-যাত্রা আরম্ভ হইল। যে সকল তাঁবু গাড়া হইয়া ছিল, তাহাদিগকে খাড়া রাখিয়াই পলাইতে হইল—শত্রুর চক্ষে ধূলি দিবার জন্য। আর সেই সঙ্গে অনেক রসদ ইত্যাদি—আহারের সামগ্রীও ফেলিয়া

আসিতে হইল—তুলিয়া আনিবার গাড়ার অভাবে। রাত ২টার পরেই টাউনশেণ্ডের দল এক এক করিয়া আজিজিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। সঙ্গে তুরস্ক-বন্দীর ও আহতদের অনেক দল ছিল।

৬। লাজ গ্রাম হইতে আজিজিয়া গ্রামে পলাইয়া আসিবার সময়—জানা গেল, যে জলপথে বড় বড় কামান ইত্যাদি নৌকাতে বা ছোট ছোট জাহাজের পিছনে বাঁধা বজরাতে বোঝাই করিয়া আনা কি দুরূহ ব্যাপার। নদীতে জল কম বলিয়া ক্রমাগত কাদায় ভারী ভারী নৌযান বসিয়া যায়—আর তাহা-দিগকে দড়ি দিয়া টানিয়া ঠেলিয়া ফের গভীর জলে ভাসান লোক-জনের পক্ষে ভয়ানক পরিশ্রমের ব্যাপার—বিশেষতঃ পলাইবার পথে। সৈন্যদের পক্ষেও নদীর আঁকা বাঁকা পথে ঐ সব নৌযান, লুটবহরের সঙ্গে তদারক করিতে করিতে চলা বড়ই ক্লান্তি-দায়ক—দ্বিগুণ হাঁটিতে হয়। তার উপর ভয়, ভাবনা, চিন্তা—যে পিছনের শত্রু কখন ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

৭। টাউনশেণ্ড আজিজিয়া দু'দিনমাত্র থাকিবার অবসর পান। সেই দু'দিনের ভিতর বজরা করিয়া আহতদের এক জাহাজের সঙ্গে ২৯শে নভেম্বর চালান করেন।

এখান হইতে টাউনশেণ্ড নিক্সনকে তারে জানান যে "যেই

শুনিব যে শত্রু ঝোরগ্রাম ছাড়িয়া আমার দিকে রওয়ানা হইয়াছে আমি তৎক্ষণাৎ কুতেল-আমারার দিকে পলাইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিব। আমি এখন আমার ভগ্ন সৈন্য লইয়া তুরস্কদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে একেবারে পারিব না। কুতেল-আমারায় পলাইয়া গিয়া আশ্রয় না লইলে আত্ম রক্ষা নাই। অনুমান—শত্রু ঝোর গ্রাম ছাড়িয়া—তাহার টেসিফনের ভাল ট্রেঞ্চ ফেলিয়া সে বেশী দূর নামিয়া আসিবে না।"

৮। ঐ ২৮শে নভেম্বর দুইটি তাজা ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট আজিজিয়াতে টাউনশেণ্ডকে সাহায্য করিতে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। বৈকালে খবর আসিল যে তুরস্কের ফৌজ ঝোর গ্রামের নিকটেই রাত্রির জন্য তাঁবু গাড়িয়াছে।

নদীতে, টাউনশেণ্ডের কাছে, ছিল চারটি জাহাজ তার ভিতর একটীর ("সয়তানের") কেমন করিয়া তলা ফাটিয়া যাওয়াতে জল উঠে, আর তাহা বন্ধ করিতে অন্য জাহাজ গুলা ব্যস্ত ছিল।

২৯শে নভেম্বর কুটুনিয়া গ্রামের নিকট তুরস্কের আগুয়ান ফৌজ "সয়তানের" উপর গোলা গুলি বর্ষণ করাতে অন্যান্য জাহাজ গুলা পলাইয়া যায় আর "সয়তান" পুড়িতে থাকে। এই খবর টাউনশেণ্ড পাইয়াই স্থির করিলেন যে পরদিন প্রাতে

৯টার মধ্যে দশ মাইল দূর "উম-আত-তুবুল" গ্রামে নামিয়া আসিবেন।

৯। তাহাই করা হইল। ৩০শে নভেম্বর অতি প্রত্যুষে বড় বড় কামান্ ইত্যাদি বজরা করিয়া কুতেল-আমারায় চালান হইল। আর পথরক্ষক একদল অশ্বারোহীকে জেনেরাল মেলীশের অধানে পাঠান হইল। টাউনশেণ্ড স্বয়ং সসৈন্যে বেলা ৯টায় আজিজিয়া ছাড়িয়া দুপ্রহরের মধ্যে ঐ "উম-আত-তুবুল" গ্রামে পৌঁছিয়া যান।

আজিজিয়াতেও বাহন অভাবে আহারের দ্রব্যাদি অনেক জ্বালাইয়া দিতে এবং ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

১০। উম-আত-তুবুলে টাউনশেণ্ডের দল খুব সতর্ক ভাবেই সে রাত্রে ছিল। নদীর তীরে উহাদের এক তাঁবু পড়ে। ঐ তাঁবুর দক্ষিণে নদী, আর নদী-বক্ষে এক রণপোত পাহারা দেয়। পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, পদাতিক দলদের তাঁবু পড়ে। প্রত্যেক দল-কেই তাদের নিজের দিক রক্ষার ভার দেওয়া হয়। মাঝখানের তাঁবুতে স্বয়ং টাউনশেণ্ড নিতান্ত ভাবিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া রাত কাটান—কারণ গভীর অন্ধকার রাত্রে বড় বড় কামান-গাড়ীর চাকার আওয়াজ উনি শুনিতে পান। তাহাতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন, এই ভয়ে যে নুরউদ্দিনের ফৌজ ত আসিয়া

পড়িল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে।

১১। টাউনশেণ্ড গোলা গুলির আওয়াজ আর না পাইয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন, এবং চুপে চুপে অন্ধকারে প্রত্যেক দিক্‌কার তাঁবুতে যাইয়া, পরদিন উষায় কোন্ কোন্ দল কি ভাবে কামান ইত্যাদি সাজাইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে তাহা বিশদ ভাবে সৈন্যদিগকে বুঝাইয়া দেন। আর গুপ্ত ভাবে দুই ঘোড়-সওয়ারকে পাঠাইয়া দেন জেনেরাল মেলীশকে খবর দিতে (তাঁহাকে ঘোড়-সওয়ার দলের নেতা করিয়া পথ আগলাইবার জন্য আজিজিয়া হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) যে তিনি যেন তাঁর দলকে লইয়া শীঘ্র ছুটিয়া আইসেন।

১২। আলো-আঁধারে, খুব ভোরের বেলা (১লা ডিসেম্বর) তুরস্কের দল কিছু অবাক হইয়া দেখিল যে টাউনশেণ্ডের দল কামান সাজাইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। উহারা যে টাউনশেণ্ডের পলাতক ফৌজের অত নিকটে নিশি-যাপন করিয়াছে, রাত্রে অন্ধকারে জানিতে পারে নাই।

টাউনশেণ্ডের দল প্রথমেই কামান দাগিয়া তুরস্কদের সর্ব্ব আগুয়ান রেজিমেণ্টকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিল। উহারা,

নিজেকে সামলাইবার জন্য কিছু হঠিয়া যাওয়াতে, টাউনশেণ্ড গোলা গুলি বন্ধ করিয়া উল্টা দিক দিয়া শীঘ্র চম্পট মার্চের হুকুম দিলেন।

তুরস্কের সর্ব্ব আগুয়ান দল ঐরূপ ভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়াতে, নিজেদের ফের গুছাইয়া লইতে অনেক সময় ব্যয় করিল। টাউনশেণ্ডের দলও অনেক দূরে সরিয়া পড়িবার সুবিধা পাইল—ইতিমধ্যে জেনেরাল মেলীশের ঘোড়-সওয়ারের দলও আসিয়া ইঁহাদিগের সহিত যোগ দিল।

তারপর তুরস্ক ফৌজ যদিও টাউনশেণ্ডের দলকে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তাড়া করিতে ছাড়ে নাই কিন্তু কোনও ফললাভ না হওয়াতে উহারা ক্ষান্ত হয়।

১৩। টাউনশেণ্ড ঐ রকমে সৈন্যে তুরস্কের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনস্থ করিলেন যে—একেবারে ২৬ মাইল লম্বা মার্চ করিয়া একটিবারও পথে না দাঁড়াইয়া "কালা-শাদী" গ্রামে পৌঁছিবেন। তাহাই করিলেন। কিন্তু পদাতিক সৈন্যদের দুর্দ্দশা ও কষ্টের সীমা ছিল না। একে পথ খারাপ তার উপর আরব-দস্যুদের অত্যাচার ও খুবই বাড়িয়া উঠিয়া ছিল। সৈন্যদের সঙ্গে জল ছিলনা—খাবার ছিলনা। ক্ষুধিত আর তৃষিত হইয়া ২৬ মাইল পথ এক দমে—পথে না

দাঁড়াইয়া—চলা যে কি কষ্টকর তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

১৪। কালা-শাদী গ্রামে টাউনশেণ্ডের সর্ব্ব-আগুয়ান দল রাত ৯টার সময় প্রবেশ করে। আর সর্ব্ব পিছনের দল গ্রামের বাহিরের রাস্তাতেই লুঠাইয়া পড়িয়া প্রাণ বাঁচায়। নিদ্রাতেই উহাদের ক্লান্তি দূর হইত কিন্তু সে নিদ্রা তাহারা ১লা ডিসেম্বরের ভীষণ শীতে আর ভীষণ ক্ষুধার ও তৃষ্ণার জ্বালায়—পায় নাই। ২রা ডিসেম্বর প্রাতে উহারা গ্রামে প্রবেশ করিল। তথায় অল্প স্বল্প আহারাদি ও বিশ্রামের পর ঐ দিনই টাউনশেণ্ড উহাদের লইয়া কুতেল-আমারার জন্য যাত্রা করেন।

১৫। কালা-শাদী হইতে কুতেল-আমারা ২১ মাইল। পথে সেই আরব দস্যুদের অত্যাচার চলিয়াছিল। যাহা হউক উহারা কায়-ক্লেশে পৌঁছিয়া গেল। ১৮ মাইল হাঁটিয়া—উহাদের আর চলিবার শক্তি ছিল না। পদাতিকেরা পথে শুইয়া পড়িল। তখনও "কুতেল-আমারা" পৌঁছিতে তিন মাইল বাকী। অশ্বারোহীরা, পদাতিকদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া উহাদিগকে খুব যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া ছিল। "কুতেল-আমারা" হইতে কিছু কিছু খাবার ও জল আনিয়া উহারা পদাতিকদের খাওয়াইয়া ছিল। পরদিন প্রাতে (৩রা ডিসেম্বর) উহারা সকলেই "কুতেল-আমারায়" প্রবেশ

করে, এবং তারপর তথায় বিশ্রাম করিবার যথেষ্ট সময় পায়।

১৬। ঐরূপে সসৈন্যে শত্রুর কবল হইতে টাউনশেণ্ড নিজেকে আর তাঁহার অবশিষ্ট দল-বলকে বাঁচাইয়া আনিয়া, তাঁহার কৌশলের, চাতুরীর আর নেতৃত্বের যে পরিচয় দিয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কীর্ত্তিতে তাঁহার যশ সর্ব্বত্রই ঘোষিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উনি খুবই ধন্যবাদ ও প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন।

৩রা ডিসেম্বর হইতেই টাউনশেণ্ড "কুতেল-আমারা"কে নিজ দল-বলের কেন্দ্র করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

১৭। ৪ঠা ডিসেম্বর কল্যাণ তথা হইতে এই চিঠি পাঠায়ঃ—

৪-১২-১৫

মা,

তোমার ৫ই, ৯ই ও ১০ই নভেম্বরের চিঠি এখানে পাইলাম।

আমরা এখন "কুতেল-আমারায় রয়েছি। আমার হাতের জখম একেবারে আরাম হয়ে গেছে। আমি ফের কাজ করতে আরম্ভ করেছি। তুমি ও রকম শুধু শুধু ব্যস্ত হও কেন? ওরকম বদলি চাইলে কি পাওয়া যায়? আমার মত কত লোক রয়েছে।

আমি ত তবু ৮ মাস হল এখানে এসেছি। কত ডাক্তার যে এক বছরের বেশী রয়েছে—তাদেরই বদলি করবেনা তা আমায়।

আমার হাতে যে গুলি লেগেছে সেই ওজর করে হয়তো "আমারা" পর্য্যন্ত ফিরে যেতে পারতাম—তা লজ্জা করতে লাগল। কত শক্ত শক্ত জখমি রহিল—আমার ত নাম মাত্র জখম। আপনার জানা শুনা দল ছেড়ে কোথায় অন্য যায়গায় যাব ?

মামা খবরের কাগজ পাঠান বন্ধ করেছেন কেন ? দৈনিক কাগজ এখন কিছু পাই না। তোমার পাঠান রুমাল যথা সময়ে পেয়েছি, থাম ও এ মেলে পেলাম।

কল্যাণ

পঞ্চচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস

১। পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে যে জেনেরাল নিক্সন ব্রিটিশদের তরফে ইরাক খণ্ডে আসিয়া কি করিয়া তাঁহাদের পেট্রোলিয়ামের খনি আর ঐ তেলের পাইপ তুরস্কের হাত-হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া উনি জেনেরাল টাউনশেণ্ডের দ্বারা প্রথমে 'কূর্ণা' হইতে তুরস্কদের "আমারা" তৎপরে নাসিরিয়া দখল করাইলেন।

২। নাসিরিয়া দখল করিবার পরই কুতেল-আমারা জয় করিবার ইচ্ছা ঐ দুই জেনেরালের হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে। উঁহারা তখন নিজেদের মনকে আর ভারতগভর্ণমেণ্টকে এবং বিলাতের গভর্ণমেণ্টকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে "আমরা যদি "কুতেল-আমারা"য় আড্ডা গাড়িয়া বসিতে পারি (আর তাহা সহজেই পারিব কারণ আমাদের যথেষ্ট সৈন্য আছে— আর সৈন্য পাঠাইতে হইবে না) তাহা হইলে ঐ দুই স্থানের মধ্য দিয়া যে "শাতেল হাই" খাল গিয়াছে তাহা দিয়া আমরা সহজেই ইউক্রেটীজ ও টাইগ্রীশের পথ আটকাইতে পারিব— তুরস্কেরা আমাদের "নাসিরিয়া—শাতেল-হাই—কুতেল-আমারা"

লাইন ভেদ করিয়া বসরার দিকে আসিতে পারিবে না। কুতেল-আমারা ছাড়িয়া ব্রিটিশদের আর অধিক উত্তরে পশ্চিমে যাইবার প্রয়োজনই হইবে না। নাসিরিয়াতে আমাদের অত ফৌজ রাখিবার কোনও আবশ্যক হইবে না। চতুর্দ্দিক সংরক্ষণের জন্য "কুতেল আমারা"র মত স্থানই আর নাই ইত্যাদি ইত্যাদি" এসব কথাও পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে।

৩। কিন্তু "কুতেল-আমারা" সহজে জয় করিয়া ফেলিবার পরই ঐ দুই জেনেরালদের হৃদয় 'বাগদাদ' দখলের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাতে ভরিয়া গেল। উঁহাদের মনে একটা ধারণা হইল যে তুরস্কেরা ব্রিটিশ আক্রমণের গতিরোধ করিবার মত প্রস্তুত হইতে পারে নাই, পারিবেও না। অতএব পলাতক তুরস্ক সেনাকে তাড়া দিয়া 'বাগদাদ' অবধি শীঘ্র শীঘ্র চড়াও করাই যুক্তিযুক্ত। বাগদাদ দখল করাই শান্তিপ্রদ এবং তুরস্কের বসরার দিকে গতিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়।

৪। জয়ের মুখে, বাগদাদ প্রবেশের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়া টাউনশেণ্ড কতদূর গিয়া পড়িলেন কি করিলেন এবং টেসিফনের যুদ্ধে হারিয়া কি করিয়া পুনরায় সেই "কুতেল-আমারা"য় আসিয়া আশ্রয় লইলেন আমরা দেখিয়াছি। জয়ের মুখে, কুতেল-আমারা জয়ী শত্রুর হস্তে বিজিতের পক্ষে কি

ভীষণ কারাগার হইতে পারে তাহা ভাবিবার জেনেরাল নিক্সনের বা টাউনশেণ্ডের পূর্ব্বে সময় হয় নাই। উঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বাগ্‌দাদের গেট স্বরূপ টেসিফন হইতে উহাদিগকে ঐরূপ ভাবে হঠিয়া আসিতে হইবে।

৫। যখন ঐ দুইজনে বাগ্‌দাদ জয় করিবার উদ্দেশে ছুটিয়াছিলেন, তখন ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল রিমিংটনের জিম্মায় 'কুতেল-আমারা' থাকে। ইনি ঐ স্থানকে কাঁটাওয়ালা তার দিয়া ঘেরিয়া মনোমত ট্রেঞ্চ কাটাইয়া ছোট ছোট দুর্গ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া ব্রিটিশদের পক্ষে নিরাপদ করিবার ভার লয়েন।

৬। ঐ সকল কার্য্য করিতে করিতে রিমিংটন সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে "কুতেল-আমারা"কে বাস্তবিক নিরাপদ করিবার উপায় নাই। উহা টাইগ্রীশের এক উপদ্বীপ স্বরূপ। উহার তিন দিক দিয়া নদী ঘুরিয়া গিয়াছে, কেবল উত্তর দিকে জমি। শত্রুপক্ষ অল্পসংখ্যক সৈন্যদ্বারা জমির দিকে এবং নদীর ওপারে অর্থাৎ পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বড় বড় কামান সাজাইয়া সহজেই উহাকে বিষম ভাবে ঘেরাও করিতে পারিবে এবং গোলা গুলি বর্ষণ করিয়া উহাকে নরক-কুণ্ডেরও অধম অবস্থায় পরিণত করিতে পারিবে।

৭। রিমিংটন সাহেব জেনেরাল নিক্সনকে ঐ মর্ম্মে

রিপোর্ট করেন আর ২রা ডিসেম্বরে, যে দিন টাউনশেণ্ড কুতেল-আমারায় ফিরিয়া আইসেন, সেই দিন পথে দেখা করিয়া কুতেল-আমারা যে নিরাপদ স্থান নয় তাহা টাউনশেণ্ডকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেনঃ—"কুতেল-আমারায় ব্রিটিশ ফৌজদের কেন্দ্র স্থান করিয়া বসিয়া যাইলে শত্রু দ্বারা উহা ঘেরাও হইয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা। তদপেক্ষা, আরও ১০।১২ মাইল দূরে "এস্‌সীন" নামক খোলা মাঠে তাঁবু পাতিয়া সৈন্যদের রাখা ঢের শ্রেয়—পলাইবার পথ থাকিবে।"

তদুত্তরে টাউনশেণ্ড বলেন যে "আমি আর আমার ফৌজ এত ক্লান্ত যে আর শক্তি নাই যে এস্‌সীনে যাই। আমাদের যা হবার হউক আমি কুতেল-আমারাতেই থাকিব।"

৮। টাউনশেণ্ড ২রা হইতে ৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে নিক্সনকে তার-যোগে জানান যে "আমার ১০ মাইল পিছনে শত্রু—আমি নিরুপায় হইয়া কুতেল-আমারায় ঢুকিতে এবং তথায় আড্ডা গাড়িতে বাধ্য হইলাম। আমার সঙ্গে ৭৫০০ পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার। তাছাড়া অন্যান্য দল লইয়া আমার লোক বল ১০৩৯৮ হইবে। আমাদের আর শক্তি নাই যে আরও দূরে গিয়া আড্ডা গাড়ি। শত্রু আমাকে নিঃসন্দেহে এস্থানে শীঘ্র ঘেরাও করিবে। আমার কাছে গোরা সৈন্যকে খাওয়াইবার

রসদ এক মাসের আছে আর ভারতবর্ষীয় সৈন্যদের খোরাক ৫৫ দিন চলিবে। এস্থান ঘেরাও হইবার পর তুমি এক মাসের মধ্যে আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।"

৯। জেনেরাল নিক্সন খুব আশ্বাস দিয়াই টাউনশেণ্ডকে উত্তর দেন। আর তাঁহার পরামর্শে টাউনশেণ্ড কুতেল-আমারা হইতে ঘোড় সওয়ারের দল—নৌকা বজরা ইত্যাদি লট-বহর যাহা তুরস্কেরা সহজে আটক বা নষ্ট করিতে পারিবে তাহা সমস্তই নীচে "শেখ-শাদ" বা "আলি-ঘরবি" গ্রামের দিকে পাঠাইয়া দেন।

১০। নুরউদ্দিনের ফৌজ আসিয়া ৬।৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কুতেল-আমারা ঘেরাও করিয়া ফেলিল। রিমিংটন্ সাহেব যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন তুরস্কেরা ঠিক তাহাই করিল। জমির দিকে অর্থাৎ কুতেল-আমারার উত্তর দিকে উহারা "তিননরী-হারের" মত তিন লাইন ট্রেঞ্চ কাটিয়া বসিয়া গেল। উহা ভেদ করিয়া কাহার সাধ্য যে আসে যায়? নদীর দিকে অর্থাৎ কুতেল-আমারার পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণ আর পূর্ব্ব দিকেও এই ভাবে আটক করিল।

১১। এই পুস্তকের ম্যাপে দেখিবেন যে কুতেল-আমারার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে টাইগ্রীশের সহিত "শাতেল হাই" খালের

যোগ হইয়া, খাল দক্ষিণ দিকে বহিয়া গিয়াছে। ঐ খালকে মাঝ খানে রাখিয়া উহার দুই ধার দিয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রের আকারে দুই দিকে দুই লাইন ট্রেঞ্চ কাটিয়া, বড় বড় কামান সাজাইয়া তুরস্ক ফৌজ বসিয়া গেল। পশ্চিম দিকের অর্দ্ধচন্দ্র, খালের বাঁ পার দিয়া টাইগ্রাশের ডান পারের সঙ্গে যুক্ত হইল আর অন্য অর্দ্ধচন্দ্র, ঐ খালের ডান দিক হইতে গিয়া কুতেল-আমারার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে টাইগ্রীশের এক বাঁকের সঙ্গে যুক্ত হইল। উহাতে কুতেল-আমারার দক্ষিণ আর পূর্ব্ব দিক্‌কার জলপথ আটক পড়িল। আর ঐ দুই অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া সমস্ত জলপথ—শাতেল-হাইয়ের পথ অবধি তুরস্কেরা সব আটকাইয়া ফেলিল।

১২। ৭ই ডিসেম্বরে নাকি নুরউদ্দিন, টাউনশেণ্ডকে সসৈন্যে তুরস্কের হাতে অত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া এক পত্র পাঠান। তাহা টাউনশেণ্ড অগ্রাহ্য করিয়া পদদলিত করিয়া ফেলেন।

তারপর হইতে তুরস্কের গোলা গুলি কুতেল-আমারার সর্ব্বত্রই পড়িয়া টাউনশেণ্ডের দুর্গ ইত্যাদি ও লোক জনকে ক্ষয় করিতে লাগিল। সেখানকার বাজারে অগ্নিময় বোমা পড়িয়া দোকান পাট জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। কুতেল-আমারা ছোট সহর, তথায় ৬।৭ শত তুরস্ক ও আরব প্রজার বসতি মাত্র।

সেখানকার বাজারে শাটেল-হাই খাল-ধারের ও নিকটস্থ টাইগ্রীশের গ্রামসমূহের ফসল আমদানি রপ্তানি হইত।

১২। ব্রিটিশদের অত লোক-জন ও জন্তু-জানোয়ার তথায় আসিয়া পড়াতে কুতেল-আমারার বায়ু নিতান্তই দোষাবহ ও দুর্গন্ধময় হইয়া পড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ও ব্রিটিশ ফৌজদের ভিতর পীড়াতেও অনেক লোক মরিতে লাগিল। টাউনশেণ্ডকে নিতান্তই ভাবিত করিয়া ফেলিল।

টাউনশেণ্ড নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সৈন্যদের বাঁচাইবার জন্য কুতেল-আমারার ভিতরেই নানা স্থানে ট্রেঞ্চ কাটাইয়া উহাদিগকে লুক্কায়িত ভাবে রাখিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

১৩। ২৪শে ডিসেম্বর চতুর্দ্দিক হইতে তুরস্কের ফৌজ টাউনশেণ্ডের দলকে ভীষণ আক্রমণ করে। টাউনশেণ্ড কোন প্রকারে উহাদিগকে তথায় প্রবেশ করিতে দিবেন না বলিয়া শত্রুদের উপর খুব গোলা গুলি চালাইয়াছিলেন।

উঁহার দল সে দিন খুব বীরত্বের সহিত যুঝিয়াছিল এবং সে আক্রমণ রোধ করিয়া দিয়াছিল। দু'পক্ষেরই লোকবল ক্ষয় হয়। টাউনশেণ্ডের সঞ্চিত গোলা গুলির ৬১ ভাণ্ডার

ঐদিনে খরচ হইয়া যায়। বিনা-তারে তারের খবর রোজ একবার কি দুইবার করিয়া টাউনশেণ্ড জেনেরাল নিক্সনকে পাঠাইতেন। তিনিও ব্রিটিশদের তরফে টাউনশেণ্ডকে উদ্ধার করিবার আয়োজন কতদূর হইয়া উঠিল তাহা জানাইয়া উঁহার হৃদয়ে জোর দিতেন।

১৪। এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। জানুয়ারী মাস (১৯১৬ খ্রীঃ) আসিয়া পড়িল। ব্রিটিশদের তরফ হইতে টাউনশেণ্ডকে উদ্ধার করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ২৪শে ডিসেম্বরের পর তুরস্কদের আক্রমণের ভীষণতা কমিয়া গেল—কেবল মাত্র দৈনিক একবার করিয়া রাত্রে চতুর্দ্দিক হইতে ঘণ্টা খানেক ধরিয়া গোলা গুলি বর্ষণ চলিতে লাগিল। দিনমানে লোকে পথে ঘাটে বাহির হইলে তাহাদের উপর গুলি মারাও বন্ধ হইল।

১৫। তুরস্কদের আক্রমণে এত ঢিলে পড়িল কেন ভাবিতে ভাবিতে টাউনশেণ্ড এক দিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে—"নুরউদ্দিনের মতলব উঁহাকে হত্যা করা নয়; উঁহাকে সসৈন্যে অনাহারে রাখিয়া জব্দ করিয়া আত্ম-সমর্পণ করান। তাহা করিতে গেলে নুরউদ্দিনকে আরও দূর দূর স্থানে গিয়া ব্রিটিশদের বসরা হইতে এদিকে আসিবার পথ আটক

করিতে হইবে। নুরউদ্দিন নিশ্চিত সেই কাজে ব্যাপৃত, আর তাই এই সব নিকটস্থ ট্রেঞ্চ গুলা হইতে অনেক সৈন্য সামন্ত সরাইয়া দূর দূর স্থানে পাঠাইয়াছে। তাই সে এই খানে এত ঢিলে দিয়াছে।"

১৬।• বুদ্ধিমান টাউনশেণ্ড ঠিকই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রিটিশদের বসরা হইতে পথ আটকাইবার জন্য নুরউদ্দিন জানুয়ারীর প্রথমেই কি কি কাজ সমাধা করেন তাহা সংক্ষেপে এইখানে দেখান হইল :—

(১) "কুতেল আমারা" হইতে "শাটেল-হাই" খাল ৫ মাইল দক্ষিণে আসিয়া "বেসকুইয়া" গ্রামকে দক্ষিণে রাখিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়াছে এবং আরও অর্দ্ধ-মাইল পরে এক পুলের নীচ দিয়া গিয়াছে। ঐ পুলের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের উত্তর ধারে এক অর্দ্ধচন্দ্রের আকারের (কিন্তু লম্বে প্রায় দু'মাইল) ট্রেঞ্চ কাটিয়া কামান সাজাইয়া তুরস্ক-ফৌজ বসিয়া যায়। ঐ পুল হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে 'আটাব' গ্রাম।

(২) "কুতেল-আমারা"র উত্তর পূর্ব্ব কোণ্ হইতে টাইগ্রীশ ৫ মাইল উত্তর পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া মাডুক্

গ্রামকে বাঁয়ে রাখিয়া দু'মাইল দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া মাকাসিস্ গ্রাম ঘুরিয়া পুনরায় উত্তর পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া বরাবর ৮ মাইল গিয়া "নুখৈলাট" গ্রামে পৌঁছিয়াছে।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে "কুতেল-আমারা" জয় করিবার সময় ব্রিটিশরা ঐ "নুখৈলাট" গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া উহার উত্তরস্থিত সুয়াড়া-হ্রদের ও তার উত্তরে আটাবা হ্রদের মাঝখান দিয়া ঘুরিয়া গিয়া "কুতেল-আমারা" আক্রমণ করেন।

নুখৈলাট আর মাকাসিস গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম "এসসিন্"। ঐ নামের এক বালির পাহাড় টাইগ্রীশের দক্ষিণেও অবস্থিত। ঐ বালির পাহাড়ের তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে "সিন-অব্টার" গ্রাম। টাইগ্রীশের উত্তরে ঐ আটাবা হ্রদ হইতে সুয়াড়া হ্রদ পর্য্যন্ত ও টাইগ্রীশের দক্ষিণ পারে "সিন-অব্টার" গ্রাম পর্য্যন্ত এক দক্ষিণ পূর্ব্বমুখী সোজা লাইন টানিলে উহা প্রায় লম্বে ১০ মাইল হইবে। নুরউদ্দিন ঐ ১০ মাইলের ট্রেঞ্চ কাটাইলেন।

৩। ঐ ট্রেঞ্চ লাইনকে "সিন-অব্‌টার" হইতে তিন মাইল আরও দক্ষিণে আনিয়া "ত্বজৈলা" নামক এক পুরাতন দুর্গকে ঘুরিয়া, পরে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী টানিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত শাটেল-হাই খালের "আটাব" গ্রামে লইয়া শেষ করা হইল। আর "ট্রেঞ্চ কাটান হইল" বলিলেই বুঝিতে হইবে ঐ সমস্ত লাইনে তুরস্ক ফৌজ বন্দুক কামান ইত্যাদি লইয়া বসিয়া গেল।

৪। নুখৈলাট গ্রাম টাইগ্রীশের উত্তর দিকে, বাম ধারে। তাহারই আড় পারে এক উচ্চ শ্রেণী বালির পাহাড়, নাম "চাহেলা"। চাহেলা হইতে ২ মাইল দূরে "বেট-ইশা" গ্রাম। ঐ গ্রামের সহিত, "চাহেলার" যোগ করিয়া ত্রিকোণ ভাবে ট্রেঞ্চ কাটা হইল।

৫। নুখৈলাটের ছয় মাইল পূর্ব্বে ও নদীর উত্তর ধারে সুনাইয়াট্ গ্রাম। সেখান হইতে ফালাহিয়া গ্রাম স্থলপথে তিন মাইল পূর্ব্বে। ঐখান হইতে হান্না গ্রাম ৫ মাইল পূর্ব্বে। এই শেষোক্ত তিন গ্রামকে ১০।১২ মাইল ট্রেঞ্চ কাটিয়া যোগ করা হইল। "কুতেল-আমারার উত্তর-পূর্ব্ব কোণ

হইতে হান্না গ্রাম প্রায় ২৫।৩০ মাইল দূরে। ঐ পর্য্যন্তই তুরস্কেরা ট্রেঞ্চ কাটিয়া কঠিন হইয়া বসিল।

১৭। ঐ হান্না গ্রামে টাইগ্রীশ খুব বাঁকিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখী হইয়া ধাবিত হইয়াছে। পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখী হইবার পর, উত্তর হইতে "ওয়াড়ি" নামক এক নদী টাইগ্রীশের সহিত যোগ হইয়াছে। ব্রিটিশেরা বসরা হইতে নদীর উজা-নের পথে পর পর "আমারা," "আলি-ঘারবি," "সেখ-সাদ" ছাড়াইয়া "ওয়াড়ি" সঙ্গমে আসিয়া তথায় ফৌজদের কেন্দ্র স্থাপনা করিলেন। তারপর উঁহারা টাউনশেণ্ডকে ও তাঁহার দলকে তুরস্কের ভীষণ কবল বা গণ্ডির ভিতর হইতে উদ্ধার করিতে কি প্রকার উদ্যম, কৌশল, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিয়াছিলেন তাহা ইহার পরের উচ্ছ্বাসেই বর্ণিত হইয়াছে।

ষট্‌চত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। ব্রিটিশদের তরফে টাউনশেণ্ডকে উদ্ধার করিতে যাইবার মানে—জর্ম্মান-সাহায্যে পুনর্গঠিত ও বলীয়ান্ তুরস্কের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিতে যাওয়া। ইহার জন্য ভাল রূপ প্রস্তুত না হইয়া ব্রিটিশদের পক্ষে যাওয়া, বাতুলতা! বিলাত হইতে, ফ্রান্স হইতে, ভারতবর্ষ হইতে তাজা সৈন্য কামান গোলা-গুলি, রসদ, রণপোত ইত্যাদি ইরাকখণ্ডে সময় মত না পৌঁছিয়া যাইলে জেনেরাল নিক্সন কি করিয়া তুরস্কের সহিত যুঝিবার জন্য বাহির হইতে পারেন? ঐ সব গুছাইয়া লইতে সময় লাগিল।

২। ব্রিটিশ ফৌজ রণপোত-সমূহসহ ৯ই জানুয়ারীর (১৯১৬) মধ্যে "ওয়াডি" সঙ্গমে আড্ডা গাড়িয়া ১৩।১৪ জানুয়ারীর রাত্রে তুরস্কদের সহিত খুব যুদ্ধ করিল; এবং শত্রুকে হঠাইয়া দিয়া ২১শে জানুয়ারী প্রাতে হান্না গ্রাম আক্রমণ করিল; কিন্তু হান্না গ্রামে শত্রুর ট্রেঞ্চ ভেদ করিতে পারিল না। ঐ গ্রামের উত্তরেই "সুয়াইকিয়া" দীক; উহার উত্তর দিয়া আর পথ না পাওয়াতে ব্রিটিশ ফৌজকে

ওয়াডি ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিয়া অন্য নূতন পথ আবিষ্কার করিতে হয়। সেই সবের আয়োজন করিয়া কুতেল-আমারার দিকে অগ্রসর হইতে ফেব্রুয়ারী মাস কাটিয়া যায়।

৩। "কুতেল-আমারা" প্রথম জয় করিতে যাইবার সময় ব্রিটিশরা টাইগ্রীশের বাম ধারের ভাল পথ পাইয়াছিলেন। এখন হান্না গ্রামের রাস্তায় বাধা পাইয়া উঁহাদিগকে অগত্যা টাইগ্রীশের দক্ষিণধার দিয়া যাইবার কঠিন পথই লইতে হয়। ঐ কঠিন পথ ধরিয়া ব্রিটিশ ফৌজ সুনাইয়াট গ্রামের আড় পারের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। তথা হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে "সিলোয়াম" হ্রদের কাছে ব্রিটিশ ফৌজদের জমায়েত ৭ই মার্চের রাত্রে দুই জেনারালের তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়।

৪। নদীর দক্ষিণ পারের পথে চলিতে চলিতে উত্তর ধারের প্রত্যেক গ্রামের আড়পারে ট্রেঞ্চ কাটিয়া কাটিয়া ব্রিটিশ-ফৌজ বসাইয়া আসিতে হইল। এইরূপ ভাবে সতর্ক হইয়া যাত্রা করা বিশেষ প্রয়োজন—যেখানে প্রত্যেক আরব প্রজাই শত্রু। যাহাতে আরব-দস্যু বা তুরস্ক-ফৌজ গুপ্তভাবে নদী পার হইয়া ব্রিটিশদের আক্রমণ করিতে না পারে সেদিক বাঁচাইয়া যাইতে হইল। এই সব কারণে ব্রিটিশদের পক্ষে অগ্রসর হইতে সময় লাগিল।

৫। ঐ দুই জেনেরাল (কেমবল আর কেরী) ব্রিটিশ ফৌজকে সিলোয়াম হ্রদের নিকট হইতে সমস্ত রাত দ্রুত হাঁটাইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই “দুজৈলা” দুর্গের সম্মুখে ৮ই মার্চ ১০টা বেলার সময় উপস্থিত হয়েন। ঐখানেও তুরস্কদের সহিত ১০ই মার্চ অবধি খুব যুদ্ধ হয় কিন্তু কোন প্রকারে শত্রুর ট্রেঞ্চ ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিতে ব্রিটিশ ফৌজ পারে নাই।

৬। ওখান হইতে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফেরত আসিয়া কেম্বল আর কেরী সসৈন্যে পূর্ব্বোক্ত বেট-ইশা গ্রামের দক্ষিণে তুরস্কেরা যে ট্রেঞ্চ কাটাইয়া রাখিয়াছিল তাহার উপর ১৭ই ১৮ এপ্রিল খুব জোরে গিয়া পড়েন এবং খুব যুদ্ধ করিয়া শত্রুর ট্রেঞ্চ ভাঙ্গিয়া নিজেদের চার দল রেজিমেণ্টকে ঠেলিয়া সুনাইয়াট গ্রামের আড় পারের নিকটে ১৮ই এপ্রেল সন্ধ্যার মধ্যে লইয়া যান।

৭। তখন উঁহারা দেখেন যে সম্মুখে টাইগ্রীশ নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল হুহু করিয়া ভিতরের জমীতে ঢুকিয়া সমস্তই কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিতেছে—আর অল্প সময়ের মধ্যে ভারি ভারি কামানের গাড়ী ঐ কাদায় বসিয়া যাইবে। এই প্রধান আশঙ্কা হইল—আর দ্বিতীয় আশঙ্কা এই হইল যে—উঁহাদের বাম দিকে তুরস্ক-ফৌজ খুব মজবুত ট্রেঞ্চ

(পূর্ব্বোক্ত "চাহেলা" বালির-পাহাড়ের তলায়)। কাটিয়া কামান সাজাইয়া যেন ঠিক ব্রিটিশ ফৌজকে তোপে উড়াইয়া দিবার জন্যই বসিয়া আছে। এই দুই কারণে ব্রিটিশ ফৌজ ঐ ভয়াবহ স্থান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল।

৮। ইহাতেও ব্রিটিশরা ভগ্নোদ্যম না হইয়া ২০।২২ এপ্রিলের মধ্যে উক্ত বেট-ইশা গ্রামকে ৫ মাইল বাঁয়ে রাখিয়া ঠিক সুনাইয়াট গ্রামের আড় পারে সসৈন্যে উপস্থিত হন এবং উঁহাদের আয়োজন অনুসারে অনেক গুলা রণপোতে ও জাহাজে আরও সৈন্য সামন্ত কামান ইত্যাদি আসিয়া পড়ে। উঁহারা ভীষণ ভাবে সুনাইয়াট গ্রাম আক্রমণ করেন। ২১।২২ তারিখে দু'পক্ষে খুবই যুদ্ধ হয়। দুই পক্ষের অনেক লোক হত ও আহত হয়, বিশেষতঃ তুরস্কদের মধ্যে ব্রিটিশদের অপেক্ষা আহতদের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

৯। খুব ভোর হইতে সাড়ে ১১টা বেলা অবধি যুদ্ধের পর হঠাৎ তুরস্কেরা দু'খানি "রেড্ ক্রেসেন্ট" ফ্ল্যাগ উঠাইল। (ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে অর্দ্ধ চন্দ্রের ছাপ মারা নিষাণ এক পক্ষ উঠাইলেই বুঝিতে হইবে যে সে পক্ষ আহতদের যুদ্ধস্থান হইতে সরাইয়া ফেলিবার নিমিত্ত ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করিতেছে। আর

অপর পক্ষ সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বাধ্য)। যুদ্ধ তখন থামিয়া গেল।

১০। তৎক্ষণাৎ দু'পক্ষের ডাক্তারদের দল আসিয়া নিজ নিজ দলের হত ও আহতদের সরাইয়া ফেলিতে লাগিল। এই করিয়া সমস্ত বেলা কাটিয়া গেল—সেদিন আর যুদ্ধহইল না।

১১। জেনেরাল নিক্সন ছুটীতে ছিলেন বলিয়া টাউনশেণ্ডকে উদ্ধার করিবার ভার পড়ে তখনকার সর্ব্বোচ্চ কমাণ্ডার জেনেরাল লেকের উপর। তিনি ঐ ২২শে এপ্রিলের যুদ্ধের ব্যাপার দেখিয়া, হত আর আহতদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া, এবং জীবিত সৈন্যদের দুরবস্থার কথা জানিয়া—সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরাল গরিঞ্জের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারতে ও বিলাতে এই লম্বা তার পাঠান :—"আমরা এখনও টাইগ্রীশের ডান ধারের পথে। সে স্থান "কুতেল আমারা" হইতে ১২ মাইল দূরে—বাম ধারের পথ ধরিলে ১৪ মাইল দূরে। ৫ই এপ্রিল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের সৈন্যেরা একপ্রকার অনাহারে অনিদ্রায়—অবিশ্রান্ত ভাবে নানা-স্থানেযুদ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছে। ইহারা যথার্থই নাকাল ও হায়রান হইয়া পড়িয়াছে। নদীর জল এত বাড়িয়াছে যে দুই দিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলে দেশ ডুবাইয়া ফেলিতেছে। সৈন্যেরা শত্রুর সঙ্গে লড়িয়াছে আর তার অপেক্ষা ভীষণ শত্রু এই জল প্রপাত—

তাহারও সঙ্গে লড়িয়াছে। উহাদের দাঁড়াইয়া বন্দুক ধরিবার আর শক্তি নাই। সৈন্যদের ভিতর এই কয় দিনে ৯৭০০ লোক আহত হইয়া পড়িয়াছে। উহাতে আমাদের চার আনা রকমের সৈন্য ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যা সৈন্য হাতে আছে, তিন চার দিন জিরান না দিলে উহারা আর পারিয়া উঠিতেছেনা—উহাদের উপরকার জেনেরালেরাও ছুটী প্রার্থনা করেন। গোলা-গুলি বন্দুক কামান ইত্যাদি ঠিক ঠাক করিয়া লইতেও সময় লাগে—পুনরায় যুদ্ধের জন্য বাহির হইবার পূর্ব্বে।

"ওদিকে টাউনশেণ্ড জানাইয়াছেন যে তাঁহার অধীনে সৈন্যরা অনাহারে মরিতেছে। আর উনি নিজেও প্রায় অনাহার করিয়াই আছেন। তাঁহার সেনাদলের সমস্ত রসদ ফুরাইয়া যাওয়ায় উহারা ঘোড়ার মাংস ইত্যাদি খাইয়া কোন রূপে চালাইয়া ছিল। আমরা এখান হইতে এয়ারোপ্লেনে কিছু কিছু রসদ উঁহাকে যোগাইয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহাও আর সম্প্রতি পাঠাইবার সুবিধা হয় নাই। আমরা যদি ২৬শে এপ্রিলের ভিতর উঁহাকে উদ্ধার করিবার বন্দোবস্তের পাকা খবর না দিতে পারি তাহা হইলে উঁনি ঐদিন হইতে তুরস্কদের সহিত সসৈন্যে আত্ম-সমর্পণের কথা বার্ত্তা চালাইবেন, এবং ২৯শে এপ্রিল সসৈন্যে আত্ম-সমর্পণ করিবেন বলিয়াছেন।

এই অল্প সময়ের ভিতর আমাদের দ্বারা উঁহার উদ্ধার হওয়া একেবারে সম্ভবপর নহে।"

১২। ঐ তারের উত্তর খোদ্ লর্ড কিচেনার বিলাত হইতে জেনেরাল লেকের কাছে পাঠান। তখন কিচেনার সাহেব বিলাতের প্রধান রণ-মন্ত্রী। সেই উত্তর ২৫ বা ২৬ এপ্রিল ১২টা রাত্রে লেক সাহেবের হস্তে পৌঁছে। তাহার মর্ম্ম এইঃ—"তোমরা কুতেল-আমারায় টাউনশেণ্ডকে উদ্ধারের জন্য যা উদ্যম করিয়াছ ইহার জন্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতেছেন। তোমাদের হাতে যে সব সৈন্য এখন আছে তা'দের দ্বারা আর কাজ লওয়া অনুচিত হইবে। কিন্তু কোন গতিকে আর একমাসের খাদ্য কি কুতেল-আমারায় পাঠাইতে পার না? যদি তাহা অসম্ভব বিবেচনা কর ত টাউনশেণ্ডের সসৈন্যে আত্ম-সমর্পণের কথা বার্ত্তা তুরস্কদের সঙ্গে চালাইতে পার"।

১৩। কিচেনার সাহেবের নিকট হইতে ঐ তার পাইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল লেক সাহেবের অনুরোধে লেফটেনাণ্ট ফারমান, "জুলনার" নামক ছোট রণ-পোতে, ২৭০ টন্ রসদ কুতেল-আমারায় পৌঁছাইয়া দিবার ভার লয়েন। উনি রণ-পোতের কমাণ্ডার বা কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, উঁহার নীচে কমাণ্ডার

হইলেন কাউলি সাহেব এবং ইন্‌জিনিয়ার হইলেন রীড্ সাহেব। ১২ জন গোরাও নাবিক হইয়া উঁহাদের সঙ্গে যায়।

১৪। উঁহারা খুব গুপ্ত ভাবে ঐ রসদ লইয়া ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টার অন্ধকারে ফালাহিয়া গ্রাম হইতে ঐ রণপোতে যাত্রা করেন। আকাশে সামান্য মেঘ ছিল এবং সে রাত্রে চাঁদ উঠিবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা। টাইগ্রীশের প্রখর স্রোতের প্রতিকূলে "জুলনারের" পক্ষে ঘণ্টায় ৬ মাইলের অধিক জোরে যাওয়া অসম্ভব। শত্রু টের পাইয়া, সুনাইয়াট গ্রামের কাছ-বরাবর "জুলনারের" উপর গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ বিপদ পার হইয়া যখন "জুলনার" সিন্ ব্যাঙ্কের সামনা-সামনি তখন উহার উপর বড় বড় কামানের গোলা পড়িতে লাগিল। সে বিপদ ও কাটাইয়া যখন "জুলনার" মাকাসিসের নিকট তখন এক বোমা আসিয়া জাহাজের পুলে লাগিল। উহাতে ফারমান্ সাহেব মারা গেলেন, কাউলি সাহেব এবং একটী নাবিকও আহত হইলেন। তা সত্বেও "জুলনার" চলিল—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উহার তলা—জল মধ্যস্থিত এক মোটা লোহার সিকলের ধাক্কা খাইয়া ঘোর পাক দিয়া নদীর ডান কিনারায়, ঠিক তুরস্কদের মাকাসিস দুর্গের নীচে আসিয়া, মাটিতে লাগিয়া গেল। এই খানে তুরস্কেরা উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল।

১৫। টাউনশেণ্ডকে উদ্ধার করিবার ব্রিটিশদের পক্ষে ঐ শেষ চেষ্টা। ২৬শে এপ্রিল ভোর রাত তিনটায় লেক সাহেব উঁহাকে এই মর্ম্মে তার পাঠান:—"তুরস্কদের সঙ্গে আত্ম-সমর্পণের কথাবার্ত্তা চালাইতে পার, অনেক চেষ্টা করিয়াও তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।"

১৬। ঐ সময় কার কল্যাণের তিন খানি চিঠি পর পর নিম্নে দেওয়া হইল:—

কুতেল-আমারা,

২৬।৪।১৬।

মা

প্রায় ৫ মাস বাদে তোমায় চিঠি লিখিতে বসেছি। এই ৫ মাস কতবার লিখিবো লিখিবো মনে করেছি কিন্তু কবে চিঠি ডাকে দিতে পারবো তার কিছুই ঠিক না থাকাতে, ইচ্ছাটা কাজে পরিণত করি নাই। কতবারই শুনেছি ও আশাও হয়েছে যে আর ৩।৪ দিনের মধ্যে রিলিফ আসবে। এই ৫ মাসে সে আশা পূর্ণ হয়েও হল না। কাল থেকে লোকের মনের ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে রিলিফ আসতে পারবে না, আমাদের হার মানতেই হবে। প্রায় ১ মাস সৈন্যরা অর্দ্ধেক র‍্যাসান খেয়ে আসছে, প্রায় ১৫ দিন থেকে র‍্যাসান কমে কমে

সিকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এত কমিয়েও আর তিন দিনেরমাত্র রসদ আছে।

২।৩ মাস আধপেটা ও তারপর সিকিপেটা খেয়ে সব সৈন্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মত দেখতে হয়েছে। হাঁসপাতালে মৃত্যু সংখ্যা খুবই বেড়েছে। গত ১৫ দিন থেকে লোকে না খেতে পেয়ে মরচে। ওষুধে আর কি হবে ? খাবার কিছুই নেই। না খেতে পেয়ে দুর্ব্বল হয়ে লোক হাঁসপাতালে আসছে। তাকে কি করে খাবার অভাবে ভাল করা যায়! তা ছাড়া ওষুধও সব ফুরিয়ে গেছে।

আমরা অর্থাৎ অফিসারেরা সবাই, খুবই রোগা হয়ে গেছি। তবু ২৪ ঘণ্টা খিদে লেগে থাকা সত্বেও অফিসারদের মধ্যে না খেতে পেয়ে রোগগ্রস্ত কেহ হয় নি। আমার তত কষ্ট হয় নি। র‍্যাসান চার আউন্স আটার রুটি ও ১ পাউণ্ড ঘোড়ার মাংস ছাড়া বাড়তি জিনিস বাজার থেকে কিনে খেয়েছি। তবু বেশ রোগা হয়ে গিয়েছি। যাহোক খাবার কষ্ট ইত্যাদি দেখা না হলে বর্ণনা করবো না, শরীর আমার ভালই আছে, ভুঁড়ি কমে গিয়েছে।

বন্দী হলে তোমাদের আর কোনও ভাবনার কারণ থাকবে না। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকব। কাণের পাশ

দিয়ে ২৪ ঘণ্টা গোলা গুলি চলবে না, যুদ্ধ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। তারপর ডাক্তারেরা সে রকম বন্দী নয়। যেখানেই রাখুক আমরা ঘুরে বেড়াতে পারবো, তুর্কিরা তাছাড়া অফিসার-দের খাতির করবে। এমন কি ডাক্তারদের শীঘ্র ছেড়েও দিতে পারে। একবার খবর পেলে যে আমরা বন্দী হয়েছি, তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে যে নিরাপদে আছি; কেবল চিঠি পেতে দেরী হবে। শুনেছি বন্দীরা কেবল মাসে এক স্কেপ চিঠি লিখতে পারে। তা আর কি করবে বল, বেঁধে মারে সয় ভাল। তবু এই গত ৫ মাসে, ৪ বার তোমাদের তারে, 'ওয়্যারলেসের' সাহায্যে, খবর দিয়েছি। শেষ টেলিগ্রামে "চীয়ার অপ" (আহ্লাদকর) লিখেছিলাম—তাই বুঝি তুমি চিঠি পাবে আশা করে ছিলে।

তোমার টেলিগ্রাম ২১শে এপ্রিল পেয়েছিলাম। জবাব দিতে গেলাম তা নিলে না। প্রাইভেট টেলিগ্রাম যাবার হুকুম নেই। ফের প্রাইভেট নিলেই তোমাদের খবর দিব। তোমরা কিন্তু খবর দিলে না যে তোমরা কেমন আছ। জেন যে হাজার শত্রু ঘেরাও করিলেও ওয়্যারলেসের দ্বারা খবর আসছে, যাচ্ছে। তোমাদের খবর পেলে মনে একটু আরাম পেতাম। তা তোমরা দিলে না।

৫ই ডিসেম্বর সীজ (ঘেরাও)' আরম্ভ হয়েছে আর আজ ২৬শে এপ্রিল। যাহোক এও সান্ত্বনা যে আর ৩।৪ দিনে ইস্‌পার কি ওস্‌পার। ওপারেই রয়ে গেলাম। শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে নিজের দলে গিয়ে মেশবার আশা আর নেই। তবে যদি ডাক্তার বলে ছেড়ে দেয়—এই আশা। এক এক বার মনে হয়—যখন গুলি লেগেছিল ও আহত হয়ে বসরায় যাবার সুযোগ ছিল, তখন কেন মরতে যাইনি। যা হয় তাই ভাল বলে মেনে নিতে হয়। হয় তো সুস্থ হয়ে রিলিফ ফোর্সের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিতে ফের গুলি লাগতো, বলা কি যায়? আমাদের ছাড়াবার জন্য কি কম চেষ্টা করা হয়েছে—কত হাজার লোক মারা গেছে, পরে জানতে পারবে।

কোনও চিন্তা করিওনা। বন্দী হলে আর যুদ্ধ করতে হবে না—এটা মনে রেখো। এচিঠি কবে বা কি করে তোমাদের কাছে যাবে তা জানিনা। লিখে রাখচি। কোন সুযোগ পেলেই পাঠাব। যদি মরণাপন্ন রোগীকে বন্দী না করে—নীচে "আমারার" দিকে পাঠিয়ে দেয়—তা হলে সেই সঙ্গে এ চিঠিও যেতে পারে।

তোমার—

কল্যাণ।

(ইংরাজিতে পোষ্টকার্ড)

29-4-16

Ma

On account of hunger, our General was obliged to surrender to-day. Turkish flag has been put up and the British flag taken down. Turkish troops entered the town this afternoon.

Now for goodness sake dont die of fright. Doctors are not prisoners of War. They have to accompany the troops when the sick and wounded are taken prisoners. Later on they can demand to go back to their own country; only the enemy may keep them for the treatment of the sick. So you may be sure I shall go back after a time. You ought to be thankful that I shall not be exposed to fire any more. I shall be quite safe and away from any fighting. The only thing that worries me is that perhaps they might give us full pay only for 2 months then leave pay as in case of officers taken personers, but they cant do so because we are not prisoners.

So please cheer up. I shall let you know afterwards how often you would hear from me and how to send letters to me.

Your

Kalyan.

(ঐ পোষ্টকার্ডের বাংলায় অনুবাদ)

২৯-৪-১৬

মা,

ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের জেনেরাল আজ আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তুরস্ক-পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে আর ব্রিটিশ-পতাকা নামাইয়া লেওয়া হইয়াছে। আজ দু'প্রহরের পর তুরস্ক-ফৌজ সহরে ঢুকিয়াছে।

এখন এই খবর শুনে যেন ভয়ে মারা যাইও না। ডাক্তারেরা যুদ্ধের বন্দী নহে। পীড়িত আর আহত সৈনিকদের বন্দী করিলে,তখন ডাক্তারেরা তাহাদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য। পরে উহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার দাবী করিতে পারিবে। শত্রু পক্ষ, রোগীদের শুশ্রূষার জন্যই খালি ডাক্তারদের ধরিয়া রাখিতে পারে। কিছু সময় গত হইলেই আমি ফিরিয়া যাইব, ঠিক জানিও। এই ধন্যবাদ দাও যে আমি

গোলা গুলির হাত হইতে এড়াইলাম। সকল লড়াই হইতে দূরে থাকিয়া আমি বেশ নিরাপদেই থাকিব। একটা বিষয়ে ভাবনা হচ্চে—হয়ত বা উঁহারা আমাদিগকে মাত্র দু'মাসের পূরা বেতন দিবেন আর তারপর অন্যান্য বন্দী অফিসারদের যেরূপ ভাবে ছুটীর বেতন দিয়া থাকেন সেইরূপ ভাবে আমাদিগকেও দিবেন। কিন্তু তা উঁহারা করিতে পারেন না, কারণ আমরা বন্দী নহি।

তাই ভাবনা দূর করে সুখী হও। পরে তোমাকে জানাব যে কতবার আমার কাছ থেকে তুমি চিঠি পাবে আর কি করে তুমি আমাকে চিঠি পাঠাতে পারবে।

তোমার কল্যাণ
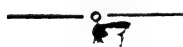
১-৫-১৬

মা,

তোমাকে ২৬শে এপ্রিলে চিঠি, আর ২৯শে এপ্রিলে পোস্ট কার্ড লিখে রেখেছি। তারপর ২৯শে এপ্রিল কি হোলো শুন। আমাদের জেনেরাল টাউনশেণ্ড টারকির কমাণ্ডার খালিলবের পায়ের উপর নিজের তরবারি রাখিয়া আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এর আগেই ব্রিটিশ পতাকা নামাইয়া কেল্লার উপর টারকির

পতাকা চড়ান হইয়াছিল। দুই কমাণ্ডারে সেকহ্যাণ্ড (করমর্দ্দন) হইল। হালিল খুব ভদ্র ব্যবহার করিলেন, টাউনশেণ্ডকে তাঁর নিজের তরবারি তাঁর হাতে ফেরত দিয়া আদর করিয়া কোথায় ভাল জায়গায় লইয়া গেলেন। হালিল আমাদের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করিলেন তা আর কি বলিব মা। কত যে ভাল ভাল টাটকা খাবার ও মিষ্টজল যোগাড় করিয়া রাখিয়া ছিলেন—সে সব আমাদের খাইতে দিলেন। সেই সব খাইয়া আমাদের আজ নূতন জীবন হইল।

হালিল সকলের উপর এই হুকুম দিয়া গেলেন ঃ—"তোমরা তিন দিন আমোদ কর—পেট ভরিয়া খাও এবং যত চিঠি লিখিতে ইচ্ছা লিখিয়া লও। তিন দিন পরে অন্যস্থানে যাইতে হইবে—এবং তারপর সপ্তাহে একবার চিঠি লিখিতে ছুটী পাইবে কিন্তু মাত্র চার লাইন করিয়া লিখিতে পাইবে।"

আমাদের যে সকল রসদ ছিল তাহা দু'মাসেই প্রায় সব শেষ হইয়া যায়। অবশেষে জল অবধি ফুরাইয়া গেল। কেল্লার উঠানে ৪০টা পাতকুয়ো খুঁড়িয়া জল পাওয়া যাইতে লাগিল। জল ঘোলা, খারাপ। শেষে, যত খচ্চর ছিল তাহাদের কাটিয়া সেই মাংস এক পাউণ্ড করিয়া সকলকে প্রত্যহ দেওয়া হইতে লাগিল। অনাহারে অনেক লোক মরিতে লাগিল।

কেল্লা খুব বড় হইলেও অতিশয় পুরান, জীর্ণ। টারকির গোলা আসারও কোনও দিন কামাই ছিল না। তাহাতে অনেক মরিয়াছে, আর আহত হইয়াছে। আমাদের অফিসারদের মধ্যে দুই চার জন না খেতে পাইয়া মরিয়াছে।

নিদারুণ গরম আরম্ভ হইল। এই সব দেখে টাউনশেণ্ড আত্ম-সমর্পণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

আমি আর বন্ধু পুরী বেশ আছি। আমাদের গায়ে জোরও আছে। জলের জন্য সময় সময় কষ্ট বোধ হইত, আমরা জল ফিলটার করিয়া খাইতাম। ঘেরাও হইয়া থাকিবার ক্লেশের কথা বর্ণনা হয় না। আমরা যখন টেসিফন থেকে হেরে আসিয়া এই খানে ঢুকি, তখন আমাদের লোক সংখ্যা ১০।১১ হাজার; আর এখন তার অর্দ্ধেকেরও কম। কি ভয়ানক কাণ্ড! এখনও কত শত রোগী আছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বাঁচিবেনা বোধ হয়। কেল্লার ভিতরে এবার টাইগ্রীসের জল এত বেশী ঢুকিয়াছে যে সব কাদা করিয়া দিয়াছে।

আমরা গত ফেব্রুয়ারী মাসে একটা মেথরকে টাকা দিয়া টেলিগ্রাম করাইয়া ছিলাম; প্রথমবার পুরীর নামে, দ্বিতীয় বার আমার নামে. বোধ হয় তাহা পাইয়াছ। সে মেথরকে নিশ্চয়

টারকিরা ধরিয়াছে, আর তাকে দেখিতে পাইলাম না। আছে কি নেই তাহা জানিতে পারি নাই। আমার জন্য ভেবে ভেবে তুমি প্রাণত্যাগ করিওনা। আমি ফিরে গিয়া তোমায় দেখিতে চাই। আমি বেশ ভাল আছি। আরও চারখানা বড় চিঠি লিখিতে হবে। আজ বিদায়—

তোমার কল্যাণ

সপ্তচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। তিন দিন গত হইলে, তুরস্কের জেনেরাল হালিলবের হুকুম অনুসারে ভারতবর্ষীয় আহত ও পীড়িত বন্দী—হিন্দু ও মুসলমান—সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া কল্যাণকে, ডাক্তার পুরীকে আরও অন্যান্য ৯জন ডাক্তারকে কুতেল-আমারা ছাড়িয়া প্রথমে তাহার নিকটবর্ত্তী "সামরাওন" নামক এক বড় মাঠে ক্যাম্পে গিয়া ২০শে মে পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। এই কারণে, যে তথায় ঐ সৈন্যেরা ভয়ানক পেটের অসুখে ভোগে। এত ভীষণ ভাবে ঐ রোগ সৈন্যগণকে আক্রমণ করে যে উহাদের লইয়া ডাক্তার দিগকে দিনরাত পরিশ্রম করিতে হয়। অনেকে সেই রোগে মারা পড়ে।

২। যাহারা সুস্থ হইয়া উঠিল তাহাদিগকে স্থলপথে হাঁটাইয়া প্রথমে বাগ্‌দাদে এবং সেখান হইতে আরও ৩৭৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে "রাসেল-আইন" নামক তুরস্কের 'উচ্চ-ইরাক্' প্রদেশের একটী সহরে পাঠান হয়। ঐ সহরের বাহিরে অনেক পতিত জমা। ঐ পতিত জমার উপরেই বন্দী সৈনিকদের ক্যাম্প পড়ে। ১৫ দিনের মাথায় বন্দী সেনা-দল

তথায় তুরস্ক-জেনেরালদের সঙ্গে গিয়া পৌঁছে। কল্যাণ, ডাক্তার পুরী ও অন্যান্য ডাক্তারেরা "সামরাওন" ক্যাম্প হইতে প্রথমে জলপথে বাগদাদে এবং তথায় কিছু দিন থাকিয়া পরে রেল পথে ঐ "রাসেল-আইনে" একই সময়ে গিয়া পৌঁছে।

৩। বন্দী অবস্থাতে সৈনিকদের উপর কোনও জুলুম অত্যাচার বা কোন রকমের পীড়ন হয় নাই। উহারা স্বাধীন ভাবেই থাকিত। আহারাদি সময় মত করিতে পারিত। কেবল ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল—

ভারতবর্ষীয় বন্দী-ডাক্তারদের সকালে ও বৈকালে ক্যাম্প-হাঁসপাতালে রোগীদের দেখিতে হইত, তারপর তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে নিজের মালিক।

৪। কল্যাণ "রাসেল-আইনে" পৌঁছিয়া যাইবার পর তথা হইতে ১৫ই জুন (১৯১৬) তার মাকে ইংরাজিতে চার লাইনের এক পোষ্টকার্ড লিখে; তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"ইহারা খুব ভাল ভাল টাট্‌কা খাবার দেয়। দুধ, মাখম, রুটি মাছ খুব খাচ্ছি। মুখ লাল হয়েছে, গায়েও বেশ জোর পেয়েছি। পুরী আর আমি এক সঙ্গেই আছি। তোমার চিঠি পাইলেই মনের জোর পাইব। আমরা বেশ ভাল আছি।"

৫। ঐরূপ চার লাইনের চিঠি কল্যাণের নিকট হইতে প্রত্যেক মাসেই বিনোদের কাছে রীতিমত আসিত। কিন্তু এখানকার চিঠি তার কাছে ঠিক পৌঁছাইত না। সেই জন্য সে অনেক ভাবিত থাকিত এবং তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিঠিতে জানাইত। মধ্যে মধ্যে এখানকার চিঠি পাইলে, পারিবারিক সংবাদ সমস্তই পাইত, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানকার চিঠিতে সুখের খবর কিছুই থাকিত না—দুঃখের খবরই থাকিত।

৬। মে মাসের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিনোদিনার শরীর কল্যাণের ভাবনায় আর জ্বরে জ্বরে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর আর এক শোক তাহাকে নিতান্ত ব্যথিত করায় তার রোগ আরও বাড়িয়া উঠিল—শরীর একেবারে রক্তশূন্য, বল শূন্য হইয়া পড়িল। জুন মাসে হঠাৎ কুচবেহার হইতে তারে খবর পৌঁছে যে তথায়, কল্যাণের শ্বশুরালয়ে, তাহার মেয়েটি পেটের অসুখে মারা পড়িয়াছে। সেই শোকের খবর পাইয়া বিনোদ যে শয্যায় শুইল, আর উঠিল না।

৭। কল্যাণ তাহার কন্যা বিয়োগের এবং মাতার কঠিন পীড়ার কথা যথা সময়েই জানিতে পায় এবং তারপর বিনোদকে অনেক আশ্বাস দিয়া প্রতি মাসেই চিঠি পাঠাইতে থাকে। সে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চার লাইনের চিঠি গুলির মর্ম্ম এই :—“মা তুমি

শরীরের যত্ন নাও, ভাল হও। আমি যে তোমাকে বড্ড দেখতে চাই—আমি শীঘ্র দেশে ফিরে আস্‌চি। আমি ফিরে আসবার আগে তুমি পালিও না। আমার প্রথম মেয়ে মারা গেছে ত কি হয়েছে? তোমারও ত প্রথম মেয়ে মারা যায়। আমি দেশে ফিরে এলে আমার ঢের ছেলে পুলে হবে তার জন্যে ভেবো না। আমি তোমার কথা শুনবার জন্যে, তোমার হাতের চিঠি পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি। তুমি যদি নিজে কলম ধরে লিখতে না পার ত বিবিকে তোমার মু-জবানী লিখতে বলিও। তোমার কথার চিঠি পাইলে আমার বড় আহ্লাদ হয়। আমি বিলাত হইতে কুশলের চিঠিও পাইতেছি। তুমি উতলা হইওনা। এখানে খুবই ভাল আছি কিন্তু তোমার জন্য সদাই ভাবিত।"

৮। ঐ চিঠি গুলি যথা সময়েই বিনোদিনীর হস্তে পৌঁছায়। কল্যাণের ১৪ই সেপ্টেম্বরে লেখা চিঠি পর্য্যন্ত ২৮শে অক্টোবর এখানে পৌঁছিয়া যায়। সে চিঠি নিজে পড়িবার শক্তি বিনোদিনীর ছিল না। তার ছোটো জামাই তাহাকে পড়িয়া শুনায়। তার শরীর যে আর টেকেনা ইহা সকলেই বুঝিয়াছিল; সে নিজেও তাহা জানিত।

ঐ ২৮শে অক্টোবর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উপলক্ষে বিনোদিনী নিজে

শয্যাগত হইয়াও কন্যাদের সাহায্যে তার আপন ও মাসতুত ভাইদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে ভুলে নাই।

৯। ২৯শে অক্টোবর বিনোদিনী যেন জানিতে পারিয়াছিল যে ঐদিনে তাহার প্রাণত্যাগ হইবে। তার দ্বিতীয় পুত্র কমলের দ্বিতীয় সন্তান সেই দিনে মাত্র ১২ দিনের শিশু। বিনোদ প্রাতঃকাল হইতেই সেই শিশু পৌত্রের মুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলে তাহাকে তার মামার বাড়ী হইতে আনাইয়া দেখান হয়।

১০। অনেক আত্মীয় স্বজনও সেদিন বিনোদিনীকে দেখিতে গিয়াছিলেন—তাঁহাদের সকলের নিকট সে বিদায় গ্রহণ করে। সে তার নিজের প্রাণত্যাগ হইবার সময়টাও ঠিক করিয়া বলিয়া রাখিয়াছিল।

১১। সে দিন, দিনের বেলা ও প্রথম রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। বিনোদিনী ভগবানের নিকট এই মর্ম্মে প্রার্থনা করে:—"হে ভগবান আমায় দাহ করিতে যাঁহারা ঘাটে যাইবেন, তাঁহাদের বৃষ্টিতে ভিজাইয়া কষ্ট দিওনা, ঠাকুর।" ঠাকুর যেন সে কথা গুলি স্নেহের ভাবে গ্রহণ করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় বৃষ্টি থামিয়া গেল আর পুণ্যবতী বিনোদিনী রাত্রি ১২টার সময় সকল শোক তাপ এড়াইয়া ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সে রাত্রে আর বৃষ্টি হয় নাই। তারপর দিন সমস্ত দিন

রৌদ্র হইয়া বেলা ৫টায় আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য যে বিনোদিনীকে দাহ করিবার ব্যাপারে কাহাকেও ভিজিতে হয় নাই।

অষ্টচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

১। কল্যাণের অক্টোবর মাসেরও দুখানা পোস্ট কার্ড নভেম্বরে পাওয়া যায়। নভেম্বর মাসেই বিনোদিনীর মৃত্যুর খবর এখান হইতে তাহাকে পাঠান হয়, কিন্তু সে খবর তাহার নিকট ৩রা মার্চ (১৯১৭) পৌঁছায় ইহা আমরা পরে তাহার বন্ধু ডাক্তার পুরীর নিকট হইতে জানিতে পাই।

২। এখানে ডিসেম্বর মাসে (১৯১৬) কল্যাণের নিকট হইতে কোন চিঠি পাওয়া যায় নাই। জানুয়ারী মাসের (১৯১৭) শেষাশেষি আমরা কল্যাণের দু'খানা পোস্টকার্ড পাই। তাহাতে লেখা যে "এখানে একটা ভয়ানক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক লোকে আক্রান্ত হইতেছে। ডাক্তার পুরীর সেই রোগ হইয়াছিল। দু'মাস পরে তাঁহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। তোমাদের চিঠি লিখিবার সময় পাই নাই।"

৩। তারপর কল্যাণের ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯১৭) লেখা একখানা কার্ড মার্চমাসেও আসিয়াছিল। তাহাতে তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার কোনও উল্লেখ ছিলনা। কেবল এই

লেখা ছিল যে "খুবই মড়ক চলিতেছে, এখান হইতে লোক না সরাইলে কেহই রক্ষা পাইবে না বোধ হয়।"

৪। তারপর কল্যাণের আর কোন খবর এপ্রিল মাসে আসিল না। একেবারে মে মাসের ২১শে তারিখে খবরের কাগজে প্রকাশিত হইল যে "ক্যাপটেন কল্যাণ কুমার মুখার্জি দারুণ মহামারি রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮ই মার্চ (১৯১৭) মারা গিয়াছেন।"

সেই সময়কার খবরের কাগজে কল্যাণের যুদ্ধে নির্ভীকতা ও অক্লান্তভাবে সৈনিকদের শুশ্রূষা করার সুখ্যাতি অনেক প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫। পরে ২৫শে মে তারিখে, আমরা এখানে ডাক্তার পুরীর নিকট হইতে এক শোকার্ত্ত চিঠি পাই। তিনি এই লিখিয়াছিলেন যে:—"আমাকে কল্যাণ বুকে করিয়া বাঁচাইয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁকে বাঁচাইতে পারিলাম না। কোনও কিছুর অভাব ছিল না। আমার দুরদৃষ্ট !!! আমি কল্যাণের শেষ কার্য্য যথাবিহিত—এইখানের উপযুক্ত—আমার ইচ্ছামত করিতে পারিয়াছি। এবং তাঁর সমাধি স্থানে, মার্ব্বেল পাথরে, তাঁর গুণাবলী লিখিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছি।

"৩রা মার্চ তাঁর মাতার মৃত্যু সংবাদের চিঠি পড়িয়া—

তাঁর আর কোনও কর্ম্মের উদ্যম রহিল না। আহার প্রায় অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া গেল। রাত্রেও নিদ্রা হইত না। কেবল "উহু আর হাই-উতাই" করিতে করিতে ৯ই মার্চ তারিখে তাঁর অল্প জ্বর হইল। তিন দিনে জ্বরটা প্রবল হইল। ১২ই মার্চ তারিখ হইতে ডিলিরিয়াম আরম্ভ হইল। সে সব ডিলিরিয়ামের কথা খুবই স্পষ্ট; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাতেই—অনর্গল কথা বলা। আমি বা অন্য ডাক্তার তাহা বুঝিতে না পারিলেও কেবলই যে "মা! মা! হায় মা! কি হইল মা!" এইরূপ খেদের বিলাপ—তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছিল। ছয়দিন ক্রমাগত ডিলিরিয়ামের পর সে ভাবটা ১৮ই মার্চ দিনের বেলা থামিয়া গেল—আর রাত্রে সব শেষ হইয়া গেল!"

৬। ক্রমে ডাক্তার পুরী আরও অনেক চিঠি লিখিতে পারিয়াছিলেন এবং কল্যাণের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তার ঘোড়ার জীন, রাশ, ঘড়ী, জুতা, বস্ত্রাদি, বাক্স, ব্যাগ, টাকা-কড়ি যাহা কিছু সঙ্গে ছিল—সমস্তই একে একে এখানে পৌঁছিল।

বিনোদিনী এখান হইতে যত্ন করিয়া কল্যাণের জন্য যুদ্ধের সময় ১৯১৫।১৬তে মাঝে মাঝে যে সকল দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিল তাহা সে কিছুই পায় নাই। সে সমস্তও ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

৭। কল্যাণের মৃত্যুর মহাশোক আমাদিগকে কি ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল—তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

আর সেই অভাগিনী কল্যাণ-বধূর কথা ভাবিলে—কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়—কাহার সহানুভূতি তাঁর প্রতি ধাবিত না হয়? আজ যাহা অসহ্য শোক—সময়ের স্রোতে,ভগবানের দয়ায়, তাহা শান্ত ধীরভাবে বহন করিবার শক্তি মানব-হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। তিনি উচ্চ ঘরের কন্যা, বুদ্ধিমতী—সেই কর্ম্মী বীর স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া খুব নিষ্ঠায় ও সংযত-চিত্তে তাঁর দুঃখের বৈধব্য-জীবন কাটাইতেছেন। ভগবান তাঁর ব্যথিত প্রাণ শীতল করুন এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

৮। আর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট—কল্যাণের যুদ্ধক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা—বীরত্বের কথা—ভুলেন নাই। জেনেরালদের রিপোর্টে তাহার কর্ম্মের প্রশংসা যথেষ্ট ছিল বলিয়া—সে জীবিত থাকিলে যে "মিলিটারী ক্রস" পারিতোষিক পাইত তাহা কল্যাণের বধূর হস্তে ন্যায়তঃ আর্পিত হইয়াছে এবং সরকার হইতে তাঁহার আজীবন পেন্সান পাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৯। কল্যাণের যুদ্ধক্ষেত্রে কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে সুখ্যাতির রিপোর্ট

যাহা সিমলা পাহাড়ের মিলিটারী হেড আফিস হইতে সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা এই পুস্তকের "পরিশিষ্টে" দেওয়া হইল।

১০। আমার বড় আদরের কল্যাণ—১১ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া নিজের মনের দৃঢ়তায়, যত্ন ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিয়া এখানে সকল পরীক্ষায় মাথায় মাথায় পাশ করিয়া—নিজের উদ্যম ও চেষ্টায় বিলাত গিয়া—সেখানে সংযতভাবে থাকিয়া এডিনবরা ও কেমব্রিজ এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যথাযথ ডিগ্রী পাইয়া—সুকঠিন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে ঢুকিয়া—ক্যাপ্টেনের বড় পদ পাইয়া—বড়লোক হইয়া—বীরত্বের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপন প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞানে কর্ত্তব্য পালন করিয়া এবং সেই কার্যে গৌরবান্বিত হইয়া ৩৪ বৎসর ৬ মাস বয়সে বিদেশে জ্বর বিকার রোগে প্রাণ হারাইল—ইহা ভাবিলে আমি অধীর হইয়া পড়ি।

১১। আমি তার অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা দিদিমা। আমার পরপারে যাইবার সময় সন্নিকট বলিয়াই মনে হয়। সে বাঁচিয়া থাকিলে আমার মৃত্যুর সময়ে আমার পার্শ্বে সে যে থাকিত তাহা নিশ্চয়। সে সুখ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। তার আদরের চিহ্নটুকুও মুছিয়া গেছে—তার সেই মেয়েটাকেও

ভগবান্ নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। তার মৃত্যুর ভীষণ শোক সহ্য করিয়া—আমাকে তার জীবনী লিখিতে হইল—ইহা কি একটা কম দুঃখের কথা। কিন্তু আমি না লিখিয়া গেলে তার আশৈশব জীবনের মধুরতা, যৌবনের উদ্যম, প্রেরণা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা,—বড় হইবার, কর্ম্মী হইবার, কৃতী হইবার অদম্য উৎসাহ—তার মা ছাড়া কে জানিত, আর কেই বা যত্ন করিয়া লিখিত ?

১২। সকলই দয়াময় ভগবানের লীলা। আমরা তাঁহার কঠিন বিধান চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, বহন করা ভিন্ন আর কি করিতে পারি ? কল্যাণের পিতা মাতার জীবনের সঙ্গে তার নিজের জীবন অদৃশ্যভাবে অথচ বিশদরূপে জড়িত। আমি ঐ তিন অতীত জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বলিয়া আর বিশেষতঃ কল্যাণের জীবনের সদ্‌গুণগুলি আমাদের দেশের ভগ্নোদ্যম যুবকদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে বুঝিয়াই আমার নিজের শোক দুঃখ শারীরিক জরার ক্লেশ-সমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গল্পচ্ছলে কল্যাণকুমারের জীবনের ছবি বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

১৩। আমার লেখার দোষ, ভাষা প্রয়োগের দোষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু সে সব দোষ ক্ষমা করিয়া—কল্যাণ-

কুমারের জীবনী পাঠে যদি দেশের একটীও ভগ্নোদ্যম যুবক পুনরায় নব-শক্তিতে দেশের কল্যাণকর কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিবার স্পৃহা নিজ হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলেই আমার এই "কল্যাণ-প্রদীপ" লেখা সার্থক হইয়াছে জ্ঞান করিব। ইতি—

সমাপ্ত।

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী —(লেখিকা)।

পরিশিষ্ট।

কল্যাণকুমারের যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে স্বখ্যাতির রিপোর্ট।

1. Extract from a report from General Sir J. E. Nixon, K. C. B., Commanding Indian Expeditionary Force "D" on the Battle of Kut-al-Amarah, 28th September 1915 :—

x x x

Captain K. K. Mukerji, I. M. S, shewed energy and devotion in collecting the wounded from a shell swept area.

---

2. Copy of a letter No. 1027 1/6(D. M. S. 3,) dated the 17th April 1916, from the Director, Medical Services in India, to the Director-General, Indian Medical Service, Simla :—

I have the honour to inform you that the under-mentioned Indian Medical Service officers,

serving under Major-General C. V. F. Townsand, C. B., D. S. O., have been brought to notice for gallant and distinguished conduct in the field during the period from 5th October 1915 to 17th January 1916, and to request the favour of the fact being recorded on their personal files :—

x x x

Captain K. K. Mukerji.

---

3. Copy of a letter No. A-1739/1A, dated 16th September 1916, from the General Officer Commanding, Indian Expeditionary Force "D" to Chief of the General Staff, Simla :—

I beg to forward the attached correspondence relative to the good work done by certain medical officers, Assistant Surgeons, and Sub-Assistant Surgeons during a severe epidemic of acute enteritis that occurred, after the surrender of Kut-el-Amara, in the prisoners' Camp at Shumran from the 29th April to the 20th May 1916, for favourable consideration in regard to the medical officers and personnel brought to notice.

Baghdad, 8th June 1916.

From,

Colonel P. Hehir, C. B., I.M.S.,

To

Majar General Sir Charles Mellis, V. C., K.C.B., Baghdad.

Sir,

I beg to bring to your notice the excellent work done by the undermentioned medical officers, Assistant Surgeons and Sub-Assistant Surgeons luring the intensely severe epidemic of Acute Enteritis that occurred in the prisoner's Camp ear Shumran from 29th April to 20th May 1916.

The work of the Medical Officers and Medical Subordinates was very severe and carried out nder exceptional hardships. During the first ortnight they worked all day and most part of the might and the conditions in Camp and the weather were very trying.

The following Medical Officers attached to the Field Ambulances are recommended for reward :—

x x x

Captain K. K. Mukerji, I.M.S.

x x x

Sd. P. Hehir, Colonel, I.M.S.

Assistant Director, Medical Services, 6th Dn.

ঐ ইংরাজী রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ।

১। ভারতীয় অভিযানকারী "ডি" নম্বর সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনেরাল সার্ জে, ই, নিক্সন কে, সি, বি, কর্ত্তৃক "কুতেল-আমারা"র যুদ্ধ সম্বন্ধে ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে লিখিত রিপোর্টের উদ্ধৃতাংশ—

"ক্যাপ্টেন কে, কে. মুখার্জ্জি আই, এম্, এস্, অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের মধ্য হইতে আহত সৈনিকগণের উদ্ধার কল্পে উদ্যম ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।"

২। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল ১০২৭ ১/৬ (ডি, এম, এস ৩) নম্বর পত্রে ভারতের মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাইরেক্টার সাহেব সিমলাস্থ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাইরেক্টার জেনেরালকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন :—
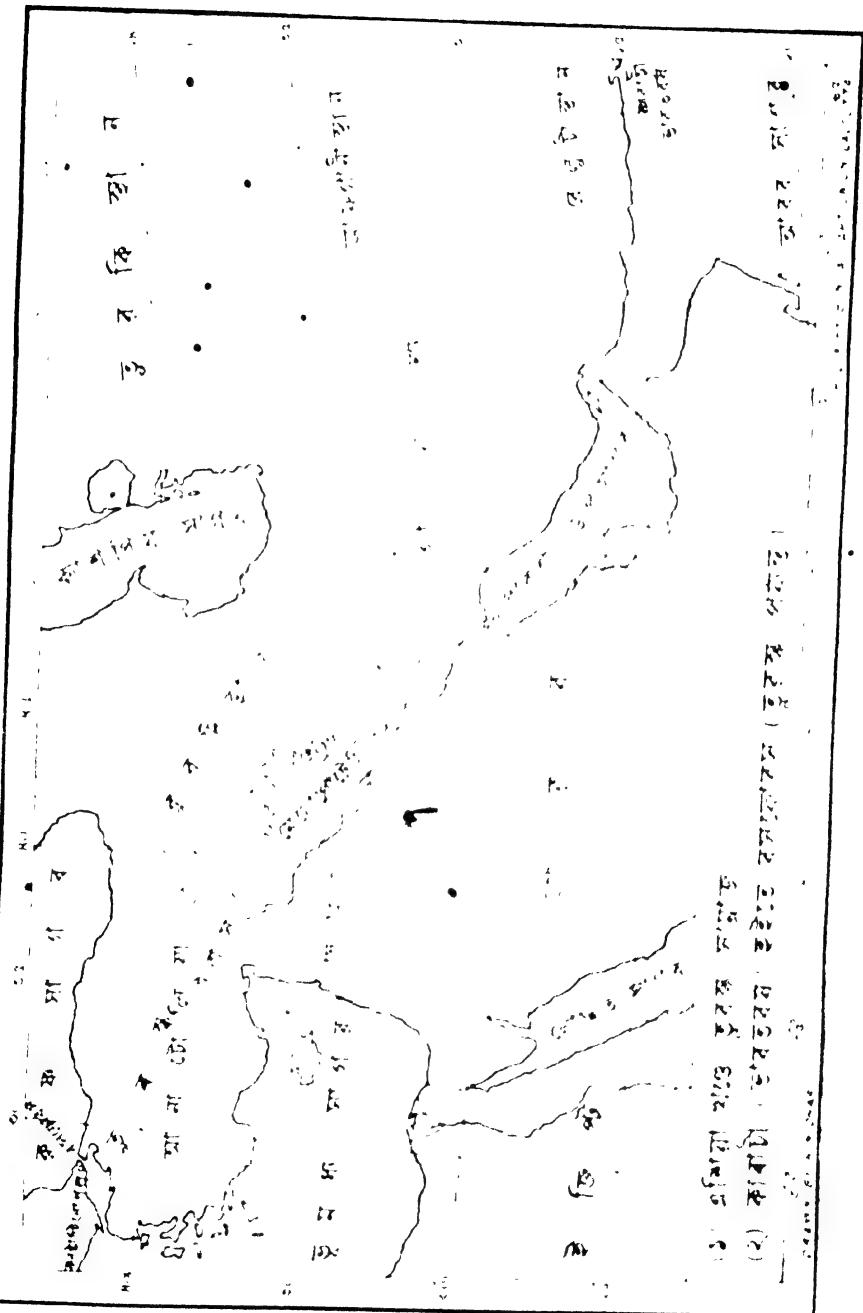
কৃষ্ণ সাগর

আনাতোলিয়া

ভূমধ্য সাগর

মিশর

আরব

তুরকিস্তান

আফগানিস্তান

বেলুচিস্তান

আরব সাগর

(১) এশিয়া খণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্য

(২) কাবাটা (ভারতবর্ষ) হইতে বসফোরাস (তুরস্ক প্রণালী)
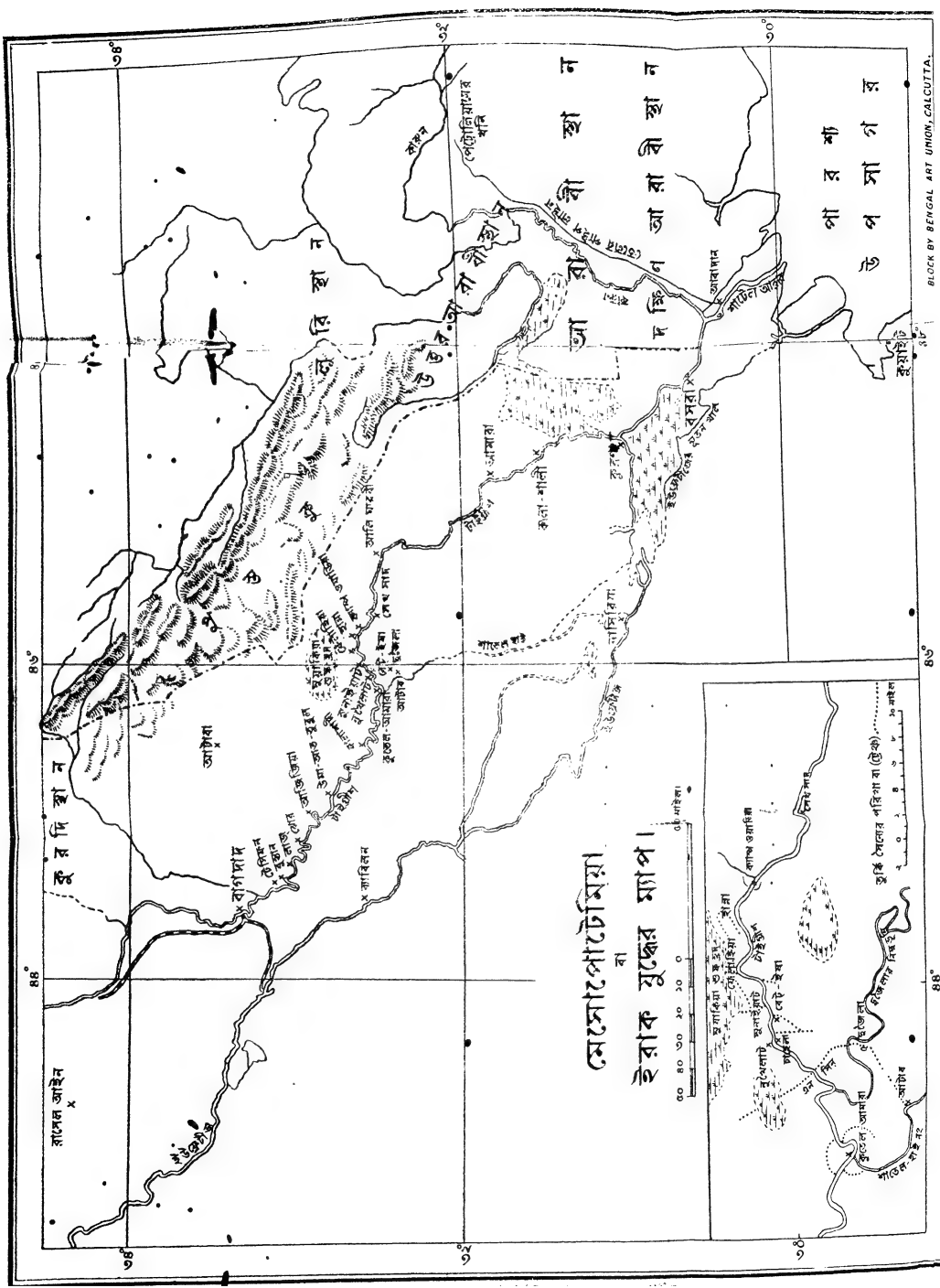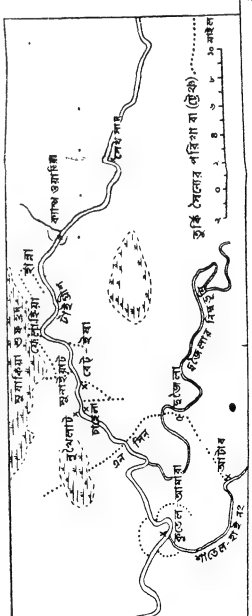
আমি সম্মানপূর্ব্বক আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি যে মেজর জেনেরাল সি ভি এফ্ টাউনশেণ্ড সি, বি; ডি, এস ও; মহাশয়ের অধানস্থ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসভুক্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৫ই অক্টোবর ১৯১৫ হইতে ১৭ই জানুয়ারী ১৯১৬ এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীকতায় যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃস্ট হইয়াছে। আমি আশা করি ইঁহাদিগের স্ব স্ব ফাইলে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে।

x x x

ক্যাপ্টেন—কে কে মুখার্জ্জি।

৩। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬ সালের—এ ১৭৩৯/১এ নম্বর পত্রে ভারতীয় অভিযানকারী "ডি" সৈন্যদলের জেনেরাল অফিসার কমাণ্ডিং—সিমলার জেনেরাল ষ্টাফের চীফ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন :—

কুতেল-আমারার পতনের পর সামরান নামক স্থানে বন্দী-সৈন্যগণের শিবিরে ১৯১৬ সালের ২৯শে এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত যখন আতিসারিক বিকার জ্বর অতি তীব্রভাবে আত্ম-

প্রকাশ করিয়াছিল তখন কতিপয় মেডিকাল অফিসার, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং সাব্-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রশংসা-যোগ্য কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমি এই বিষয় সংক্রান্ত চিঠিপত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি এবং আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের প্রতি সুবিচারে বিমুখ হইবেন না।

বাগদাদ—

৮ই জুন, ১৯১৬

লেখক—কর্ণেল সি হেহির সি, বি, আই এম এস।

মেজর জেনেরাল সার চার্লস মেলিস ভি, সি, কে, সি, বি

বাগদাদ

বরাবরেষু।

মহাশয়,

১৯১৬ সালের ২৯শে এপ্রিল হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত সামরানের নিকটস্থ বন্দী সৈন্যগণের শিবিরে অতি মারাত্মক আতিসারিক বিকার জ্বর সংক্রামক ভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে নিম্নলিখিত মেডিকাল অফিসারগণ,

এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং সাব্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনগণ অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইঁহারা এই কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনে যে দুর্ব্বিষহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, প্রথম একপক্ষ কাল প্রায় দিবারাত্র প্রাকৃতিক নির্য্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

X X X

ফিল্ড এম্বুলেন্সের সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত মেডিকাল আফিসার্‌গণ পুরস্কৃত হইবার যোগ্য :—

X X X

ক্যাপ্টেন কে, কে, মুখার্জ্জি আই, এম, এস।

X X X

স্বাক্ষর—পি, হেহির

কর্ণেল, আই, এম, এস।

আসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টার মেডিকাল সার্ভিস,

৬ নং ডিভিযান।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীর অন্যান্য গ্রন্থ :—

(১) "বন-প্রসূন" (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) মূল্য ... ১৲

এই কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচক দিগের মত :—

"* * কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি (লেখিকা) ক্ষমতাশালিনী বটে। * * সকলেই জানেন বাঙ্গালায় সাহিত্য সংগ্রামক্ষেত্রে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাহার প্রতি শর সন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূরবীর কেহ নাই। তাহার প্রণীত "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধ জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর, যত্নবান। কবিতাটী বড় রঙদার; লেখিকার লিপিশক্তির পরিচায়িকা।"——'বঙ্গদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

"* * * স্থানে স্থানে সুন্দর ভাব আছে। 'প্রণয়' কবিতাটি একটু নূতন ভাবের; তাহাতে জড় জগতের সহিত মানসিক জগতের তুলনা হইয়াছে। * * * 'সীতাকুণ্ড' কবিতাটী বেশ হইয়াছে।"— —"বঙ্গবাসী"; ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯।

"ইহার নাম 'বনপ্রসূন' যথাযথ হইয়াছে; কবিতাকুসুমগুলি নানা গন্ধের নানা বর্ণের, এবং যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন ও সজ্জিত। কতকগুলির শোভা ও সুগন্ধে আমরা বিমোহিত হইয়াছি। 'বালিকা বিধবা,' 'সুরপায়ীর বনিতার আক্ষেপ,' 'দেশাচার,' 'স্বপ্ন,' 'প্রণয়' কুসুমগুলি লইয়া অতি উৎকৃষ্ট মালা প্রস্তুত হইতে পারে। এবং তাহা পাঠিকাগণ আনন্দে কণ্ঠে ধারণ করিতে পারেন। * * * লেখিকার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার মত সকল উন্নত ও সুসংস্কৃত।" "বামাবোধিনী পত্রিকা;" আষাঢ়, ১২৮৯।

—০—